মাহ্‌বুব-উল আলম

রঙবেরঙ

www.pathagar.com

রঙবেরঙ

মাহ্‌বুব-উল আলম

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
ঢাকা—চট্টগ্রাম

www.pathagar.com

রঙবেরঙ

মাহ্‌বুব-উল আলম

প্রকাশক
ইঞ্জিনিয়ার মুনাওয়ার আহমদ
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
নিয়াজ মঞ্জিল, জুবিলী রোড, চট্টগ্রাম।
ফোন ঃ ৬৩৭৫২৩
ঢাকা অফিস
১২৫ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা।
ফোন ঃ ৯৫৬৯২০১

প্রকাশকাল
মে/৯৮

প্রচ্ছদ অংকন
সবিহ্-উল আলম
ওয়াহিদা সুলতানা রোজী

কম্পিউটার কম্পোজ
কম্যুনিক্যান্টস্

মুদ্রণ
নন্দিনী
৫৫/বি ইনার সার্কুলার রোড
শান্তিনগর, ঢাকা-১২১৭
ফোন ঃ ৪০১২৩৮

RONGBERONG
By Mahbub-ul Alam
Published by Munawwar Ahmad
Chairman
Bangladesh Co-operative Book Society Ltd.
Chittagong. Dhaka
Bangladesh

Price : Tk : 85.00
$ 3.00

ISBN : 984-493-034-0

www.pathagar.com

'সাধারণকে ছাড়িয়ে অসাধারণের তপস্যা কর্তে গিয়ে আমরা রসূলে আকরামের আদর্শকে জবাই করে চলেছি।'

—মাহ্‌বুব-উল আলম

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

কথাশিল্পী মাহ্‌বুব-উল আলম। পুরাকীর্তির মত দাঁড়িয়ে থাকা একটি নাম। কালের প্রবাহে, সংস্কারের অভাবে অনেক পুরাকীর্তি হেলে যায়, দুমড়ে যায়, ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। বেশ কিছু আবার মাটির নীচে তলিয়েও যায়। যুগে যুগে আবার সংস্কারকরা, প্রত্নতত্ত্ববিদরা এ সব পুরাকীর্তি লোকসমক্ষে হাজির করেন। তুলে ধরেন এ সবের রচনাশৈলী, বৈদগ্ধ। ক্ষণজন্মা মাহ্‌বুব-উল আলমের সাহিত্য-আঙ্গিনায় প্রবেশ 'মোমেনের জবানবন্দী' ও 'পল্টন জীবনের স্মৃতি'র মত সৃষ্টির মধ্য দিয়ে। পূর্ব বাংলার যে লেখককে পশ্চিম বাংলার বাঘা বাঘা লেখকরা তাঁদের আসরে স্বাগত জানিয়েছিলেন, তিনি আজ যেন বিস্মৃত প্রায়। বর্তমান অবস্থায়, পাঠকবৃন্দের রসবোধের দীনতায় এবং ইমদাদুল হক মিলন, হুমায়ূন আহমেদ, তসলিমা নাসরীন প্রমুখের ভিড়ে এই পুরাকীর্তির ওপর যেন পুরু এক পলেস্তারা পড়ে আছে।

জীবন-শিল্পী মাহ্‌বুব-উল আলমের জন্ম ১লা মে ১৮৯৮। তাঁর জন্ম শতবার্ষিকী উদযাপিত হতে যাচ্ছে। তাঁরই পুত্র, আমার অকৃত্রিম বন্ধু শিল্পী, সাহিত্যিক সবিহ্-উল আলম-এর সহৃদয়তায় তাঁর এই রচনাবলী 'রঙবেরঙ' এই উপলক্ষে পুস্তকাকারে প্রকাশ করতে পেরে আমি অত্যন্ত গৌরবান্বিত। আনন্দের ভাবাবেগে আপ্লুত। মনে হচ্ছে যেন এক অমূল্য পুরাকীর্তির পলেস্তারা সরিয়ে আবার জনসমক্ষে হাজির করছি।

১লা মে ১৯৯৮

মুনাওয়ার আহমদ
সভাপতি
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ
বুক সোসাইটি লিঃ
নিয়াজ মঞ্জিল, জুবিলী রোড
চট্টগ্রাম

www.pathagar.com

প্রসঙ্গতঃ

১৯৪৬ থেকে ১৯৪৮ সালের মাঝামাঝি (?) পর্যন্ত কথাশিল্পী মাহ্‌বুব-উল আলম সরকারি চাকরি নিয়ে কক্সবাজার অবস্থান করেছিলেন। এ অবস্থানকালের শেষের দিকে, দৈনন্দিন জীবনের কৌতুকোদ্দীপক ঘটনাবলীকে উপজীব্য করে তাঁর লেখা রচনাসমূহ নিয়ে মাহ্‌বুব-উল আলম সুবৃহৎ পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেন—নাম রং বেরং। পশ্চিম বঙ্গের এক নামে পরিচিত যশস্বী শিল্পী চিত্তপ্রসাদ ভট্টাচার্যের অনুজ ভ্রাতা দেবপ্রসাদ ভট্টাচার্য (কক্সবাজারেই জন্ম, বাড়ি যদিও চুঁচুঁড়ায়, আজ অবধি কক্সবাজারেই রয়ে গেলেন) বলিষ্ঠ ও ছন্দোময় রেখায় মনের সমস্ত মাধুরী মিশিয়ে চমৎকার অলংকরণ করেছিলেন রং বেরং-এর। এবং সব ক'টি পূর্ণ পৃষ্ঠায়।

শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীনের বাসায় হাস্যরসালাপ কালে মাহ্‌বুব-উল আলমের প্রতিকৃতি এঁকেছিলেন শিল্পাচার্য। মাহ্‌বুব-উল আলমের স্বভাবসুলভ ছোট্ট অথচ নির্মল হাসিটুকু ধরেছিলেন শিল্পাচার্য তাঁর এই প্রতিকৃতিতে। রং বেরং-এর শুরুতে কোথাও বা শেষ প্রচ্ছদে শিল্পাচার্যের এই দুর্লভ স্কেচটি (দুর্লভ এজন্য যে, শিল্পাচার্য প্রতিকৃতি খুব একটা আঁকতেন না, হয়তো এই স্কেচটিই এক মে বা দ্বিতীয়ম) ব্যবহার করবেন, এরকম পরিকল্পনা ছিল মাহ্‌বুব-উল আলমের।

রং বেরং-এর পাণ্ডুলিপি ১৯৪৮ সালে তৈরি হলেও, বদলীর চাকরিতে থেকে মাহ্‌বুব-উল আলম তখন যেসব মহকুমা/জেলায় (কক্সবাজার, সীলেট, খুলনা) অবস্থান করছিলেন, সেসব স্থানে মুদ্রণের বা প্রকাশনার তেমন সুযোগ সুবিধা ছিল না। আবার সংসারের গুরুভার বহন করে, নিজ খরচে বই প্রকাশ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। কাজেই তাঁকে প্রকাশকের মুখাপেক্ষী হয়ে বসে থাকতে হয়। রং বেরং পাণ্ডুলিপি তৈরির আরও ৪/৫ বছর পরে চট্টগ্রামের এক নামী-দামী প্রকাশক রং বেরং প্রকাশনার দায়িত্ব নিতে উৎসাহী হন। অতঃপর, শিল্পাচার্যের আঁকা বিরল প্রতিকৃতি এবং দেবপ্রসাদ ভট্টাচার্যের পূর্ণ পৃষ্ঠার অলংকরণসহ রং বেরং-এর পাণ্ডুলিপি উৎসাহী প্রকাশকের হাতে তুলে দেয়া হয়। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, সেই রং বেরং পৃথিবীর আলো দেখে নি। দীর্ঘ কালক্ষেপণের পর অলংকরণসহ রং বেরং-এর সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপির নিরুদ্দেশ হওয়ার খবর প্রকাশ করেন প্রকাশক। এরপর থেকেই মাহ্‌বুব-উল আলমের প্রকাশক ভীতি। ইচ্ছা-অনিচ্ছার দোদুল্যমানতা নিয়ে তারপরও তিনি 'ন্যাড়া বেলতলায়' যান এবং প্রকাশকের ঘরে পাণ্ডুলিপি হারিয়ে যাওয়ার মতো করুণ ঘটনার পুনরাবৃত্তি তাঁর জীবনে আরো দু'বার ঘটে—একবার, ১৯৪৯-৫০ সালে চট্টগ্রামের কোন প্রকাশকের হাতে সুবৃহৎ 'শ্রীহট্টের ইতিহাস' এবং অন্যবার ১৯৭০-৭১ সালে ঢাকার কোন এক প্রকাশকের হাতে 'গতির ফানুস' গল্প সংকলনের পাণ্ডুলিপি হারানোর মাধ্যমে।

পাঠক যখন এই বইয়ের 'প্রসঙ্গতঃ' পড়তে থাকবেন, তখন এই ভেবে আশ্বস্ত হবেন যে এবার অন্ততঃ সহৃদয় প্রকাশকের বদৌলতে পাণ্ডুলিপি নিরুদ্দিষ্ট হয়নি এবং 'সেই' রং বেরং না হলেও অন্ততঃ এই রঙবেরঙ পৃথিবীর আলো দেখেছে।

পূর্বোল্লিখিত তিক্ত অভিজ্ঞতার কারণেই পরবর্তীতে মাহ্‌বুব-উল আলম নিজ দায়িত্বে বই প্রকাশনা করতে থাকেন; কিন্তু এতে বইয়ের সুষ্ঠু বিপণন হয় না। কথাশিল্পী মাহ্‌বুব-উল আলমের বই দুর্লভ হওয়ার এবং খুঁজলেও পাওয়া না যাওয়ার কারণ বিদগ্ধ পাঠকের কাছে এতক্ষণে নিশ্চয় পরিষ্কার হয়েছে।

হারানো পাণ্ডুলিপির কোনটারই কপি বা নকল ছিল না, কারণ মাহ্‌বুব-উল আলম যা' লিখতেন

www.pathagar.com

চূড়ান্ত লিখতেন। কোন কাটাকুটি ছাড়া। কাজেই তাঁর কোন লেখার খসড়া কপিও পাওয়া যায় না। অনবসর জীবনে নিজের লেখা নিজে নকল করাটাকে সময়ের অপচয় মনে করেছিলেন তিনি। তাছাড়া, পাছে বানান ভুল করে বা স্বকীয় স্টাইলে বানান লিখে সেই আশঙ্কায় তাঁর লেখা নকল করার ভারও তিনি কাউকে দিতেন না। হারিয়ে যাওয়া রং বেরং-এর সেসব লেখা দ্বিতীয়বার রচনা করবেন, মাহ্‌বুব-উল আলমের মতো মৌলিক কথাশিল্পীর জন্য এ ছিল কল্পনাতীত।

১৯৭৬ সালে তাঁর নিজ পত্রিকা দৈনিক 'জমানা'র সাপ্তাহিক সাহিত্য পাতাতে তিনি 'রঙবেরঙ' বিভাগ চালু করেন—তাঁর লেখা গল্প-নিবন্ধ-রস রচনা নিয়েই এই বিভাগ। ঢাকার পত্র-পত্রিকাগুলোতে তাঁর এ ধরনের গল্প-নিবন্ধ ছাপা হলেও, সেসব রঙবেরঙ শিরোনামধারী বিভাগে যায়নি, কেননা রঙবেরঙ বিভাগটি ছিল একান্ত 'জমানা'র। তবুও লেখার ধাঁচ বিচার করেএগুলিকে রঙবেরঙ বিভাগের অন্তর্ভুক্ত মনে হয়েছে এবং এ কারণে এসব লেখাও এ গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার কাটিং থেকে (বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তারিখের উল্লেখ পাওয়া যায় নি) লেখাগুলি উদ্ধার করা হয়েছে। তাই কালানুক্রম রক্ষা করা সম্ভব হয় নি। তবে, এ গ্রন্থে সন্নিবেশিত নিবন্ধ-রচনা সমূহের রচনাকাল ১৯৬৫ থেকে ১৯৮০ পর্যন্ত।

জীবন-শিল্পী মাহ্‌বুব-উল আলমের 'মোমেনের জবানবন্দী', 'পল্টন জীবনের স্মৃতি', 'মফিজন' এবং তাঁর ঐ সময়কার অন্যান্য গ্রন্থসমূহ যাঁরা পড়েছেন, তাঁরা জানেন এসব রচিত হয়েছে সাধু ভাষায়। পঞ্চাশের দশক থেকে তাঁর ভাষার ক্রান্তিকাল—সাধু থেকে চলতি—লক্ষ্যণীয়। যুগের সাথে তাল মিলিয়ে তিনি আধুনিক বানান গ্রহণ করেন। ফলে, তাঁর লেখায় বাঙ্গালী বা বাঙালি কিংবা এ ধরনের আরো শব্দে উভয় বানানের সাক্ষাৎ পাওয়া বিচিত্র কিছু নয়। লক্ষ্যণীয়, হারানো প্রথম পাণ্ডুলিপি 'রং বেরং'-এর বানানে 'ং' (অনুস্বর) ব্যবহার করলেও পরবর্তীতে 'জমানা'তে তাঁর নিবন্ধসমূহের বিভাগ-শিরোনামে তিনি 'রঙবেরঙ' ঙ (ঊঁঅ) দিয়ে লিখেন।

বাংলা বানান সম্পর্কে তিনি ভীষণ রকম সচেতন থাকলেও ('মফিজন'-এর তৃতীয় সংস্করণে গোটা ছয়েক মুদ্রণ প্রমাদ থাকার কারণে তিনি প্রুফ রীডারকে আজীবন ক্ষমা করেন নি এবং এ আক্ষেপ তাঁর আমৃত্যু ছিল।) আগাগোড়া মৌলিক চিন্তাধারার মাহ্‌বুব-উল আলম কোন কোন শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে মৌলিক বৈশিষ্ট্য রক্ষা করে চলতেন—ক্রিয়াতে 'র'-এর পরিবর্তে 'রেফ (´)' ব্যবহার করতেন—যেমন, কর্তেন, কর্বেন, পার্বে (করতেন, করবেন, পারবে) ইত্যাদি। 'বললেন', 'চললেন' ইত্যাকার শব্দে তিনি দুটো 'ল'কে যুক্তাক্ষর হিসেবে ব্যবহার করা পছন্দ করতেন। অবশ্য উদ্ধৃতিতে তাঁর নিজস্বতা পরিহার করে চলতেন। তাঁর আরেকটি বৈশিষ্ট্য—বাংলা ভাষায় লাগসই এবং অত্যন্ত সদৃশ উর্দু, আরবি, ফার্সী শব্দের ব্যবহার। একটা সময় গেছে, যখন বাংলা ভাষায় আঞ্চলিক শব্দের ব্যবহার পরিহার করা একটা অলিখিত নিয়মের মতো ছিল। মাহ্‌বুব-উল আলম এ নিয়ম মানেন নি এবং এ কারণে তাঁর সাহিত্যে প্রচুর আঞ্চলিক শব্দের (পল্লান, চেগা, গোঁ'রা ইত্যাদি ইত্যাদি) সাক্ষাৎ মেলে।

তাঁর ভাষার এসব বৈশিষ্ট্য যাতে কোনভাবে ক্ষুণ্ন না হয়, মুদ্রণকালে সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখা হয়েছে বরাবর।

জীবন-শিল্পী মাহ্‌বুব-উল আলমের জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষে অত্যন্ত স্বল্প সময়ের মধ্যে বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ রঙবেরঙ প্রকাশনার উদ্যোগ গ্রহণ করে-বাংলার অন্যতম মৌলিক কথাশিল্পীকে আগ্রহী পাঠকের কাছে নিয়ে আসার জন্য ধন্যবার্দাহ। সাহিত্যাঙ্গনে এই প্রকাশনা সংস্থার এই অবদান জাতি চিরদিন মনে রাখবে।

সবিহ্-উল আলম

www.pathagar.com

লেখকের অন্যান্য বই

- **ইতিহাস**
  বর্মার হাঙ্গামা
  চট্টগ্রামের ইতিহাস ঃ পুরানা আমল
  ঃ নবাবী আমল
  ঃ কোম্পানী আমল
  চট্টগ্রামের কতিপয় বিশিষ্ট পরিবার
  চট্টগ্রামের অলী দরবেশগণ
  চট্টগ্রামের স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসা
  বাঙ্গালীর মুক্তিযুদ্ধের ইতিবৃত্ত
  রাশিয়ায় ইসলাম ধর্ম প্রচার
- **উপন্যাস**
  মো'মেনের জবানবন্দী
  মফিজন
- **জীবনী**
  দিদারুল আলম জীবন কথা
  কৃতী জীবন-চরিত
- **গল্প সংগ্রহ**
  তাজিয়া
  পঞ্চ অন্ন
- **স্মৃতি কথা**
  পল্টন জীবনের স্মৃতি
  পল্টনে
- **সাময়িকী**
  আলাপ
  সঙ্কট কেটে যাচ্ছে
- **ব্যঙ্গ**
  গোঁফ সন্দেশ
  প্রধান অতিথি ও তাজা শিংগী মাছের ঝোল
- **বড় গল্প**
  গাঁয়ের মায়া

www.pathagar.com

সূচীপত্র

১.	ভারত-ঘাঁটা সাহেব	১৩
২.	পথ ও বিপথ	১৭
৩.	কত কেরামৎ জানরে বান্দা !	২২
৪.	আইন-চক্রে ভূত	২৮
৫.	শেষ রক্ষা	৩৩
৬.	মানুষের সাথে মানুষ	৩৮
৭.	মুখোশধারী	৪৩
৮.	আভিজাত্যের ফাটল	৪৯
৯.	তাসে নাশ	৫৫
১০.	আদর্শের বালাই	৬০
১১.	'খল্যার মা' নানী	৬৬
১২.	চট্টগ্রামের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ঐতিহাসিক পটভূমি	৬৯
১৩.	বাগদাদে ঈদ	৭২
১৪.	দেখার নজরুল	৭৪
১৫.	এই দেশেতে জন্ম যেন এই দেশেতে মরি	৭৭
১৬.	জানার নজরুল	৮০
১৭.	অম্বর মসজিদ	৮৩
১৮.	মোহর্‌রম	৮৬
১৯.	নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু	৮৮
২০.	আমাদের কুটির শিল্প ঃ ঢাকায় মসলিন ও মল্‌মল্	৯৩
২১.	জাতীয় আদর্শ নিষ্ঠা	৯৫
২২.	স্পিরিট ও ফর্ম	৯৭
২৩.	বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজদ্দৌলা	১০১
২৪.	বালকের জগৎ	১০৫
২৫.	কেন লেখা ?	১০৯
২৬.	বাঘ-মানুষ	১১২
২৭.	বিচ্ছিন্নবাদিতাই পতন ঘটিয়েছিল	১১৫
২৮.	সাপ সংগী	১১৯
২৯.	নজরুল প্রেক্ষা	১২১
৩০.	বরাবর দু'বছর আগে	১৩১
৩১.	নাথানের যুদ্ধের একটা গোড়ার রহস্য	১৩৫

www.pathagar.com

৩২. শেষ আশ্রয় ১৩৯
৩৩. ৩৪ বৎসর ! ১৪৩
৩৪. অভিজ্ঞতার আলোকে ১৪৭
৩৫. লেখা-পড়ার "অভিশাপ" ১৫১
৩৬. মওলানা আকরাম খাঁ ১৫৫
৩৭. আমাদের সামরিক ঐতিহ্য ১৬০
৩৮. আমাদের শক্তির উৎস ঃ কোরান ও রসূল ১৬৬
৩৯. আবদুল আজিজ বি-এ ঃ চট্টগ্রামে মুসলিম নবজাগরণ ১৭১

www.pathagar.com

ভারত-ঘাঁটা সাহেব

লেঃ কর্নেল এ জি ম্যাকইলওয়েল ছিলেন ভারতে। চাকুরি করে চুল পাকিয়েছিলেন সাহেব। ভারতে ছিলেন ভাইসরয়ের হাউস-সার্জন, এখন যুদ্ধের ঠেলায় মেসোপটেমিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে এসে হয়েছেন ৯ বেস ডিপো মেডিক্যাল ষ্টোর্সের অফিসার কমাণ্ডিং।

মদে চুর হয়ে থাকেন। টলে টলে চলেন। চোখ বিলকুল ঘোলা হয়ে আছে। কিন্তু, কথায় ও কাজে কোন ভুল নেই। শুধু তাই নয়। ফাইলের উপর এমন বুদ্ধিদীপ্ত, এত সংক্ষিপ্ত, এরূপ প্রাসঙ্গিক মন্তব্য দেন—তা' আবার এত তাড়াতাড়ি যে—অবাক হয়ে যেতে হয়।

ভারত-ঘাঁটা সাহেবরা নানা জনে নানা ফুল হয়ে ফুটে উঠতো। আমাদের ছোট বেলায় চট্টগ্রামে কলেক্টর ছিলেন এ এইচ ক্লেটন।

গোড়ায় কোম্পানীর নজর ছিল রাজস্ব আদায়ের দিকে। তখন জেলার প্রধান প্রশাসকের অভিধা হয় কলেক্টর।

শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রতাপ দেখানোর প্রয়োজন হয়ে পড়ে। তখন বলা হতে থাকে ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট।

আসামে কিন্তু বলা হতো ডেপুটী কমিশনার। এতেই ইজ্জৎ বেশী। সিলেট পাকিস্তানে আসার পর এই অভিধাও প্রচলিত হয়ে যায়। পশ্চিম পাকিস্তানেও ডেপুটী কমিশনার চালু ছিল।

ক্লেটন বহু বৎসর চট্টগ্রামে কলেক্টর ছিলেন। পরে য়্যাডিশনাল কমিশনার ছিলেন।

এ দেশের লোকের সঙ্গে এক দম মিশে গিয়েছিলেন। বিয়ে-শাদীতে নিমন্ত্রণ দিতেন। এসে সকলের সঙ্গে বসে খেতেন। লোকের বাড়ি-ঘর এমন চিনতেন যে পিয়ন-আর্দালীদের পথ বলে দিয়ে চিনিয়ে দিতেন। বাইসিকেল ছিল তাঁর প্রিয় বাহন।

এ হুইটেকার নামে এক ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। এক ধনী মেমকে বিয়ে করেছিলেন। ইনি ঘটা ভালবাসতেন। পরিদর্শনে বেরুবার প্রোগ্রাম পাঠাতেন। কলাগাছ পুঁতে তাঁর অভ্যর্থনার আয়োজন কর্তে হতো। অফিসে ঢুকেই প্রথমে ঘড়ির দিকে তাকাতেন। ঘড়ি

www.pathagar.com

বেশকম চলছে তো আপনার সব এবাদতই বৃথা। সময় ঠিক নেই। সুতরাং, লিখে দিতেন অফিস ভাল চলছেনা। ঘড়ি ঠিক আছে তো কোন আলমারী খুলে আনাচে-কানাচে হাত ঢুকিয়ে দিতেন। হাতে ধুল-বালি উঠে এলো তো অফিস খারাপ। লিখে দিতেন ঃ বড্ড অপরিষ্কার, অফিস খারাপ চলছে।

জি এইচ ডব্লিউ ডেভীস যখন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তখন একবার আমার অফিস দেখতে এলেন। আমি ডিষ্ট্রিক্ট সাব-রেজিষ্ট্রারের একটা সাম্প্রতিক পরিদর্শনের রিপোর্ট তাঁর সামনে তুলে ধর্লুম। এতে অনেক মন্তব্য ছিল যেটা তথ্যের বিপরীত। সাহেব খুঁটিয়ে দেখে জিগ্যেস কর্লেন ঃ এটা কি করে সম্ভব হলো ?

এই ডিষ্ট্রিক্ট সাব-রেজিষ্ট্রার গাঁজা খেতে অভ্যস্ত ছিলেন। গাঁজা টেনে কাগজের আড়াল দিয়ে মন্তব্য লিখতেন। আমি গাঁজা টানার কথা চেপে গেলুম। কিন্তু বল্লুম, কাগজ আড়াল দিয়ে রিপোর্ট লিখেন। সুতরাং কি লিখছেন আমাদের দেখার সুযোগ হয় না। সাহেব লিখলেন ঃ পরিদর্শিত অফিসারকে দেখিয়ে লিখবে, তাতে ভুল হওয়ার অবকাশ থাকবে না।

সাহেব সদরে ফিরে যাওয়ার পর মাথা-খারাপ কাজী আবদুর রশীদ তাঁর সাথে দেখা কর্তে যায়। দেখার সময় হঠাৎ ছুরি বের করে সাহেবের বুকে বসিয়ে দেয়। সাহেব খুন হয়ে যান।

এইচ আর উইলকিনসন যখন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তখন ঐতিহাসিক অস্ত্রাগার লুণ্ঠন এবং জালালাবাদের সম্মুখ-যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

একবার উইলকিনসন আমার উপর খুব চটে যান। আমার একটা বদলীর আদেশ তিনি আমাকে না জানিয়ে বাতিল করে দেন। আমি প্রতিবাদে তাঁর কুঠিতে আমার মায়ের দেওয়া বলে এক চিঠি নিয়ে যাই। ওতে মা বলছেন ঃ তা হ'লে চাকুরিই ছেড়ে দাও।

পড়ে রাগে সাহেবের ওষ্ঠ নীল হয়ে গেল। নীল যে হয় সেটা পড়েছিলাম। এবার দেখলাম।

সাহেব জিগ্যেস কর্লেন ঃ তুমি মায়ের কথা নিয়ে চল ? আমি বল্লুম ঃ সাহেব, তুমি ভুলে যাচ্ছ কেন যে এই মায়ের অনুমতি নিয়েই আমি বাঙ্গালী পল্টনে ঢুকে তোমাদের হয়ে যুদ্ধ কর্তে গিছলাম। এতে উইলকিনসন ঠাণ্ডা হয়ে যান।

হ্যারল্ড গ্রেহাম, হিউবার্ট গ্রেহাম ইত্যাদি নামের ৩/৪ ভাই আই-সি-এস ছিলেন। এক জন কমিশনার হয়েছিলেন। তিনি বাঙ্গলা ভাষার যত রকম মুখ-খিস্তি আছে সব নোট বইতে টুকে রেখেছিলেন। কারও উপর রাগলে প্রথমতঃ যে সব গালাগাল মুখস্থ আছে সে সব ছাড়তেন, তারপর নোট বই দেখে এক-একটা যোগ করে দিতেন।

সাহেবরা বিলেত থেকে ভারত রওয়ানা হওয়ার পথেই তাদের শিক্ষার অঙ্গ স্বরূপ অনেক বই পত্র দেওয়া হতো যাতে ভারতীয় চরিত্রের প্রতি অনেক বিরূপ মন্তব্য থাকতো।

এদেশে পৌছামাত্র সাহেবের এক আর্দালী জুটে যেতো যে তার সব নীচ কাজ-কর্ম

www.pathagar.com

করে দিতো—যার মধ্যে ছিল তার বিল ভাঙ্গিয়ে নগদ টাকা এনে দেওয়া।

আর্দালী লেখাপড়া তেমন জানেনা। কিন্তু টাকা পেতে হলে বিলের কোন্ কোন্ জায়গায় সাহেবের দস্তখত থাকতে হবে তা' বোঝে। ট্রেজারীতে বিল দাখিলের পর চেক্ করে কেরাণী বলে ঃ বিল পাস্ হবেনা, সাহেব প্রাপ্তি-স্বীকারের জায়গায় দস্তখত করেন নি। আর্দালী ছুটল তাঁর দস্তখতের জন্য। তিনি তাঁর ট্রেনিং-এর শিক্ষা দিয়ে বুঝলেন ঐটা একজন ভারতীয়ের পক্ষে টাকা মেরে দেওয়ার ফন্দী। সুতরাং লিখে দিলেন ঃ টাকা এখনও বুঝে পাইনি। তারপর নীচে দস্তখত কর্লেন।

ট্রেজারীতে পুনরায় সে বিল দাখিল হতেই ব্যাপার দেখে আমলাদের হাসির রোল উঠল। পিয়ন লজ্জিত মুখে আবার চল্লো সাহেবের খোঁজে। তিনি তখন কুঠিতে চলে গিয়েছেন। তখন ঢুকলো জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের কামরায়। ব্যাপার দেখে তিনিও হাসলেন। কিন্তু নিজে দস্তখত কর্লেন এই কথা লিখে যে অমুকের পক্ষে টাকাটা বুঝে পেলুম।

ভারত-ঘাঁটাদের শীর্ষ পংক্তিতে ছিলেন ম্যাকইলওয়েল। বড়লাটের হাউস সার্জন—চারটিখানি কথা নাকি!

শুনতাম ঃ ম্যাকইলওয়েল জাতে আইরিশ। তখন আইরিশদের স্বাধীনতা-আন্দোলন অনেক দূর এগিয়ে গেছে এবং প্রত্যেক আইরিশকে স্পর্শ করেছে। ম্যাকইলওয়েল আমাকে লক্ষ্য করে বলতেন ঃ আইরিশ আর ভারতবাসী একই ভাগ্য-সূত্রে বাঁধা।

সব সাহেবেরই দু'টা সাধারণ ধর্ম আছে ঃ কুকুরের যত্ন করা এবং কারু চিঠিপত্র তাঁর প্রযত্নে আসলে সেটা তাড়াতাড়ি পৌঁছে দেওয়া।

একবার এক কুকুর পথ ভুলে আমাদের ষ্টোরে এসে পড়েছিল। ফ্রান্সিস সাহেব এক আর্দালী সঙ্গে দিয়ে আমাকে পাঠালেন খোঁজ করে যার কুকুর তাকে বুঝিয়ে দিতে।

ম্যাকইলওয়েলের মস্ত বড় এক টাউস কুকুর ছিল। নাম ছিল পিটার। মনিব ছাড়া আর কারু প্রতি সে কোন গ্রাহ্যের ভাব দেখাতো না।

পিটারকে নিয়ে ম্যাকইলওয়েল অনেক রগড় খেলতেন যা' অত বড় অফিসারের পক্ষে সম্পূর্ণ বেমানান এবং সুতরাং অপ্রত্যাশিত।

ষ্টোরের আঙ্গিনায় দিন মজুরের কাজ আঞ্জাম দেওয়ার জন্য অনেক অযুদ্ধ্যমান 'ফলোয়ার'-এর সমাগম হত।

আন্দামান খালি করে কয়েদীদের নিয়ে আসা হয়েছিল 'পোর্টার কোর' (কুলী বাহিনী) বানিয়ে। ওদেরই একটি দল হয়ত 'ফল্-ইন' করে শৃঙ্খলা মাফিক দাঁড়িয়েছে। ম্যাকইলওয়েল তাদেরই একজনের কাঁধের উপর রাখলেন একটা টেনিস বল। সে ব্যক্তি ঘাড় কাৎ করে সে বল ধরে রাখল সেটাই তার ডিউটী ভেবে। তারপর সাহেবের একটা ক্ষুদ্র শিস্ শোনা গেল আর মুহূর্তে কোথা থেকে তীরের ন্যায় দৌড়ে এসে ক্ষুদ্র চিৎকারের সঙ্গে লাফ দিয়ে পিটার সে বল মুখে পুরেছে। এত বড় কুকুর। তার ভয়ে ফল্-ইনের লাইন ভেঙ্গে একাকার। সাহেব যেন দয়া করে একটু হাসলেন। এ রগড় যেন সকলেই

www.pathagar.com

উপভোগ করে।

ম্যাকইলওয়েল একবার টল্‌তে টল্‌তে আমার অফিসে ঢুকলেন। ব্যাণ্ডেজের বড় বড় উল-কটন আমরা গুণে স্তূপ করে রেখেছিলাম চালান দেওয়ার জন্যে। সাহেব জিগ্যেস কর্লেন ঃ কত আছে ? সংখ্যাটা আমার কণ্ঠস্থ ছিল। বল্লুম এতটা। সাহেব বল্লেন ঃ এবার গোণ দেখি। গুণে হলো একটা কম। আমি ভারী ভড়কে গেলাম। কারণ, বড় সাহেবের কাছে অপ্রস্তুত হওয়ার মানে অনেক কিছু। সাহেব ঘোরা-ফেরা কর্তে লাগলেন। এক সময় কাঁপা গলায় পিটারকে ডাকলেন। পিটার এলো লেজ নাচাতে নাচাতে। সাহেব জিগ্যেস কর্লেন ঃ পিটার তুমি জান কি ? তারপর ছোট্ট একটা ইশারা কর্লেন। পিটার ছুটে গিয়ে সে ব্যাণ্ডেজ নিয়ে এলো সাহেবের চেম্বার থেকে। পিটার সকলের চোখ এড়িয়ে সেটা নিয়ে জমা করেছিল সে চেম্বারে।

www.pathagar.com

পথ ও বিপথ

চাকুরির আর এক বিপদ ঃ পথে থাকা, বিপথে না যাওয়া।

পথে থাকা খুবই কঠিন।

প্রথমত ঃ আদর্শের দ্বন্দ্ব। আদর্শবাদী লোকের জন্যে অনেক কিছুই প্রতিকূল। সব চেয়ে দুঃখজনক হলো প্রশাসনিক ব্যবস্থা। গান্ধী একবার গভর্নমেন্ট্‌কে 'শয়তানিক' বলে গালি দিয়েছিলেন। বস্তুতঃ সব গভর্নমেন্টের মধ্যেই যেন একটা শয়তান লুকিয়ে আছে। সে আপনাকে কিছুতেই পথে থাকতে দেবে না।

এক বয়সে জীবন খুব সাড়া-প্রবন হয়ে ওঠে। তখন ইচ্ছে যায় পরিবেশকে একটা আদর্শ অনুযায়ী গড়ে তুলি। এ জন্যে সব রকম ত্যাগ স্বীকার কর্তে মন চায়।

১৯১৫ সালে যতদূর মনে পড়ে বরিশাল-ফরিদপুরের দিকে প্লাবনে খুব ক্ষতি হয়েছিল। ত্রাণ কাজের জন্য দেশব্যাপী চাঁদা উঠানো হচ্ছিল। আমি সে বারে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দেব। আমার নেতৃত্বে একদল ছাত্রও চাঁদা উঠাতে বেরুল।

দেশে একজন শাইলক শ্রেণীর জাঁদরেল মহাজন ছিলেন। আমরা পণ কর্লুম ঃ তাঁর থেকেও চাঁদা নেব। আমরা দল বেঁধে তাঁকে ঘিরে ধর্লাম।

তিনি ছিলেন অত্যন্ত ধুরন্দর ব্যক্তি। মুহূর্তে বুঝে নিলেন আমিই হচ্ছি দলেন নেতা। আমাকে কাছে দাঁড় করিয়ে বল্লেন ঃ চাঁদা আমি দেব। তবে, তার আগে আমাকে বুঝিয়ে দিতে হবে ওদের টাকা পাঠিয়ে তোমাদের কি লাভ, তোমার কি লাভ ?

উত্তরে আমাকে মানুষ মানুষের জন্যে সহানুভূতি দেখাবে—এর প্রয়োজন বিশ্লেষণ করে অনেক কথা বলতে হয়েছিল। কিন্তু তিনি তার কোনটাই বিশ্বেস কর্লেন বলে মনে হলো না। আমাদিগকে একটি মাত্র টাকা চাঁদা দিয়ে বিদেয় করে দিলেন। আমার শুধুই মনে হচ্ছিল (বঙ্কিম চন্দ্রের কপালকুণ্ডলার নবকুমারের ভাষায়) ঃ তুমি স্বার্থপর হতে পারো, কিন্তু আমি মহৎ হবোনা কেন ?

পরে বুঝতে পারি, এই স্বার্থপরতা কতখানি ব্যাপক হয়েছিল এবং দেশের কি সর্বনাশ করেছিল!

www.pathagar.com

গোটা দেশের গণ্য ব্যক্তিদের তিনি তাঁর কমিশন এজেন্টে পরিণত করেছিলেন। মাতব্বর শ্রেণীর লোক যাঁদের কথায় সমাজ ওঠে বসে, মোল্লা মওলবী শ্রেণী যাঁদের লোকে আখেরাতের পথ-প্রদর্শক মনে করে, সমাজের লিখিয়ে পড়িয়ে শ্রেণী সংসারে টিকে থাকতে হলে যার পরামর্শ ছাড়া লোকের এক দণ্ড চলে না—সকলকে তিনি তাঁর গোপন এজেন্টে পরিণত করেছিলেন।

তখন আয়ের তিনটা বড় পথ চট্টগ্রামী মুসলমানদের হাতে বাঁধা থাকতো। প্রথমত ঃ বার্মার সম্পদ। ছেলেরা সাত আট বছর বয়সেই বার্মায় পালিয়ে যেত, এদের অনেকেই পরিণত বয়সে লক্ষপতি হয়ে দেশে ফিরতো। দ্বিতীয়ত ঃ চট্টগ্রাম থেকে বার্মার গোটা ষ্টীমার সার্ভিস ছিল চট্টগ্রামীদের হাতে। ছেলেরা বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়ে ষ্টীমারে উঠতে পারলেই কোন না কোন আত্মীয়কে পেয়ে যেতো, সুতরাং তাদের হারিয়ে যাওয়ার কোন ডর-ভয় থাকতো না। তৃতীয়ত ঃ চট্টগ্রামের অধিকাংশ ব্যবসা-বানিজ্য ছিল চট্টগ্রামীদের হাতে। তাদের অনেকেরই 'দ্বারে বাঁধা হাতী' অবস্থা ছিল। বহু লোক তাদের ওখানে করে কর্মে খেতে পার্তো।

এজেন্টরা লোককে অবস্থার বাইরে খরচের কাজে নামতে প্ররোচিত কর্তো। যেমন ঃ বাড়ী করা, পুকুর কাটান, ছেলে-মেয়ের বিয়ে নামান, সে সব বিয়েতে অতিরিক্ত ধুম ধাম করে নিজের নাম জাহির করা। যেমন ঃ আমি কি ওর চেয়ে কম—এ রকম অভিমান জাগিয়ে দিয়ে ভায়ে ভায়ে মামলা মোকদ্দমা লাগিয়ে দেওয়া। এ রকম হাজারো অবিবেচনা প্রসূত খরচান্ত ব্যাপার।

টাকার খাঁই মিটাতে রয়েছে এই মহাজনের অবারিত দ্বার। এজেন্ট যদি অভাবীকে নিয়ে যায় তাহলে সে দ্বার নিশুতি রাতেও খোলা।

একবার এই মহাজনের টাকা পেটে পড়লে সে খাতকের আর রক্ষা ছিল না। জোঁক যে রকম রক্ত খেয়ে ফুলে ওঠে সেই টাকা সুদের রক্ত পেয়ে দেখতে দেখতে ফেঁপে ফুলে উঠতো এবং খাতকের গরু-ছাগল বাড়ি-ভিটে সব বিকিয়ে না দিলে তার কিছুতেই শান্তি হতো না।

আমরা চোখের উপর বহু লোকের এ সকল দুঃখ দুর্দশা দেখতুম, বুকফাটা আর্তনাদ শুনতুম, কিন্তু প্রতিকারের কোন উপায় ছিল না। আইন ছিল মহাজনের পক্ষে। চুক্তির দলিলে যদি শাইলক বুকের কাছের এক পাউণ্ড মাংস লিখিয়ে নিয়ে যায় আদালত তা-ই ডিক্রী দিতে বাধ্য।

সে ছিল আমাদের চাষী-ভূষি সাধারণ সমাজের জন্য বড় দুঃখের সময়। নামাজের নিয়ৎ বেঁধে মুসলমান চাষী মনের সম্মুখে আল্লাহ্‌কে দেখতোনা, দেখতো মহাজনকে। তার মহাজনই তার মহাযম হয়ে দাঁড়িয়েছিল। স্বপ্নে মহাজনকে দেখে সে ভয়ে চিৎকার দিয়ে উঠতো।

এই মহাজনের চেয়েও ভয়ের বস্তু ছিল পাঠান মহাজন—এই দেশে যাদের বলা হতো কাবুলীওয়ালা। এরা শীতের প্রাক্কালে নিয়ে আসতো শীতের কাপড়, কম্বল প্রভৃতি।

www.pathagar.com

এরা বিক্রী করতো ধারে। শীতের মৌসুম চলে গেলে যখন ফসল উঠবে ঘরে ঘরে তখন দাম মিটিয়ে দেবে—এই থাকতো ব্যবস্থা।

চাষীরা কিনতো ধারে—আশা কর্তো যে ফসল উঠলেই দাম চুকিয়ে দেবে—কিন্তু, কাজের বেলা নানা দিকের চাপে দামটা দেওয়া হয়ে উঠতোনা। তখন ওরা কাবুলীওয়ালার দৃষ্টি থেকে পালিয়ে বেড়াতো।

কাবুলীওয়ালারা আইন-কানুনের কোন তোয়াক্কা রাখতোনা। তার হাত-বইতে খাতকের নাম টুকা থাকাই ছিল যথেষ্ট। অসম সাহস আর লাঠির জোরে তারা ঠিকই টাকা আদায় করে নিতো।

একবার এক ট্যাক্সীতে করে আমরা যাচ্ছি। এক কাবুলীও ঐ ট্যাক্সীতে যাত্রী ছিল। হঠাৎ সে 'রোখো' বলে চিৎকার দিয়ে চলন্ত ট্যাক্সী থেকে লাফিয়ে নীচে পড়লো। ওদিকে রাস্তা ধরে বাজারের দিকে এগুচ্ছিল এক জনতা।

কাবুলীকে দেখেই তার ভেতর থেকে একজন দেয় ছুট। কিন্তু, কাবুলী তাকে ধরে ফেল্ল।

কাবুলীকে ফাঁকি দেওয়া একরূপ অসম্ভব ছিল। এমনকি মরে গিয়েও না। যারা টাকা না দিয়ে মারা যেতো কাবুলী তাদের কবরের উপর দড়াদ্দম লাঠি মারতো। তাই দেখে পাড়া-পড়শীদের মনে এমন ব্যথা লাগতো যে পাড়া-পড়শীরা সকলে মিলে চাঁদা করে হলেও কাবুলীর দাবিটা মিটিয়ে দিত।

তেমনি এক ক্ষেত্রে একজন মারা গিয়েছিল আর কাবুলী তার কবরে লাঠি মারছিলো। ঘরে ছিল সদ্য-বিধবা বৌ। স্বামীকে খুব ভালবাসতো, স্বামীর শোকে ম্রিয়মান। সে এসে বল্লো ঃ মরার কবরের উপর জুলুম করো না। তুমি ঘরে এসে ভাত খাও, টাকাটা যে করেই হোক আমি দিয়ে দেব।

কাবুলী তো এতে খুব খুশী। ঘরে এসে দেখে সত্যই ভাত বেড়ে রেখেছে। সে খেতে বসল।

তখন কাবুলীদের থাকতো যেমন বিরাট পাগ্‌ড়ি তেমনিই বস্তা বস্তা কাপড় দিয়ে সেলাই তার পাজামা ও পিরহান।

কাবুলী উপুড় হয়ে মুখে গ্রাস তুলছে এমন সময় বৌটি তার পাগড়িতে কেরোসীন ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেয়। কাবুলী পুড়ে মরে, বৌটি পুড়ে মরে, ঘরখানি পুড়ে ভস্ম হয়ে যায়।

পড়শীরা অতি কষ্টে সেই আগুন নেভায়। এই ঘটনার পর কাবুলী জুলুম অনেকটা কমে যায়।

সরকার এক কমিশন বসিয়েছিল। সম্ভবতঃ ফ্লাউড কমিশন। এই কমিশনের রিপোর্ট প্রশাসনের চোখ ফুটিয়ে দেয় ঃ চাষীর এ কী দুরবস্থা! তাকে তার লাঙ্গল-জোয়াল আর হালের গরু সহ ৭ বার নীলেম দিলেও তো তার দেনা শোধ হবে না।

www.pathagar.com

মধ্য প্রদেশে আগেই 'চাষী-খাতক' আইন হয়েছিল। বাংলাদেশে অবস্থা এমন সঙ্গীন ছিল যে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নতুন এস-ডি-ও নেয়াজ মোহাম্মদ খাঁ একাই দাঁড়ালেন এই অতিরিক্ত সুদখোরীর বিরুদ্ধে।

ক্রমে বাংলাদেশেও 'চাষী-খাতক' আইন জারী হয়ে গেল। চাষী তার সামর্থ অনুযায়ী কিস্ত ক্রমে শোধ করতে আর কোন অবস্থাতেই মহাজন তার আসলের সমানের বেশী সুদ দাবী কর্তে পার্বেনা। অর্থাৎ আসলের দ্বিগুণের বেশী দাবী চলবে না।

দেশব্যাপী ঋণ সালিসী বোর্ড গঠিত হলো। আমি একের পর এক তিন খানা বোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলুম।

সেই শাইলক মহাজনের পাকা বাড়ী উঠলো, পাকা পুকুর, পাকা ঘোড়া ঘর, পাকা রাস্তা। কিন্তু, তবুও কোথাও মস্ত ফাঁক ছিল। একদিন দেশবাসী শুনে অবাক হয়ে গেল যে, তাঁর স্ত্রী ছোট ছেলে-পুলেদের নিয়ে পুকুরে ঝাঁপ দেন। স্ত্রী মারা যান, ছেলে-পুলেদের কেউ কেউ মারা যায়, কোন কোনটাকে বাঁচান সম্ভব হয়।

মহাজনদের এক অদ্ভুত মনোবৃত্তি গড়ে ওঠে।

বিল্বেশ্বর পাল ছিলেন এক বড় মহাজন। আবার বোর্ডে তাঁর বিরুদ্ধে অনেক মামলা। তাঁর মামলাগুলো চালাতো তাঁর ছোট ভাই নীরোদ। সিল্কের চাদর জড়িয়ে আদ্দির পাঞ্জাবীর ওপর—এই সুস্থ সবল ছেলেটি আসতো—সুদের হিসেব মুখে মুখে করে দিতে পার্তো বলে তাকে দিয়ে বোর্ডের খুব সাহায্য হতো। আমরা তাকে ভালবাসতুম।

এক মামলায় খাতক তমজু মিঞার সাথে তার তর্ক লেগে গেল। নীরোদ বল্লে ঃ তোমার যেমন ভাই-বেরাদররা বার্মায় আয় করে তোমার অবস্থাকে ফাঁপিয়ে তুল্লো, যে টাকা আমি লগ্নিতে বের করে দিলুম তারাও তেমনি আমার ভাই বেরাদর। তাদের কামাই থেকে আমি বঞ্চিত হবো কেন ?

তমজু মিঞা উত্তর কর্লে ঃ আমার ভাই-বেরাদরদের কেউ মরেছে, কেউ অসুস্থ হয়ে কাজ ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছে, কারু বা চাকরি গেছে—আর তুমি এমন ভাই-বেরাদর বের কর্লা—যার কোন দিন একটু অসুখ কর্লোনা—যার মৃত্যু নেই—যে শুধু বিয়ায়েই চললো।

নবীন চন্দ্র সূত্রধর বলে এক মহাজন এমন মিষ্টি কথা বলতো যে, সে যে কারুর উপর জুলুম কর্তে পারে এটা আমার ধারণায় আসতোনা। পরে দেখি আহমদুর রহমান বলে এক ব্যক্তি—তার টিনের ঘর, মাছ-ভরা পুকুর সচ্ছল অবস্থা ছিল। নবীন কৌশলে তার ভগ্নীপতির নিকট টাকা খাটায়, কিন্তু আহমদুর রহমানকে জামীন স্বরূপ অণ্ডিম্যানে সহ-খাতক করে নেয়। পরে ঐ ঋণ সুদে বেড়ে গিয়ে তার বাড়ী পুকুর সব নীলামে কিনে নিয়েছে, আহমদুর রহমান এখন গলায় কোরান জুলিয়ে একরূপ দ্বারে দ্বারে ভিক্ষে করে পেট চালায়।

আমি এই জুলুমের পরিমাণ দেখে অবাক হয়ে যাই।

নবীনকে ডেকে বলি ঃ নবীন, তুমি যে এতখানি জুলুম কর্তে পারো তা' কখনও

www.pathagar.com

ভাবতে পারিনি। নবীন তার বড় বড় চোখ আমার দিকে পাকিয়ে আশ্চর্য হয়ে বল্লে ঃ হুজুর, পারেন নি ? তা হ'লে মহাজন কাহাকে বলে আপনি এখনও চিনতে পারেন নি। আমরা দশ জায়গায় মুখ ফেরাতে বাধ্য হই। কিন্তু যেখানে সুযোগ পাই একজনকে জুলুম করেই সব ক্ষতি পূরণ করে নেই।

এক জায়গায় অপর্ণা ডাক্তার বলে একজন মহাজন ছিলেন। তিনি আসলে ছিলেন সরকারী ডাক্তারখানার কম্পাউণ্ডার, কিন্তু সুদে টাকা লগ্নি করে বিরাট অবস্থা করে ফেলেছিলেন।

অবশেষে তাঁর সবকিছু আমার বোর্ডে আটকে গেল।

আমি আবার সে জায়গার সাব-রেজিষ্ট্রারও। একদিন তিনি আসলেন আমার অফিসে একখানি খত রেজিষ্ট্রী করাতে। টাকার প্রয়োজন হওয়ায় তিনি নিজেই খত দিয়ে সুদী কর্জ কর্তে বাধ্য হয়েছিলেন।

আমার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই তিনি কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। বল্লেন ঃ আমি অপর্ণা মহাজন, আমাকে যে কখনও 'পাতারিয়া' দস্তখত দিয়ে সুদী কর্জ কর্তে হবে তা ভাবিনি।

আমি তাঁকে কাছে ডাকলুম। পাশে আসন দিয়ে তাঁকে বসতে দিলুম। তাঁকে বুঝালুম ঃ টাকার ভোগই বড় কথা নহে। আপনার টাকা নিয়ে কেউ বাড়ী ঘর করেছে, কেউ হালের গরু কিনেছে, কেউ ছেলে-মেয়ের বিয়ে দিয়েছে—লোকে কতভাবে উপকৃত হয়েছে। এখন আপনি মনকে বোঝাতে পারেন ঃ আমি ভোগ কর্লুম না বটে, কিন্তু কতজন আমার টাকায় উপকৃত হয়েছে—সেখানেই আমার সার্থকতা।

অপর্ণা মহাজন সশব্দে কেঁদে উঠলেন। বল্লেন ঃ ও কথা আমায় বলবেন না। এর চেয়ে এক পয়সাও যদি আমি আয় না কর্তুম, একটা লোকও যদি আমার টাকায় উপকৃত না হতো সেই ছিল ভাল।

আমি ভাবতে লাগলুম ঃ কোরানে কট্টর কাফেরের কথা বলা হয়েছে। এও একজন কট্টর কাফের!

www.pathagar.com

কত কেরামৎ জানরে বান্দা!

দুর্নীতির নানা পন্থা।

লক্ষ্য কর্লে দেখা যায়, বাঙ্গালী দুই বিষয়ে ওস্তাদ। জন-সাধারণের খেদমৎ বুঝুক না বুঝুক, নিজের কর্তব্য সম্বন্ধে কোন ধারণা না থাকুক জন-সাধারণকে নির্যাতন করে কিরূপে দুটো পয়সা হাত করে নেবে সে বুদ্ধিতে তার পেট ভরা। আর অন্য ব্যাপারে সে যতই বেওকুফ কি অপটু হউক, কি করে সন্তান উৎপাদন করতে হয় বাঙ্গালী পুরুষ ও মেয়ের সে জ্ঞান অত্যন্ত টনটনে। নাক টিপলে দুধ গলে তেমন অপোগণ্ড মেয়েকেও দেখা যায় মা হয়ে কর্ম কাবার করে রেখেছে।

নবাবী আমলে আদালতের নাজিররা ছিলেন অত্যন্ত ক্ষমতাশালী। তাঁরা ছিলেন নির্বাহী কর্মকর্তা।

তখন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী সবে চট্টগ্রামের অধিকার পেয়েছে। আমাদের গ্রামের এক বৌ সতীন-কন্যাকে হত্যা করে তার লাশ পুকুরে পানার তলে লুকিয়ে রাখে। তখন দেশে একটা কথা খুব চালু ছিল ঃ খুন কখনও গোপন থাকে না। বহু সত্যের ন্যায় এখন এই সত্যও মিথ্যা হয়ে গেছে। বাংলাদেশে আজকাল বহু নিরুদ্দেশের খবর পত্রিকায় ওঠে। এদের অনেকগুলো যে খুনে পর্যবসিত হয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু, সে সব খুনের ঘটনা কখনও প্রকাশ পায় না।

সতীন-কন্যার লাশ আবিষ্কৃত হলো। কিন্তু, তাকে খুন করেছে কে ? এটা বের করার জন্য তখনকার পুলিশ সোজা উপায় ধর্লেন। মাচান বানিয়ে তার উপর সন্দেহজনক পুরুষ ও স্ত্রী লোককে তুলে দিয়ে নীচে আগুন জ্বেলে দিলে। হয় স্বীকার করো, নতুবা পুড়ে মরো।

এটা ঘটেছিল আমাদের এক পূর্ব-পুরুষ মুন্‌শী বোরহানুদ্দীনের গ্রামে—যাঁর থেকে প্রতাপান্বিত পুরুষ ঐ সময় সে তল্লাটে আর কেউ ছিলেন না। প্রতাপের কারণ—কোম্পানী তখন নূতন জরীপ বসিয়েছে—দেখে নিতে চায় কতটুকু জমী, কি অবস্থায় আছে—আর তাদের একান্ত নির্ভরতা ছিল মুন্‌শী বোরহানুদ্দীনের উপর।

www.pathagar.com

মুন্‌শী বোরহানুদ্দীন তাঁর গ্রামে পুলিশের এহেন জুলুমের খবর পেয়ে নাজিরকে জানালেন। নাজির দারোগার চাকুরি খতম করে দেন। কোম্পানী আমলের গোড়ায় পুলিশের দারোগারা নাকি নাজিরের অধীনে ছিলেন।

কিন্তু, নাজিরের ক্ষমতা আরব্যোপন্যাসের গল্পে পরিণত হলো। নূতন ক্ষমতার দাপট শুরু হলো পেশ্‌কারের। শোভা রাম পেশ্‌কার থেকে শুরু।

সাহেবরা তখনও আহেলা বিলাতী। না জানেন এ দেশের ভাষা, না বোঝেন এ দেশবাসীর চলা-চরিত্র। পেশ্‌কার সব সময় সামনে থাকে। সুতরাং, অনেক সময় পেশ্‌কারই হয়ে ওঠেন তাঁদের প্রধান খুঁটি। আর এই সুযোগে পেশ্‌কারেরা বাগিয়ে নিতে লাগলেন।

পেশ্‌কারদের অবস্থা হলো ঃ আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ। এক পেশ্‌কার আইনের একখানি বই না পড়েও সাহেবের নেক নজরের দরুণ হয়ে গেলেন সরাসরি মুন্সেফ। আর এক কেরানী হয়ে গেলেন সরাসরি ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট—যার থেকে বড় চাকরি তখন এ দেশবাসীর জুটতোনা।

পেশ্‌কার হাকিমের হয়ে ঘুষ নেন এ রকম কাণা ঘুষাও যেমন শুনতুম, আবার বাঘের উপর টাগ্ হয়ে এষ্টাবলিশমেন্ট্ হেড ক্লার্ক পেশ্‌কারের দিনের 'পাওন' অনুমান করে ধারের নাম করে শেয়ার চেয়ে পাঠিয়েছেন তাও দেখতুম। অন্যথা তাঁকে ঘাঁটি থেকে বদলী করার খড়্গ তাঁর মাথার উপর ঝুলতো।

পেশ্‌কার হাকিমের দৈনিক বাজার করে দিতেন। হাকিমের দুধ খাওয়ার জন্যে তাঁর বিনা-খরচে গরু পুষতেন, সৎ হাকিমরা পথে না এলে তাঁর পরিবারকে দু' একবার সস্তা বাজার করে দিয়ে এমন মাৎ করে দিতেন যে পরিবার "পেশ্‌কার" বলতে অজ্ঞান হয়ে যেতেন। তখন দেখা যেতো কান টানলেই মাথা আসে।

আমি নিজেকে উৎপীড়িত বোধ কর্তুম যখন দেখতুম সে হাকিমের চোখের উপরই পেশ্‌কার পক্ষ থেকে 'পাওন' আদায় করে নিচ্ছেন—যার একটা অলিখিত রেট সকলের জানাশুনা আছ।

ইংরেজী ডিটেকটিভ বই পড়ে আমার ধারণা হয়েছিল 'প্রাইভেট ডিটেকটিভ' নামে একটা 'ফাংশনারী' সৃষ্টি করা যায়। আমরা 'জামানা'য় 'প্রাইভেট ডিটেকটিভ' আছে বলে এক বিজ্ঞাপন দিলুম।

কয়েক দিনের মধ্যে এক উকীল বন্ধু—বিদ্যায় পাকা এ এ বি-এল—অভিজ্ঞতায় কাঁচা এসে আমাকে ধর্লেন ঃ নন্দনকাননে বাসা অমুক ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট—তাঁর জন্যে আজ গভীর রাত্রে—একটা পক্ষ—তাঁর কোর্টেই যার মোকদ্দমা—ভেট নিয়ে আসবে—এটা ধর্তে হবে।

'প্রাইভেট ডিটেকটিভ' আদতেই আছে কি না এবং তারা কিভাবে কাজ করে সে সম্বন্ধে আমার কোন ধারণা নেই। বন্ধুকে বল্লুম ঃ আমিই প্রাইভেট ডিটেকটিভ হতে চাচ্ছি।

www.pathagar.com

গভীর রাত্রে তিনি আসলেন। দু'জনে গিয়ে সেই ডেপুটীর ফটকের সামনে ভূতের মত দাঁড়িয়ে থাকলুম। বন্ধু ঘড়ি দেখতে লাগলেন। এতক্ষণে তাদের পৌঁছার কথা।

আমি মনে মনে নক্‌শা কর্তে লাগলুম ঘটনাটা কিভাবে রূপ নেবে। যেভাবেই নিক আমার কৌতূহল অসীম—আমি পরিস্থিতিটা উপভোগ কর্তে থাকবো।

হঠাৎ বন্ধু বল্লেন ঃ এ বড্ড ভুল হয়ে গেছে। কারণ, এই ডেপুটী তার পেশ্‌কারের বোনকে অতিরিক্ত বিয়ে করেছে। ভেটটা যাবে পেশ্‌কারের বাড়ী। পেশ্‌কারই সুযোগ মত সেটা ডেপুটীর বাসায় পাঠিয়ে দেবে। আমরা পরস্পরের থেকে বিদায় নিয়ে যার যার বাসায় ফিরে এলুম।

ততদিনে সাংবাদিকের আসল গুণ 'সত্য-দৃষ্টি' লাভ আমার কিছু পরিমাণে অর্জন হয়ে গিয়েছে। কোরানে জড়-দৃষ্টি, বৈজ্ঞানিক-দৃষ্টি ও সত্য-দৃষ্টি—তিন রকম দৃষ্টির কথা বলা হয়েছে। সত্য-দৃষ্টি বা 'হাক্কুল একীন'ই আসল দৃষ্টি। এটা চূড়ান্ত। এই দৃষ্টি ছাড়া ভাল সাংবাদিকও হওয়া যায় না, ভাল ডাক্তারও হওয়া যায় না।

কলেক্টরীতে দুর্নীতির বহরটা আমি ঠিকমত পরিমাপ কর্লুম। একদিন 'জমানা'য় নাম দিয়ে সেটা প্রকাশ করে দিলুম। আমার গোঁ হলো আমার একটাই তো জীবন। না হয়, সেটাই যাবে, এর বেশী কিছু তো নয়।

এই প্রকাশের ফলে এমন ভূমিকম্প শুরু হলো যেন একটা রাজত্ব ওলট-পালট হয়ে যাবে।

কলেক্টরেরর টনক নড়লো। দায়টা তাঁরই। তিনি এক প্রেস কনফারেন্স ডাকলেন। বল্লেন ঃ এরপর তো আর চুপ করে থাকা যায় না। তাঁর বিরুদ্ধে একটা মানহানির মোকদ্দমা করা ছাড়া উপায় নেই। প্রেসের বন্ধুরা এক বাক্যে বল্লেন ঃ তা বৈ কি। আমি একা হয়ে গেলুম। কিন্তু, গোঁ ছাড়লুম না। 'জমানা'য় বড় হরফে ছেপে দিলুম ঃ এই কলেক্টর যতদিন আছেন ততদিন দুর্নীতি যাবে না।

মানহানির মোকদ্দমা দায়ের হলো। যে ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্টে কেইস হবে ঠিক হলো, কলেক্টর তাঁকে ডেকে বলে দিলেন ঃ কড়া শাস্তি দিতে হবে। সিনিয়র উকীলরা বরাবরই স্থিতাবস্থার পক্ষে। স্থিতাবস্থার সঙ্গে তাঁরা নিজেকে খাপ খাইয়ে নিয়েছেন। আর, স্থিতাবস্থার মধ্য চক্র হলেন পেশ্‌কার। সিনিয়রদের অনেকের ফাইলে এত মোকদ্দমা তাঁরা সব করে উঠতে পারেন না। পক্ষরা এত সব বোঝেনা। তারা উকীলের দোহনের শিকার হয়েই সন্তুষ্ট। তবে, বোঝেন পেশ্‌কার। তিনি মোকদ্দমার দিন ফেলে দিয়ে (হাকিম অবশ্য তাঁর সহায়) উকীলকে রশি অনেক লম্বা করে দেন। উকীল পক্ষকে বোঝান ঃ দিন পড়ে গেল। আমরা তো তৈয়ারই ছিলুম। পক্ষ বোঝে এর ওপর কথা নেই।

সিনিয়রদের সব সাক্ষীতে পরিণত করা হলো। মৎলব ঃ আমি যেন কোন সিনিয়রদের উকীল দিতে না পারি। আর, জুনিয়াররা সব আমার দলে। সদ্য এম-এ বি-এল পাশ করে এসেছে। অভিমান আছে। পেশ্‌কার আর কয়টি পাস! পেশ্‌কারের দোহন তাঁরা বন্ধ করতে চান। কিন্তু, উপায় কি ? মোকদ্দমা যে সিনিয়রদের হাতে। সিনিয়র যে আগেই

www.pathagar.com

তালাশ নেন ঃ পেশ্‌কারের পাওন দেওয়া হয়ে গেছে কি না!

এই সিনিয়র অবসর নিয়েছেন, সরকারী 'বাহাদুর' খেতাব পাওয়ার পর। আমরাও তাঁকে মুরুব্বী মানি। একদিন বাসায় ডেকে নিয়ে গিয়ে খুব খাওয়ালেন। পরে বল্লেন ঃ করেছ কি ? প্রকাশিত সম্পাদকীয়তে তালিকায় আমার ছেলেটির নামও গেঁথে দিয়েছ! আর একখানা সম্পাদকীয় লিখে তাকে বাদ দিয়ে দাও।

আমি বল্লুম ঃ সাংবাদিকের ব্রত ঈর্ষা-প্রণোদিত হয়ে কিছু না লেখা। যখন লিখি ঃ দোষটাই দেখি, মানুষটাকে দেখিনা। যখন মানুষটাকে দেখি তার প্রতি কোন বিদ্বেষ অনুভব করি না। তিনি বল্লেন ঃ তুমি একেবারে হোপ্‌লেস্। আমি বল্লুম ঃ ঠিক বলেছেন।

কলেক্টরের বজ্র আঁটুনি কিন্তু ফস্‌কা গেরো হয়ে দেখা গেল। সে কথা পরে আসছে।

চট্টগ্রামে বহু বৎসর আগে এক মানহানির মোকদ্দমা হয়েছিল। এক বিচারকারী ম্যাজিষ্ট্রেট বি কে ব্যানার্জীকে শিকারপুরের জমিদার নগেন্দ্র চৌধুরী প্রকাশ্যে ঘুষখোর ডেকেছিলেন। তখনকার বৃটিশ যুগের সরকার ব্যানার্জীকে আদেশ করেন নগেন্দ্র চৌধুরীর বিরুদ্ধে মানহানির কেইস দায়ের কর্তে। কেইস যখন দায়ের হলো সরকার এস. এন. হালদার আই-সি-এস্‌কে স্পেশ্যাল জজ নিযুক্ত কর্লেন ওটার বিচার কর্তে। বিচারে ব্যানার্জীর ঘুষখোরিতা প্রমাণিত হলো, নগেন্দ্র চৌধুরী খালাস পেলেন, পরে ব্যানার্জীর চাকুরি গেল।

আমার এই ক্ষুদ্র মোকদ্দমাও চট্টগ্রামে একটা 'ঢাক ঢাক গুড় গুড়' পয়দা করে ছাড়ল।

মানহানির আর্জিতে প্রার্থনা ছিল ঃ আমাকে সামন করে বিচার করা হউক। ম্যাজিষ্ট্রেট সেখানে ওয়ারেন্ট ইস্যু কর্লেন—এটা হলো এক নম্বর ফস্‌কা গেরো।

আর, আদালতে সীট গ্রহণ করার পূর্বে ম্যাজিষ্ট্রেট যে কলেক্টরের কুঠিতে গিয়ে দেখা করে এসেছিলেন তার অনেক চাক্ষুষ সাক্ষী ছিল। এটা দুই নম্বর ফস্‌কা গেরো।

এমন অনেক লোক বেরিয়ে এলেন যাঁদের আমি ভালরূপ চিনিনে—যাঁরা আমাকে শুধু চেনেন না, ভালওবাসেন—এমনকি ভক্তিও করেন।

একজন খবর নিয়ে এলেন কোর্টে গেলেই আমাকে গ্রেফতার কর্বে। তাঁরা জামীনের দরখাস্ত এবং জামীন তৈয়ার রাখলেন।

তাঁরা কি জানতেন যে জামীন নিয়ে তাঁদের সঙ্গে আমি হাঙ্গামা বাধাবো! আমি বল্লুম ঃ আমি জামীন দেবনা, হাজতেই যেতে চাই। হাজতীদের সঙ্গে নাকি অনেক দুর্ব্যবহার করা হয়, আমি তার অভিজ্ঞতা অর্জন কর্তে চাই। শেষ পর্যন্ত তাঁরা আমাকে বোঝালেন ঃ সে সব দুর্ব্যবহার আপনি কিছুতেই দেখবেন না। আপনার আগেই ওখানে আপনার নাম পৌছে যাবে। তখন দুর্ব্যবহার তো নয়ই, বরং তারা পীরের ন্যায় আপনার সেবা কর্তে লেগে যাবে। অগত্যা, জামীন মেনে নিলুম।

ব্যাপার হলো তখনকার জেলা জজ ছিলেন 'জমানা'র রীতিমত পাঠক এবং আমার অনুসারীর দলে। তাঁর বরাৎ দিয়ে খবর পৌছল ঃ মোকদ্দমা কোনরূপে আমার কোর্টে নিয়ে আসবেন। কলেক্টরীতে দুর্নীতি আছে কি না আমরা দেখিয়ে দেব।

www.pathagar.com

একজন 'জমানা'য় মানহানির মোকদ্দমায় সাহায্যের জন্য একটা কলাম খুলে দেওয়ালেন। অর্থের অভাব দেখা গেল না। এমন কি যাঁরা কলেক্টর-ঘেঁষা তাঁদেরও কেউ কেউ নাম গোপন করে চাঁদা পাঠিয়ে দিলেন।

একজন ঢাকা ঘুরে এলেন। এক স্থানে উপনিবেশ করে বহু উকীল থাকেন। তাঁদের একজন (পরে হাইকোর্টের জজ হয়েছেন) খবর পাঠালেন ঃ এ-তো তাঁর মোকদ্দমা নয়, দেশের মোকদ্দমা। পঞ্চাশটি টাকা সঙ্গে দিয়ে তাঁকে পাঠিয়ে দেবেন—টাইপ ইত্যাদির খরচের জন্য। আমরা হাইকোর্টে মোকদ্দমা করে দেব।

আমি সেই উপনিবেশে গেলুম। ফৌজদারী পশার যাঁর খুব বেশী তাঁর মত নেওয়া হলো। তিনি বল্লেন ঃ আইনে প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচারের ব্যতিক্রমে সেশন কোর্টেও মানহানির মোকদ্দমার বিচারের ব্যবস্থা আছে বটে, কিন্তু কোনদিন কোন আসামী সে ব্যবস্থা চায়ওনি (সেশনে শাস্তির বহর অধিক), হাইকোর্টও দেয়ওনি।

আমার উকীল বল্লেন ঃ আইন যখন আছে আমাদের চাইতে আপত্তি কি ! তিনি চট্টগ্রামের হাকিমের নামে এক চিঠি দিলেন ঃ হাইকোর্টে মোশন করার ব্রীফ আমি নিয়েছি। হাইকোর্ট খোলার দিন মোশন দায়ের করা হবে।

কিন্তু, চট্টগ্রামে মোকদ্দমার দিন আমি এক পরিস্থিতির সম্মুখীন হলুম। আমার ওকালতনামায় সব জুনিয়ার মিলে এত দস্তখত দিয়েছিলেন যে ওটাতে আর তিল ধারণের স্থান ছিল না। এখন ঢাকার উকীলের চিঠি কোন উকীলের মাধ্যম ছাড়া হাকিম আমার থেকে সরাসরি নিতে স্বীকার কর্লেন না, আর দস্তখতকারী উকীলদেরও কেউ তাঁর সামনে আসতে রাজী হলেন না। হাকিম জামীন জব্দ করার ভয় দেখাতে লাগলেন। এটা হলো তিন নম্বর ফস্‌কা গেরো।

ঢাকার উকীল সব ফস্‌কা গেরোরই উল্লেখ কর্লেন তাঁর মোশনে।

ইতিমধ্যে 'জমানা'য় বিচারকারী ম্যাজিষ্ট্রেটকে আক্রমণ করেও কিছু মন্তব্য বেরিয়েছিল। আমি নিজের মোকদ্দমায় হাজিরা দিতে গিয়ে দেখি যে এক নিরক্ষর আসামীকে ম্যাজিষ্ট্রেট ইংরেজী ভাষায় খুব গালাগাল কচ্ছেন, লোকটা এক বর্ণও না বুঝতে পেরে তাঁর পানে হা করে তাকিয়ে আছে। আমার মন্তব্য ঃ নিরক্ষর লোককে ইংরেজীতে গালাগাল করা হাস্যকর, আসামীকে গালাগাল কর্বার অধিকারই বা হাকিমকে কে দিয়েছে! এই মন্তব্য আরেকটা ভূমিকম্প সৃষ্টি করেছিল।

হাইকোর্টে শুনানী হয় জাষ্টিস হামিদুর রহমানের কোর্টে। কী সুন্দর রায়! আমি যেটুকু বলতে পারিনি, সেটাও যেন তিনি চাক্ষুষ করেছেন। রায় হলো ঃ চট্টগ্রামের ম্যাজিষ্ট্রেটরা মাহবুব-উল আলমকে বিচার কর্তে পারেন তাঁকে খালাস দেওয়া পর্যন্ত। আর, যদি দেখেন যে তাঁকে শাস্তি দিতে হয়, সে বিচার তাঁরা না করে সেশনে পাঠিয়ে দিতে হবে।

আমার হাতের পাঁচ ছিল একটা মাত্র ইস্যু। তখনকার দিনে পেশ্‌কারেরা ছিলেন ম্যানেজারের মতো। প্রত্যেক পেশ্‌কারেরই দুই তিন জন ঠিকা লোক থাকতো। পেশ্‌কার

www.pathagar.com

সময় কুলিয়ে উঠতে পার্তেন না বলে এরা নথিতেও অনেক রুটিন অর্ডার লিখে দিত। হাকিমরা সে অর্ডার সই করে দিতেন, এদেরে নানারূপ ফাই-ফর্মাশও কর্তেন। ইস্যু হলো ঃ এদের বেতন দেয় কে এবং কোথা হতে।

এই সময় দেশে মার্শাল ল এলো, সেই কলেক্টরও বদলী হয়ে গেলেন। তাঁর লোকদের বিশেষ করে বলে গেলেন যেন মোকদ্দমাটা আপোষ নিষ্পত্তি হয়ে যায়।

তারপর সিনিয়ররা বেরুলেন আমার খোঁজে। কেউ কেউ আমার এক কালের সহপাঠী। বল্লেন ঃ তুমি কোথায় যে ঘুরে বেড়াও, তোমাকে খোঁজ কর্তে গিয়ে আজ এত টাকা মোটর ভাড়া !

ব্যাপার কি ? আমরা সকলে চাই মোকদ্দমাটা আপোষ নিষ্পত্তি হয়ে যাক।

জনে জনের নাম দিয়ে এত অভিযোগ। সেই মোকদ্দমা 'আমরা এক পক্ষ অপর পক্ষের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা চালাবোনা' মর্মে নিষ্পত্তি হয়ে গেল। কোন অভিযোগই আমাকে প্রত্যাহার কর্তে হলো না।

এখন পেশ্‌কারদের প্রাইভেট এসিষ্ট্যান্ট আর চোখে পড়ে না। তবে, পেশ্‌কার রাজত্ব সমানেই চলছে।

www.pathagar.com

আইন-চক্রে ভূত

আইন-চক্রে আমার ভূত হয়ে যাওয়ার যোগাড় হয়েছিল যখন এক জেলায় আমি বদলী হলুম ডিষ্ট্রিক্ট সাব-রেজিষ্ট্রার রূপে।

এখানে আইনের চক্রটা খুলে বলি।

ইনস্‌পেক্টর জেনারেল হলেন রেজিষ্ট্রেশন ডিপার্টমেন্টের প্রাদেশিক কর্তা। তাঁর অধীনে আছে ডিষ্ট্রীক্ট রেজিষ্ট্রারগণ।

ডিষ্ট্রিক্ট রেজিষ্ট্রারের কাজকে দু'ভাগ করা হয়েছে। একভাগের দায়িত্ব তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ। এ ভাগের কর্তা হলেন জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট। অন্য ভাগে রেজিষ্ট্রি কাজ ও সংশ্লিষ্ট তদন্ত ও আপীল প্রভৃতি। এই ভাগের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ডিষ্ট্রিক্ট সাব-রেজিষ্ট্রারকে 'ডেলিগেটেড্ ক্যাপাসিটী'তে—অর্থাৎ এই দায়িত্ব যখন তিনি আঞ্জাম দেবেন তখন তিনি ক্ষমতা প্রাপ্ত ডিষ্ট্রিক্ট রেজিষ্ট্রার। আর নিম্নপদের (চতুর্থ শ্রেণীর) কর্মচারীদের নিয়োগ, বদলী, অপসারণ প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতাও দেওয়া হয়েছে তাঁকে।

আর জেলার যেটা সদর রেজিষ্ট্রেশন অফিস তার ইনচার্জও হলেন ডিষ্ট্রিক্ট সাব-রেজিষ্ট্রার।

নূতন জেলায় গিয়ে দেখি আইন সেখানে গর্দ্দভ বনে গিয়েছে।

এই জেলায় ফাইল নিয়ে একবার দুর্ঘটনা হয়েছিল। তখন জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের কুঠিতে ফাইল নিয়ে যেতো পিয়নরা আর সাহেবের দস্তখত হয়ে গেলে ফাইল নিয়ে আসতোও পিয়নরা।

তখন ফুটবল খেলা এ দেশে খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। খেলোয়াড় ও প্রধান দর্শক হতো ছাত্ররা। আর, শহরের রাক্ষুসে খোলা গরুগুলোও এর মধ্যে দেখলে ভুরি-ভোজনের একটা সুযোগ। ততদিনে তারা আবিষ্কার করেছে যে কাগজ নামক বস্তুটা—বই কেতাবের আকারে যতই ছাত্রদের মাথায় না ঢুকুক—একবার সোজা উদরে পাঠিয়ে দিতে পার্লে মোটেই দুষ্পাচ্য নয়।

ফলে এমন কতকগুলো ঘটনা ঘটলো যখন ছাত্ররা ময়দানে বই রেখে খেলায় যোগ

www.pathagar.com

দিয়েছে আর গরুতে এসে সে বইপত্র উদরসাৎ করে সাবাড় করেছে।

এক পিয়ন ফাইল রেখে খেলায় জুটে গিয়েছিল। এবং যেহেতু ছেলেদের খাতা ও ম্যাজিস্ট্রেটের ফাইলের মধ্যে তারতম্য বোঝবার মত বিদ্যা-বুদ্ধি গরুগুলোর নেই তারা দুটোই খেয়ে নিঃশেষ করেছিল।

এই অপরাধে পিয়নটির চাকরি যায়। আর, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আদেশ দেন যে ফাইল ফেলে না রেখে সংশ্লিষ্ট হেড্-ক্লার্করা ফাইল নিয়ে গিয়ে যখন তখন দস্তখত করিয়ে আনবেন।

এই উপলক্ষে হেড্-ক্লার্কের সঙ্গে তাঁর দৈনিক দেখা-শোনার এবং আলাপেরও একটা সুযোগ হয়ে যায়।

আমাদের হেড্-ক্লার্কটি ছিলেন অত্যন্ত ধুরন্ধর। তিনি মোহজাল বিস্তার করে নিজেকে 'ডিষ্ট্রিক্ট রেজিষ্ট্রারের হেড্-এসিষ্ট্যান্ট পদবীতে উন্নীত করেছিলেন। লিখতেনও তা। আর ডিষ্ট্রিক্ট রেজিষ্ট্রার ও ডিষ্ট্রিক্ট সাব-রেজিষ্ট্রারের মাঝখানে নিজের একটা ক্ষমতার আসন করে নিয়েছিলেন।

আমার পূর্ববর্তী অসহায় হয়ে অনেক কেঁদেছেন। কিন্তু আইনতঃ আমি নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত কর্তে শপথ নিলুম।

প্রথম সংঘর্ষ বাধলো আমি চার্জ নেয়ার পরের দিনই। 'ডিষ্ট্রিক্ট রেজিষ্ট্রারের হেড্-এসিষ্ট্যান্ট'—আর পুরো ষ্টাফ্ তাঁকে বাঘের মত ভয় করে ঠিক কর্লেন চারটের সময় আমার পূর্ববর্তীকে একটা বিদায়-সভায় আপ্যায়িত করা হবে—কিন্তু, আমাকে জানানোর তাঁরা কোন প্রয়োজনও বোধ কর্লেন না—অথচ, সভা হবে আমার এজ্লাস রুমে।

আমার কতকগুলো আপীল শুনানীর কাজ ছিল। আমি ৫টার পূর্বে এজ্লাস ছাড়তে রাজী হলুম না।

হেড্-এসিষ্ট্যান্ট অবাক হয়ে গেলেন আমার স্পর্ধা দেখে। আমিও অবাক হয়ে গিয়েছিলুম তাঁর স্পর্ধা দেখে।

তিনি উঠে পড়ে লাগলেন—ঐ জেলায় সরকারী কোয়ার্টার নেই—আমি যেন কোন বাসা না পাই—পরিবার না নিয়ে আসতে পারি। আমি কিন্তু এক 'ভূতের বাড়ি' যোগাড় করে ফেল্লুম—যেখানে সন্দেহজনক ভাবে লোক মরেছিল বলে বহুদিন কোন লোক থাকেনি। সেখানেই এনে পরিবার ও ছেলে মেয়েদের উঠালুম। সে এক স্বতন্ত্র ইতিহাস।

আইন হলো ঃ উদ্যোগের মালিক আমি। আমার কথা মত হেড ক্লার্ক নোট দেবেন। সেটা আমার স্বাক্ষর হয়ে ডিষ্ট্রিক্ট রেজিষ্ট্রারের হাতে যাবে। কিন্তু, এখানে উদ্যোগ নিয়ে নিয়েছেন হেড্-এসিষ্ট্যান্ট। যেহেতু ডিষ্ট্রিক্ট রেজিষ্ট্রারের সাথে তাঁর পূর্ব থেকেই আলাপের সুযোগ রয়েছে, আমার পূর্ববর্তীর সময়ে তিনি ষোল আনা প্রাধান্য ভোগ করে এসেছেন। নিম্ন পদের কর্মচারীদের ডিষ্ট্রিক্ট সাব-রেজিষ্ট্রার যে আইনত হর্তাকর্তা বিধাতা তাঁর সে ক্ষমতাও চাপা পড়ে গেছে। আমি সেটা পুনরুদ্ধার কর্তে দৃঢ় সঙ্কল্প হলুম।

www.pathagar.com

এর মধ্যে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আমাকে আবিষ্কার কর্তে শুরু করেছেন। তিনি ছিলেন জাঁদরেল অফিসার আর ভাল পেন-ম্যান (লিখিয়ে)। আমাকে একদিন ডাকিয়ে বল্লেন ঃ আমি নিজে ভাল পেন-ম্যান আর কে ভাল পেন-ম্যান তা' আমি বুঝতে পারি। আপনার নোট দেখেই আমি বুঝতে পারি যে আপনিও একজন ভাল পেন-ম্যান। কিন্তু, আপনি যদি ষ্টাফের সঙ্গে বনিয়ে না চলেন তারা আপনাকে বিপদে ফেলবে যে !

আমি তাঁর নিকট ধরা দিলুম না। নিজের যুদ্ধ নিজেই করে যাওয়া স্থির কর্লুম।

শীঘ্রই এর মওকা মিল্ল অফিসের এক বৃদ্ধ পিয়নের মৃত্যু হওয়ায়। হেড্-এসিষ্ট্যান্ট এবং তাঁর দল-বল ঠিক কর্লেন ঃ চাকরিটা মৃতের ছেলেকেই দিতে হবে। কিন্তু, আমি বল্লুম ঃ এতো কোন পুরুষানুক্রমিক তালুক নয়। ঐ পদের জন্য যাদের আগে থেকেই খাটান হচ্ছে তাদের একজনকেই দেখে-শুনে এ চাকরিটা দিতে হবে। ওতে তাঁদের ভয়ানক আপত্তি।

পূর্ববর্তীর সময়ে কলমের এক খোঁচায় ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটই এই চাকরি দিয়ে দিতেন। কিন্তু, এখন সেটা না করে আমার উপর নানা ভাবে চাপ সৃষ্টি হতে থাকল—হুকুমটা যেন আমিই দেই। কিন্তু, আমি কিছুতেই নরম হলাম না। অগত্যা জেলা-ম্যাজিস্ট্রেটই আদেশ জারী করে দিলেন। অবশ্য প্রস্তাবটা হেড্-এসিষ্ট্যান্টেরই—আমার স্বাক্ষর ছাড়া।

আমি আরও দৃঢ় হয়ে দাঁড়াবার জন্যে প্রস্তুত হলুম।

হেড্-এসিষ্টেন্টের আধিপত্যের ফলে অফিসের অবস্থা এই দাঁড়িয়েছিল যে কখনও পুরো সেট ষ্টাফ অফিসে হাজির থাকতো না। পালা করে ২/৪ জন বরাবরই অনুপস্থিত থাকতো। আর ডিষ্ট্রিক্ট সাব-রেজিষ্ট্রার নাম ধরে তালাশ কর্লেই বলা হতো অমুক তো আজ আসেনি, তবে তার ছুটির দরখাস্ত হেড্-এসিষ্ট্যান্টের নিকট রয়েছে। কিন্তু দরখাস্ত সব সময়ই তাঁর নিকট জমা থাকতো।

কিন্তু, অফিসের সময় একদিন এক পিয়নকে রেকর্ড রুমে তার ডিউটিতে হাজির পাওয়া গেল না। আর, হেড্-এসিষ্ট্যান্ট তার কোন দরখাস্ত দেখাতে পার্লেন না। আমি দেখলুম ঃ এই সুযোগ। আমি তাকে মফঃস্বলের এক অফিসে বদলীর আদেশ দিলুম।

পরের দিন তার ছুটির দরখাস্ত বেরিয়ে পড়লো। আমি ছুটি মঞ্জুর কর্লুম। তবে, আদেশ থাকলো যে ছুটি কাটিয়ে মফঃস্বল অফিসে জয়েন কর্তে হবে।

পরের দিন ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের এক আদেশ পাওয়া গেল। পিয়নটি তাঁর কাছে ডিষ্ট্রিক্ট সাব-রেজিষ্ট্রারের আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করেছিল। তার উপর তিনি হুকুম দিয়েছেন ঃ এই আদেশ স্থগিত রাখা হলো। আমি দেখলুম ঃ এইবার তিনি পুরোপুরি আমার পাল্লায় এসে পড়েছেন।

আমি লিখলুম ঃ পাওয়ার ডেলিগেটেড হওয়ায় আমিই ডিষ্ট্রিক্ট রেজিষ্ট্রার, এই ব্যাপারে ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের আর কোন ক্ষমতা নেই। আমার আদেশের বিরুদ্ধে আপীল কর্তে হলে সেটা ইনস্পেক্টর জেনারেলের নিকট কর্তে হবে।

www.pathagar.com

এরপর সে ফাইল আর কখনও আমার নিকট ফেরৎ আসলোনা। মনে হলো আঘাতে হেড্-এসিষ্ট্যান্টের গায়ে ঘা হয়ে গিয়েছে। তিনি নীরবে সে ঘা চাটতে লাগলেন।

কিন্তু, এবার আমি এমন ব্যাপারে পড়ে গেলুম যেটা আমাকে দাঁড় করিয়ে দিল বিদ্রোহী রূপে।

সরকার এক গোপন জরুরী আদেশ জারী কর্লেন ঃ সংখ্যালঘুদের জমী বিক্রী রেজিষ্ট্রী কর্তে পার্বে না। জারী হলো ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের মাধ্যমে। কিন্তু, আইন বলে আমি ইনস্পেক্টর জেনারেলের অধীন।

আমার উপায় কি ? আমি আইন দ্বারা সৃষ্ট একজন কর্মকর্তা। আমি একটি 'অম্নিবাস' আইন নিয়ে কাজ করি। 'অম্নিবাস'-এর অর্থ হলো যে, একবার চলতে শুরু করলে তাকে আর থামানো যায় না। একবার এক মুন্সেফ একখানা দলীল রেজিষ্ট্রীর বিষয়ে আমার উপর ইনজাংশন জারী করেন। আমি তাঁকে লিখি যে, অম্নিবাস আইন, রেজিষ্ট্রী বন্ধ করা যাবে না, তবে তিনি বিচার করে এই দলীলকে বাতিল ঘোষণা কর্তে পারেন।

সাব্-জজ নিযামুদ্দিন ছিলেন আমার বন্ধু। প্রায় আসতেন আমার বাসায়। বল্লেন ঃ উপায় ঃ আইনকে তুমি যদি রক্ষা করো, আইনও তোমাকে রক্ষা করতে বাধ্য।

আইনে সংখ্যাগুরু-সংখ্যালঘু কোন পার্থক্য নেই। যে কেউ দলীল যথা বিহিত দাখিল কর্বে সেটা রেজিষ্ট্রী কর্তে হবে। সে রেকর্ডের নকল দাখিলকারককে বিনা খরচে দিতে হবে। দাখিলকারক সেটা দেখিয়ে ডিষ্ট্রিক্ট রেজিষ্ট্রারের নিকট আপীল কর্বে। আমি হচ্ছি ডিষ্ট্রিক্ট রেজিষ্ট্রার। এর পরের প্রতিকার আদালত।

আমি আইন ধরে রইলুম। আমার জেলায় সংখ্যালঘুদের কবলাও অবাধে রেজিষ্ট্রী হতে থাকল।

আসলে আমি মনে-প্রাণেও এই আদেশ মেনে নিতে পারছিলুম না। সংখ্যালঘু যদি দেশ ত্যাগ করে চলেই যেতে চায় তার জিনিস সে বিক্রী করে যেতে পার্বে না কেন ?

ওদিকে ভারত থেকে আগত মোহাজেরদের অবস্থা ছিল আরও ভয়াবহ। তারা সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে ক্যাশ এবং সোনা-চাঁন্দি। এগুলোর বিনিময়ে যখন-তখনই এই দেশে এক টুকরো জমি ধর্তে চায়।

সরকারী আদেশের ফলে একদিকে প্রকাশ্য কবলার পরিবর্তে বহু গোপন বায়না-নামা সৃষ্টি হলো—কবলা রেজিষ্ট্রীও সুযোগের অপেক্ষায় লটকে রইল—আর সেই ফাঁকে এক জমীর যে কত বায়না-নামা সৃষ্টি হলো—আর তাই নিয়ে শেষ পর্যন্ত কত মারামারি, কাড়াকাড়ি, মামলা-মোকদ্দমা !

এদিকে মোহাজেরদের পুনর্বাসন বাধাপ্রাপ্ত হলো। তাদের যন্ত্রণার শেষ রইলোনা।

এ অবস্থায় সাত দিনের ছুটি নিয়ে দ্বিতীয়া মেয়ের বিয়ের জন্য আমাকে দেশে অর্থাৎ চট্টগ্রামের ফতেয়াবাদ গ্রামের বাড়িতে আসতে হলো।

এই ফাঁকে কক্সবাজার যেতে হলো এক মোকদ্দমায় সাক্ষ্য দেওয়ার জন্যে। গিয়ে

www.pathagar.com

দেখি ইনস্‌পেক্টর জেনারেল পরিদর্শনে এসেছেন। আমি তাঁর সঙ্গে দেখা কর্লুম।

তিনি যখন শুনলেন, আমি সরকারী আদেশ মান্য করিনি, যেন আকাশ থেকে পড়লেন। আতঙ্কে তাঁর মুখ কালো হয়ে গেল। বল্লেন ঃ সর্বনাশ! এর প্রতিক্রিয়া যে হবে অত্যন্ত ভয়ানক!!

আমি বল্লুম ঃ আইনত ঃ আমি আপনার অধীন। সরকার আপনার মাধ্যমে যদি আমাকে আদেশ না দেন, শৃঙ্খলা বজায় থাকে কি করে ? আপনি ছাড়া আমি কারো আদেশ মানতে পারিনা—বিশেষত ঃ সে আদেশ যদি আইনকে সুস্পষ্টভাবে হত্যা করার শামিল হয়।

এসব কথা ওজন করে দেখার মত তাঁর সময় ও সামর্থ্য কোনটাই ছিল না। মুখের ভাব দেখে মনে হলো, তিনি ভাবছেন—চাচা, আপন প্রাণ বাঁচা।

কর্মস্থলে ফিরে দেখি, হেড্-এসিষ্ট্যান্ট আমাকে কাবু করার জন্যে বিরাট জাল ফেলেছেন। দুর্নীতি দমন বিভাগ সংখ্যালঘুদের রেজিষ্ট্রীর সব হিসাব নিয়ে গেছেন। জেলায় মুসলমান এম-এল-এরা কয়েকজন একত্র হয়ে সরকারের নিকট আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন এবং সেটা সঙ্গে সঙ্গেই ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট পাঠানো হয়েছে তদন্ত ও রিপোর্টের জন্য।

হেড্-এসিষ্ট্যান্ট এটা ফলাও কর্তে চেয়েছিলেন যে আমি টাকা নিয়ে এসব রেজিষ্ট্রী করেছি এবং হাত দিয়েছি। কিন্তু, ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ভাবলেন, সরকারী আদেশ মান্য করিনি এ অপরাধেই আমার চাকরি চলে যাবে। তার সঙ্গে ঘুষ যোগ করে দিলে সেটা অনর্থক জটিলতা সৃষ্টি কর্বে আর ঐ জেলাতে ইতিমধ্যেই আমার যা' প্রতিষ্ঠা হয়েছে তাতে ঘুষের অপবাদ কেউই বিশ্বাস কর্বে না।

নিযামুদ্দীন বল্লেন ঃ ডরো মাৎ। আইনকে তুমি রক্ষা করেছ, আইন তোমাকে রক্ষা কর্তে বাধ্য। এরা বড় জোর তোমাকে বদলী কর্তে পার্বে।

রাত্রে ঘুম হচ্ছিল না। বিষয়টা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখছিলুম ঃ কি করা আমার কর্তব্য। হঠাৎ মিজানের চেহারাটা চোখের সামনে ভেসে উঠল। মিজানুর রহমান—যাঁর সাহিত্যের বাতিক আছে—চট্টগ্রামে যখন সমবায় বিভাগের এসিষ্ট্যান্ট রেজিষ্ট্রার ছিলেন তখন আমাদের বন্ধুত্ব হয়। এখন রেজিষ্ট্রেশন ডিপার্টমেন্টের জয়েন্ট সেক্রেটারী, ইনস্‌পেক্টর-জেনারেলেরও উপরে।

ঠিক কর্লুম, কাল সকালে তাঁকে একখানা চিঠি লিখে দেব।

www.pathagar.com

শেষ রক্ষা

ভোরে মিজানকে চিঠি লিখতে শুরু কর্লুম। বাধার পর বাধা।

প্রথম বাধা ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট চিঠি পাঠিয়েছেন ঃ ডিষ্ট্রিক্ট সাব-রেজিষ্ট্রার, আপনার জন্যে ঢাকা থেকে আর্জেন্ট টেলিফোন এসেছে। আমি এই সঙ্গে গাড়ি পাঠাচ্ছি। আপনি তৎক্ষণাৎ চলে আসবেন।

গিয়ে দেখি ঃ সাহেব, কন্‌ফিডেনশিয়েল কেরানী, ইস্তক পিয়ন—আমার দিকে এই ভাবে তাকাচ্ছেন যেন আমি ফাঁসীর আসামী, আমাকে ফাঁসী দেওয়ার জন্যে এখানে আনা হয়েছে।

প্রথমে সাহেব দিলেন আমাকে এক বকা। আপনি যে হুকুম মানতে পার্বেন না সেটা আমাকে জানালেন না কেন ? আমি আপনার এমন অবস্থা কর্তুম, আপনাকে রাস্তায় দাঁড়িয়ে ভিক্ষা কর্তে হতো !

তাঁর সাথে মুকাবিলায় এটা একমাত্র মন্তব্য যেটা আমি সয়ে নিতে পার্লুম না, যেটা আমার আত্মসম্মানে প্রচণ্ড আঘাত কর্লে এবং যে জন্যে আমি তাঁকে ক্ষমা করতে পার্লুম না। তিনি আমার জগৎ হতে মুছে গেলেন।

ঢাকার টেলিফোনের অপর দিকে ছিলেন চীফ সেক্রেটারী আজফার সাহেব, ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের ঝুনো লোক।

ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ফোনে বল্লেন ঃ স্যার, তাঁকে ডাকিয়ে এনেছি। তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা ছাড়া উপায় নেই। কারণ, তিনি হুকুম মানেনও নি, এখনও যে মানবেন তার কোন আলামৎ নেই।

অতঃপর রিসিভার আমার দিকে ছুঁড়ে মার্লেন। বল্লেন ঃ চীফ সেক্রেটারী স্বয়ং আপনার সঙ্গে কথা বলবেন।

হ্যালো!

ডিষ্ট্রিক্ট সাব-রেজিষ্ট্রার, স্যার। আস্‌সালামু আলাইকুম।

www.pathagar.com

আপনি কেন সরকারী আদেশ মান্য করেন নি ?

আমি, স্যার, রেজিস্ট্রেশন ডিরেক্টরের অধীন লোক।

আমার তখন দুটো ছবি মনে পড়ছিল। প্রথমটা রসূলে আকরামকে যখন আল্লাহ্‌তা'লা প্রবোধ দিচ্ছিলেন ঃ তোমাকে কি আমি মাতৃ-পিতৃহীন পাইনি, অথচ জীবনে মর্যাদায় সুপ্রতিষ্ঠিত করিনি! সুতরাং, আল্লাহ্ সাথে থাকলে ভয় কাকে ?

দ্বিতীয় ছবিটা আরও চমৎকার। ক্লাস এইটে যখন পড়ি, পালিয়ে কলিকাতা চলে গিয়েছিলাম। কলিকাতায় জাহাজী জগৎ চট্টগ্রামী। উঠেছিলাম এক জাহাজে—পোর্ট্ কমিশনারের সে জাহাজ।

একদিন হার্বার মাষ্টার (য়ুরোপীয়) কি কাজে জাহাজে আসলেন। একজন খালাসী জাহাজের পাটাতনের উপর কাঠ চেলা করছিল জ্বালানীর জন্যে, কুড়ালের কোপ কোন কোনটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে পাটাতনকে ক্ষত-বিক্ষত কচ্ছিল। সাহেব তাকে কিছু বল্লেন না। কিন্তু, অফিসে গিয়ে সারেংকে ডেকে পাঠালেন। সারেংকে বল্লেন ঃ তোমার লোক কেন আমাদের জাহাজের ক্ষতি কচ্ছিল তার কৈফিয়ত দাও।

আমার এক জবাবেই আজফার সাহেব টেলিফোন রেখে দিলেন। বুঝতে পার্লেন, গোল বেধেছে আইনগত, সে জন্যে আমি দায়ী নই। পরে আজফার সাহেবের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত পরিচয় হয়। সে প্রসঙ্গ পরে আসছে।

ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ও দলবল হতাশ হয়ে গেলেন। আমাকে বাসায় পৌছে দিলেন।

মিজানের চিঠিটা আবার লিখে চলেছি। এমন সময় দ্বিতীয় বাধা। ধরাচূড়া পরা ইনস্‌পেক্টর জেনারেলের স্পেশ্যাল মেসেঞ্জার দরজায় উপস্থিত। তিনি বিশেষ জোর দিয়ে বলেছেন ঃ গত বারের দেখায় আমি আপনাকে সাবধান করে বলেছিলুম ঃ সরকারী আদেশ মানতে হবে। কিন্তু, আপনি গ্রাহ্য করেন নি। এই 'অনুমানমূলক আচরণ'-এর জন্য আপনাকে কেন বিচার সাপেক্ষে সাময়িক ভাবে পদচ্যুত করা হবে না তার কারণ দর্শান।

আমি সঙ্গে সঙ্গেই জবাব দিয়ে দিলাম ঃ আমি আইন দ্বারা সৃষ্ট কর্মকর্তা। আইনের বাইরে আমার কোন অস্তিত্ব নেই। আইনের ভিতরে থেকে আমি আইন-নির্দ্দিষ্ট কর্তব্যই করে গিয়েছি। আইনগত ভাবে আমার নিকট অন্যরূপ কোন আদেশ পৌছেনি। এই জবাব নিয়ে স্পেশ্যাল মেসেঞ্জার বিদায় হয়ে গেলেন।

আমি মিজানকে চিঠি লেখা শেষ কর্লুম। উপসংহার ঃ তুমি আমাকে ভালরূপেই জানো। তোমরা যদি আমার মাথা কেটে ফেলতে চাও তাতে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু, ভয় দেখিয়ে আমার দ্বারা আইনের মাথা কাটার আশা করোনা।

ফাঁসী আমার হলো না। এবার কর্তাদের জ্বর ছাড়ার পালা।

বিকালের দিকে রাস্তায় বেরিয়েছিলাম। হঠাৎ ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের কনফিডেনশিয়েল এসিষ্ট্যান্টের সঙ্গে দেখা। ফাঁসীর আসামী হঠাৎ মুক্তি পেয়ে গেলে তার প্রতি লোকে যেরূপ তারীফের নজরে তাকায় তাঁর দৃষ্টিটাও অনেকটা সেরূপ।

www.pathagar.com

বল্লেন ঃ মুক্ত-পুরুষ রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন। আপনার বাসায় যে আমরা আর একখানা চিঠি পাঠিয়েছি। বল্লুম ঃ তাই নাকি ?

বাসায় এসে দেখি ঃ ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের চিঠি। লিখেছেন ঃ আপনার বাসায় টেলিফোন না থাকায় মিজান সাহেব আমার টেলিফোনে কথা বলেছেন। আপনি যে তাঁর বন্ধু সেটাতো আমাদের বলেন নি। যা হোক, এখন তিনি আপনাকে অনুরোধ জানিয়েছেন ঃ যেন সরকারী আদেশটাকে কার্যকরী করা হয়।

সন্ধ্যায় একটা পার্টি ছিল। আমাকেও যেতে হলো। গিয়ে চুপ করে বসে থাকলুম। ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেটকে সালামও দিলাম না, তাঁর দিকে তাকালামও না।

পরে আমি ইনস্‌পেক্টর হয়ে যাই। এই ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট হয়ে আসেন আমাদের বিভাগের জয়েন্ট সেক্রেটারী। ইনস্‌পেক্টর জেনারেলেরও উপরে। কিন্তু, আমি তাঁকে সালাম দিতেও যাইনি, তাঁর সঙ্গে দেখাও করিনি। তিনি অনেককে হেসে বলেছেন ঃ যে দারুণ লোক, তোমরা দেখবে কখনও আমার নিকট আসবেন না।

পরের দিন মিজানের চিঠি এলো। দোহাই তোমার, সরকারী আদেশ কার্যকরী করো।

অবশেষে আমার জেলায় সংখ্যালঘুদের কাগজ আলাদা করে ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট দাখিল করা হতো। সেগুলোর উপর কোন ব্যবস্থাই নেওয়া হতো না।

আমি দায় থেকে বেঁচে গেলুম।

নিজামুদ্দীনের কথাই সত্য হলো। সরকার আমাকে অন্য জেলায় বদলী করে দিলেন। আমি ইনস্‌পেক্টর হওয়ার পর 'ডিষ্ট্রিক্ট রেজিষ্ট্রারের হেড্-এসিষ্ট্যান্ট'কে শায়েস্তা করার সুযোগ পেলুম। তাঁকে অন্য এক জেলায় বদলী করে 'পুনর্মূষিক'-এ পরিণত করা হলো। এই জেলায় তিনি যে সব মোহজাল বিস্তার করেছিলেন সে সব কিছুর অবসান করে দিয়ে অবস্থা সাবেক বহাল করা হলো।

আয়ুব খাঁর মার্শাল ল আমলেও আজফার সাহেব চীফ সেক্রেটারী এবং সেই সঙ্গে মার্শাল ল এড্‌মিনিষ্ট্রেটর ছিলেন। এভাবে আয়ুব মিলিটারীর সঙ্গে সিভিলকেও জুড়ে দিয়েছিলেন।

মিলিটারীকে আমি বলেছি ঃ দেহের শ্বেত রক্তকণিকা। দেহে যখন শত্রু ঢোকে এই রক্তকণিকা সঞ্চালিত হয়ে তাকে ঘিরে ফেলে, দেহকে সুস্থ থাকতে সাহায্য করে।

কিন্তু রক্ষক প্রায় ক্ষেত্রেই শেষ পর্যন্ত ভক্ষক হয়ে উঠে—যদি স্থান-কাল-পাত্র ও উদ্দেশ্যের যোগাযোগ অনুকূল না হয়।

সে বারে চট্টগ্রামে অবস্থা সঙ্গীন হয়ে দাঁড়িয়েছিল। মেজর পাইন্দা খাঁ ছিলেন দুর্নীতিবাজ আর এই দুর্নীতি হয়ে পড়ে 'শাখা-পত্র বাড়িয়া পাতালে গেল মূল, না জানি কি অবশেষে ধরে ফল-ফুল'। শাখা-পত্র হলো মিলিটারীর চ্যাংড়া অফিসারগণ। তাঁরা বিচার কার্যে এমন হস্তক্ষেপ কর্তে লাগলেন যে ম্যাজিষ্ট্রেটরা সম্পূর্ণ বেদিশায় পড়ে গেলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট কেস্ ধরেছেন, অমনি এক অফিসার আবির্ভূত হয়ে ঘোষণা কর্লেন ঃ এই কেস্ মিলিটারী

www.pathagar.com

কোর্টে ট্রান্সফার করা গেল। আর, মূল হলো খালেক কাবুলী যার সুদের কারবার চট্টগ্রামকে প্রায় গিলে ফেলেছিল।

দুর্নীতির আবহাওয়ায় খালেক কাবুলী একটা আস্তানায় ম-কারের ভাল যোগাড় রাখতো। ওখানে কতক মিলিটারী অফিসাররা এসে মদ্য পান কর্তেন। এবং ফষ্টি-নষ্টি কর্তেন।

এই চক্রে জড়িয়ে পড়ে কয়েক ব্যক্তি অন্যায়ভাবে ঘায়েল হয়ে গেলেন—একজন ইরানী ব্যবসায়ী (নাম বেহ্‌বুদী), সিলেটের এক ভদ্রলোক যিনি চট্টগ্রামে ব্যবসা করেন, কোতোয়ালীর অফিসার-ইন-চার্জ যিনি চাকুরী-জীবনের আমার এক সহকর্মীর জামাতা আর চট্টগ্রামবাসী আমার এক বন্ধু প্রিন্সিপ্যালের ছোট ভাই।

সকলে এসে আমাকে ধর্লেন। তখন আমি সাংবাদিক আর আমার সত্য-দৃষ্টি কিছু কিছু খুলছে। কোরান শরীফ বলে ঃ প্রথম জড়-দৃষ্টি, অতঃপর বৈজ্ঞানিক-দৃষ্টি, সর্বশেষ সত্য-দৃষ্টি। এই দৃষ্টি লাভ না হলে সাংবাদিক হওয়া যায় না। আর এই দৃষ্টি লাভ হলে প্রকৃত ঘটনা কি ঘটেছিল সেটা আঁচ করার ক্ষমতা জন্মে।

আমি বিস্তারিত একখানা দরখাস্ত মুসাবিদা কর্লুম, রাত জেগে তার চার প্রস্থ টাইপ কর্লুম। সকালে তাঁদের এক প্রস্থ দিলুম স্থানীয় মার্শাল ল কর্তৃপক্ষকে পেশ করতে, এক প্রস্থ দিলুম ঢাকাস্থ প্রধান কর্তার নিকট পাঠিয়ে দিতে আর এক প্রস্থ রাখলুম আয়ুব খাঁকে দেব বলে। তিনি ঢাকা আসছেন, ঘোষণা হয়েছিল, সম্পাদকদের বৈঠক আহ্বান করেছিলেন—যার মধ্যে আমিও অন্তর্ভুক্ত ছিলাম।

ইরাকে ৩ বৎসরের অভিযাত্রী সামরিক জীবনে আমি গ্যারিসন কমাণ্ডারের নৈকট্যে কাজ করেছি। তখন ছিল পুরো কড়া মার্শাল ল। সেই অভিজ্ঞতার আলোকে আমি আয়ুবী যুগের সে ভবিষ্যৎ যেন দেখতে পাচ্ছিলাম।

আয়ুব খাঁর সঙ্গে আমাদের বৈঠক হলো। ব্যক্তিগত আলাপে আমি বল্লাম ঃ চট্টগ্রাম এত গুরুত্বপূর্ণ, অথচ সংবাদ আদান প্রদানের ব্যাপারে স্থানীয় কোন কর্তৃপক্ষ নেই, আমরা কিরূপে প্রতিকার খুঁজি ?

তিনি বল্লেন ঃ ঠিক কথাই তো। অতঃপর তাঁর আদেশে চট্টগ্রামে আঞ্চলিক তথ্য দফতর খোলা হয়।

আমাকে জিগ্যেস কর্লেন ঃ আপনি কিছু লিখে এনেছেন ?

আমি খামে ভরা সেই দরখাস্তের এক প্রস্থ তাঁর হাতে দিলেম। তিনি খামটাকে নাচাতে লাগলেন হাতের তালুর উপর। এক সময়ে সেটা টপ্ করে আজফার সাহেবের হাতে দিয়ে দিলেন।

পান আর দোক্তার রসে দাঁতের দুই ফালিই কালো হয়ে গেছে। তবুও চিবানোর বিরাম নেই। আশ্চর্য এই ঝুনো আই-সি-এস্ এম আজফার।

কাজের লোক। আমরা যখন চা-পান কচ্ছি তিনি এসে আমার পাশে দাঁড়ালেন। এর মধ্যে দরখাস্তখানা পড়ে ফেলেছেন, সত্য-দৃষ্টিতে ধারণাও করেছেন।

www.pathagar.com

আমাকে বল্লেন ঃ আপনি আমাদের প্রেস কন্‌সালটেটিভ কমিটির মেম্বার হউন। আমি রাজী হলাম না। বল্লুম ঃ চট্টগ্রাম থেকে অত গড়হাজির থাকলে তো আমার ছোট পত্রিকাটি চালাতে অসুবিধে হবে।

চট্টগ্রামে ফিরে দেখি ঃ ঢাকার কর্তা চিঠি দিয়েছেন। লিখেছেন ঃ চট্টগ্রামের অফিসার দোষ অস্বীকার করেছেন। আর, আমি দেখতে পাচ্ছি চট্টগ্রামে ও ঢাকায় যে দরখাস্ত পেশ করা হয়েছে দুটোই একই মেশিনে টাইপ করা হয়েছে। সুতরাং আপনাকে কেন মার্শাল ল'তে বিচারের জন্য সোপর্দ্দ করা হবে না তার কারণ দর্শান।

আমি লিখলুম ঃ আয়ুব খাঁর উপদেশ, সব জায়গায় যথা স্থানে প্রতিকার চাও। প্রতিকার না পাও, পত্রিকায় লিখ, আমাকে জানাও। সেই অনুযায়ী ঢাকার বৈঠকে তাঁকে এই দরখাস্তের এক প্রস্থ দেওয়া হয়েছে।

ঢাকার কর্তা যে আমার কৈফিয়ৎ চাইবেন সেটা আমি ঠিক ভাবেই আঁচ করেছিলাম। এখন আয়ুব খাঁ পর্যন্ত জানাজানি হওয়ায় ব্যাপারটা অন্য রূপ নিল। আজফার সাহেব ও ঢাকার কর্তা এক সঙ্গে চট্টগ্রামে এলেন। মেজর পাইন্দা খাঁকে বদলী করে দেওয়া হলো আর যেটা সব চেয়ে বড় কথা—আদেশ জারী হলো মেজর পদবীর নীচের কোন অফিসার ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্ট থেকে কোন মোকদ্দমা মিলিটারী কোর্টে হাওলা কর্তে পার্বেন না।

বেহ্‌বুদী আর সকলে বিপদমুক্ত হয়ে গেলেন।

www.pathagar.com

মানুষের সাথে মানুষ

অফিসার দু'রকম ঃ কেউ নিজের 'ডিউটী' বুঝে নিয়ে সেটা ভালভাবে আঞ্জাম দেয়, কেউ ডিউটী বোঝেনা, কিন্তু উপরিস্থকে ধরায়-পড়ায় বিশ্বাস করে।

একবার বছর-পাঁচ এক ভাল ষ্টেশনে ছিলুম, ৮ মাইল দূরে ছিল খুব ব্যাকওয়ার্ড আর এক ষ্টেশন। সেখানে যাঁদের পোষ্টিং হতো তাঁদের মনে করা হতো ডিপার্টমেন্টের সব 'কাল ভেড়া' এবং একবার পোষ্টিং হয়ে গেলে সেখান থেকে বেরিয়ে পড়তে অনেক বৎসর কেটে যেত।

আমি ছিলুম ডিউটী-বোঝা করিৎ-কর্মা প্রথম শ্রেণীর অফিসার, আর পাশের ষ্টেশনে ছিলেন তদ্‌বিরে দক্ষ দ্বিতীয় শ্রেণীর অফিসার।

একবার এক অতি-বৃদ্ধ পিয়নকে আমার অফিসে কাজ কর্তে দেওয়া হয়েছিল। সে নির্দিষ্ট বয়সে অবসর গ্রহণ করেছিল। কিন্তু, তার অতি-বুদ্ধি স্ত্রী বল্লে ঃ তোমার এই সামান্য পেন্‌শনে আমাদের চলবে কি করে। নিজের পরনে যে সামান্য অলঙ্কার ছিল স্ত্রী সেটা বিক্রী করে দিলে এবং সে টাকা স্বামীর হাতে দিয়ে বল্লে ঃ তুমি কোল্‌কেতা চলে যাও এবং বড় সাহেবের পিয়নকে ধর্তে পার্লে তার সুপারিশে নিশ্চয়ই তোমার চাকরিটি আবার উদ্ধার করে আনতে পার্বে।

দেখা গেল ঃ তার অনুমান সত্য হলো। চট্টগ্রাম থেকে বৌয়ের অলঙ্কার বিক্রীর টাকায় সে দরবার কর্তে কোল্‌কেতা এসেছে শুনেই বড় সাহেব তাঁকে পুনরায় নিযুক্ত করিয়ে আমার অফিসে পাঠিয়ে দিলেন।

কিন্তু, তাকে দিয়ে কোন কাজ চলতোনা। এজ্‌লাসের সামনে বসে সে ঝিমুতো। তবে কান থাকতো খুব খাড়া। আমি তার নাম ধরে ডাকা মাত্রই সে এক লাফে দাঁড়িয়ে যেতো, কিন্তু পরনের লুঙ্গি যে খসে পড়েছে, সে যে সম্পূর্ণ লেংটা সেটা বুঝতে পার্তো না।

আমার পাশের ষ্টেশনের অফিসারও অত্যন্ত যোগাড়ে ছিলেন। হঠাৎ, আদেশ বেরিয়ে গেল আমাকে তাঁর অফিসে এবং তাঁকে আমার অফিসে বদলী করা হয়েছে। সকলে অবাক হয়ে গেল আর সবচেয়ে বেশী অবাক হয়ে গেলেন আমার স্থানীয় উপরিস্থ।

www.pathagar.com

একই স্থানীয় উপরিস্থ হয়ে এসেছিলেন এক প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক—যিনি আমার সাথে পরিচয় কর্তে উদ্‌গ্রীব ছিলেন এবং পরিচয় গাঢ় হতেই আমার বন্ধু হয়ে গিয়েছিলেন।

বদলীর আদেশ দেখে তিনি আমাকে ডেকে পাঠালেন। জিগ্যেস কর্লেন ঃ বড় সাহেবের সঙ্গে পরিচয় আছে ? আমি বল্লুম ঃ নেই। বল্লেন ঃ কারু কাছে যাবেন না, তাঁর আর দোষ কি ? তিনি দেখছেন ঃ পাশাপাশি দু'জনের পাঁচ বছর করে হয়ে গিয়েছে, তাই তাদের ষ্টেশনে পারস্পরিক বদল করে দিয়েছেন।

বদলীটা তিনি কিছুতেই মেনে নিতে পারছিলেন না। বল্লেন ঃ এক কাজ করো, ছুটির দরখাস্ত করো, ছুটি দেওয়া অনেকটা আমার এক্তিয়ার। ছুটিতে চলে গেলে বদলীর আদেশ সহজেই রদ-বদল হয়ে যেতে পার্বে।

আমি বল্লুম ঃ তথাস্তু।

কিন্তু আমি চিরজীবন চাকুরিতে এই আদর্শ অনুসরণ করেছি যে যেখানেই আদেশ দেওয়া হবে সেখানেই আমি যাবো। বাসার চাকরকে যদি বলি ঃ অমুক বাজারে যাও, সে যদি উত্তর করে আমি পার্বো না, আমি কি তাকে চাকুরিতে রাখবো ?

অথচ, আমার স্থানীয় কর্তা ভাবছেন, পরিচিত মহল ধরে নিয়েছেন কিছুতেই আমি এই থার্ড ক্লাশ ষ্টেশনে যেতে রাজী হবো না। তাঁদেরওতো মন রাখতে হয়।

সুতরাং, ছুটির দরখাস্তের ফরম নিলুম। কিন্তু কিছুতেই সে ফরম পূরণে হাত দিতে পারিনে। হাত দিতে গেলেই কে যেন মনের ভেতর গর্জন করে ওঠে ঃ কেন, সে জায়গায় কি আমার রহমত নেই ?

তিনবার চেষ্টা কর্লুম। কিন্তু, প্রভুর গর্জন যেন আরও উচ্চতর হয়ে ওঠে। অথচ, স্থানীয় কর্তাকে বলে এসেছি যে আমি তাঁর কথামত ছুটির দরখাস্তই কর্বো।

অবশেষে আমার স্টাফে এক প্রৌঢ় সৈয়দ-নন্দন ছিলেন, উচ্চ চরিত্রের জন্যে ছোট চাকরি কর্লেও আমরা সকলে তাঁকে সম্মান কর্তুম, তাঁর পরামর্শ নিলুম ঃ কি করা! ওদিকে স্থানীয় কর্তাকে কথা দিয়ে এসেছি, এদিকে দরখাস্তের ফরম পূরণ কর্তে হাত উঠাবার জো নেই। তিনি বল্লেন ঃ আপনি নীরবে বসে থাকুন, সব আল্লাহ্‌র উপর ছেড়ে দিয়ে। সমস্যার আপনি সমাধান হয়ে যাবে।

তবে স্থানীয় কর্তা আমার মতি-গতি যে অদ্ভুত তার অনেক খবর রাখতেন। সৈয়দ-নন্দনের উপদেশ মত চুপ করে বসে আছি, স্থানীয় কর্তার নিকটও আর যাইনি। এমন সময় তাঁর এক চিঠি পেলুম ঃ আমি কোল্‌কেতায় বড় সাহেবকে লিখেছিলাম—এমন ভাল অফিসার তাঁকে এমন একটা রদ্দি ষ্টেশনে দিলেন কেন ? উত্তরে তিনি লিখেছেন ঃ আপাততঃ ফাঁক বুজাবার জন্যে তাঁকে যেতে বলুন, শীঘ্রই আমি তাঁকে খুব ভাল ষ্টেশন দিচ্ছি।

স্থানীয় কর্তা লিখেছেন ঃ ইচ্ছে করেন তো আপনি অল্প সময়ের জন্য এই ষ্টেশনে যেতে পারেন।

সেদিন পৌছলুম। দূর থেকে অফিস সংলগ্ন সদ্য সংস্কৃত বিরাট পুকুরে কাক-চক্ষু

www.pathagar.com

জল ঢেউ খেলছে দেখে বড় আনন্দ হলো। ভাল ষ্টেশনটিতে পানির এমন সুবন্দোবস্ত ছিল না। একটা মজা খালের বদ্ধ পানি নিয়ে আমাদের সন্তুষ্ট থাকতে হতো।

ভাল ষ্টেশনটিতে একজন বুড়ো জমিদার ছিলেন পূর্ণবাবু। অফিসের কাজ শেষ হয়ে এসেছে। এমন সময় তিনি প্রায়ই এজ্লাসের সাম্নে দাঁড়াতেন। জিগ্যেস করলে বলতেন ঃ আপনি অবসর হলেই একটু ধর্ম বিষয়ে আলাপ কর্তে চাই। আলাপ প্রায়ই হতো এবং তিনি খুব খুশী হতেন।

তাঁর জমিদারী যে কোথায় আমার কোন ধারণা ছিল না। নূতন ষ্টেশনে আসতেই একজন এসে দেখা কর্লেন। বল্লেন ঃ পূর্ণবাবুর জমিদারীটাই এই অঞ্চল, আমি তাঁর নায়েব এবং তহসিলদার। বাবু লিখেছেন ঃ নূতন অফিসার আমার অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় এক বন্ধু। আমাদের যা' কিছু আছে তাঁর ভোগে এবং আরামে যেন লাগে। তোমরা আমাকে যে চোখে দেখ তাঁকেও সেই চোখে দেখবে।

এখানে আমি সাড়ে তিন মাস ছিলুম। আধুনিক সভ্যতার পোঁচ লাগেনি, লোকে মিথ্যা কথা বলে না, জিনিসে ভেজাল মেশায়না, ওজনে কম দেয়না, সমাজ-বন্ধন 'সকলের তরে সকলে আমরা প্রত্যেকে আমরা পরের তরে' স্বীকার করে—আমার দেশকে যেন আমি নূতন করে দেখতে পেলুম।

সেই যে নিজামুদ্দীন বলেছিল ঃ ডরো মাৎ। তুমি আইনকে রক্ষা করেছো, আইন তোমাকে রক্ষা করতে বাধ্য। তবে, তোমার বদলী হতে পারে।

বদলীই আমি হলুম—তবে, আরও এক রাউণ্ড লড়ার পর।

আমার জেলায় খুব ছোট একখানি অফিস ছিল, জমীদারের দেওয়া ছোট্ট এক চিলতে জমীতে। ঘর ছিল যেমন ছোট—অফিস নামের কলংক—তেমনি তার ছিল আসবাব পত্রের অভাব।

তখন এক ফ্যাশনেবল শহুরে ভদ্রলোক ছিলেন মহকুমা হাকিম। প্রশাসনিক কর্তা হিসাবে তাঁর সে অফিস পরির্দশন করবার অধিকার ছিলো। মহকুমায় অনেক বড় বড় অফিসারের পদার্পণ হয়েছিল। সদলবল তাঁরা কোথাও যাচ্ছিলেন—পথিমধ্যে বিনা খবরে তিনি আমাদের সেই ছোট্ট অফিসটিতে উঠলেন।

কোরান শরীফে উপদেশ দেওয়া হয়েছে অতি আপন জনের ঘরেও অনুমতি না নিয়ে ঢুকবেনা। একবার ডাক-বাংলোয় গিয়েছিলাম আমার এক আমেরিকান প্রফেসর বন্ধুর সঙ্গে দেখা করার জন্য। টোকা দিতেই তিনি ভেতর থেকে বল্লেন ঃ একটু অপেক্ষা করুন, আমি ল্যাংটা হয়ে বিছানায় শুয়ে আছি। কাপড়-চোপড় পরে নেই। তখন কোরানের উপদেশ মনে পড়েছিল।

মহকুমা অফিসারের সদলবল হঠাৎ আবির্ভাবে আমাদের ছোট্ট অফিসের অফিসারটি নার্ভাস হয়ে একেবারে বেকুব বনে গিয়েছিলেন। তাঁর অনেক প্রশ্নের জবাবই দিতে পারেন নি। এখন মহকুমা অফিসারটি তাঁর অযোগ্যতার উল্লেখ করে আমাদের কাছে রিপোর্ট পাঠালেন।

www.pathagar.com

কি প্রতিকার নেয়া যায় তার প্রস্তাব দেওয়ার ভার আমার উপর। আমি লিখলুম ঃ মহকুমা অফিসারের ন্যায় একজন শহুরে ভদ্রলোক মফঃস্বলে কোন কোন অফিসারকে যে কত কষ্টে অফিস চালাতে হয় তার কোন খবরই রাখেননা দেখছি। তাঁর পক্ষে ভারী দলবল নিয়ে বিনা খবরে হঠাৎ আর্বিভাব ঠিক কাজ হয়েছে বলে আমার মনে হয় না। এতে অফিসারটি নার্ভাস হয়ে পড়েন—এটা খুবই স্বাভাবিক।

তখনকার স্থানীয় কর্তা আমার এই মন্তব্যে ভয়ানক চটে গেলেন। কবি বলেছেন ঃ কবুতর কবুতরের সাথে, বাজ বাজের সাথে সমাজ করে থাকে—এটা অত্যন্ত খাঁটি কথা। অফিসারদের একটা দলীয় মানসিকতা আছে—মহকুমা অফিসারও স্থানীয় কর্তা একই বেরাদরির লোক। মহকুমা অফিসারের প্রতি আমার আক্রমণ স্থানীয় কর্তা নিজের পিঠেই অনুভব করছিলেন। সুতরাং, তিনি আমার মন্তব্যে অসন্তোষ জানিয়ে প্রাদেশিক কর্তার নিকট রিপোর্ট কর্লেন।

প্রাদেশিক কর্তার সামনে ছিল একটা ফাইল। একটা প্রমোশন হচ্ছিল এবং আমিই তাতে হকদার। কিন্তু, আমাকে যদি ডিঙ্গান যায় পরবর্তী জন তাঁর একই জেলার এবং তাঁর নিকট আত্মীয়। তিনি খুব খুশী হয়ে স্থানীয় কর্তার অসন্তোষের প্রেক্ষিতে আমাকে ডিঙ্গিয়ে তাঁর আত্মীয়কে প্রমোশন দিয়ে দিলেন।

কিন্তু, এরূপ ব্যাপারে আমার আত্মবিশ্বাস ঘা খায় না। আমার বিশ্বাস অনেক গভীর। কোরান শিক্ষা দেয় ঃ তুমি শুধু দেখবে যে স্থানের প্রতি, সময়ের প্রতি এবং সঙ্গীর প্রতি তুমি কর্তব্য করছ কি না এবং তোমাকে যে আল্লাহ্‌র কাছে ফিরে গিয়ে জীবনের জন্যে জবাবদিহী কর্তে হবে সেটা তোমার মনে আছে কি না। সব কিছুরই নিয়ন্তা আল্লাহ্‌তা'লা। বাকী সব তাঁরই হাত।

আমার যেখানে বদলী হলো সেখান থেকে গিয়ে সুন্দরবন দেখে আমার এত আনন্দ হলো—এই মহা আবিষ্কার না হলে যেন আমার জীবনই পূর্ণ হতো না। আর কয়েকবার কোল্‌কাতায় গিয়ে আমি বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে দেখা কর্তে পার্লুম এবং একখানা বই ছাপাতে পার্লুম।

সরকারের নানা রকম অফিসার আছেন। বৃটিশ সিভিলিয়ানরা অনুভব কর্তেন তাঁরা রাজার জাত। কিন্তু, এটি বাদ দিলে তাঁরা ছিলেন অত্যন্ত মানবিক, তাঁদের থেকে অনেক কিছুই শেখা যেতো।

সিভিল সার্ভিসের ভারতীয়দের অনেকের অবস্থাই ছিল বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়। নিজেকে 'সব জান্তা' বলে জাহির কর্তে চাইতেন।

একবার তখন আমি এক মহকুমা শহরে। সব অফিসার মিলে ভাইয়ের মত আছি। হঠাৎ এক জনের বদলীর আদেশ হলো। বহুদিন পরে তাঁর স্ত্রী পোয়াতী হতে যাচ্ছেন, সকলের লক্ষ্য হলো ঃ কোনরূপ ব্যাঘাৎ যেন না হয়। কি কাজে আমি সদরে যাচ্ছিলুম, সকলে মিলে আমাকে ভার দিলেন, একবার মিঃ কে, কে, সেন আই-সি-এসের সঙ্গে দেখা করে আমাদের 'রিপ্রেজেন্টেশন'খানা বুঝিয়ে দেবে।

www.pathagar.com

কে, কে, সেন দেখলুম 'সব জান্তা' শ্রেণীর অফিসার। শেষ উপায় স্বরূপ যখন বন্ধুটির স্ত্রীর গর্ভাবস্থার কথা উঠালুম, বল্লেন ঃ মিঃ আলম, আপনি কি মনে করেন, কোন্ অফিসারের স্ত্রীর কয় মাস গর্ভ চলছে সে খবর আমরা রাখিনে ? প্রত্যেকের প্রত্যেক খবরই আমাদের জানা।

এটা গলাধঃকরণ আমার পক্ষে একটু কষ্টকর হলো। কারণ, আমার স্ত্রীর কয় মাস চলছে তা-ই আমি বলতে পার্তুম না। আর, সেন আই-সি-এস্ আমাকে বিশ্বাস করাতে চাচ্ছেন এলাকার কোন অফিসারের স্ত্রীর কয়মাস গর্ভ চলছে তার খবর তিনি রাখেন!

অধস্তনদের উপর নিজের পজিশন জাহির করা অফিসারদের সাধারণ দুর্বলতা। ঐ মহকুমা হাকিম যে ঐ দুর্বলতায় আক্রান্ত হয়েছিলেন তাতে আমার কোন সন্দেহ নেই। তবে, দুর্বলতা এত বেশী যে, ইনস্পেক্টর হওয়ার পরও একটা এই ধরনের ব্যাপার আমার নজরে আসে এবং আমি কড়া মন্তব্য রাখতে বাধ্য হই।

অধস্তন অফিসাররা যে সব অবস্থার মধ্যে থেকে কাজ করেন সেটা অনুভব করে তাঁকে সাহায্যের মনোভাব নিয়ে কাজ করা আমি কর্তব্য বলে মনে করি। তাছাড়া অনেক সময় ছোট অফিসার থেকেও আমরা কিছু শিখতে পারি। মনে অতটুকুন শ্রদ্ধা থাকা চাই।

রায় বাহাদুর প্রিয়নাথ মুখার্জীর দূর মফঃস্বলে যেতে হলেই কিছু বই-পত্র নিয়ে যেতেন। সেগুলো অফিসারদের মধ্যে বিলি করে দিতেন। তাঁর মনোভাব ছিল ঃ এঁরা কোথায় পড়বার কি পাচ্ছেন! অন্ততঃ এইগুলো পড়ে মনটাকে ঝালিয়ে নিতে পার্বেন।

খান বাহাদুর আহ্সানুল্লাহ্ যেখানেই যেতেন অফিসারদের সাথে একটা হাম্দরদী ও সামাজিকতার সম্বন্ধ গড়ে তুলতেন। অনেকের জন্যে সেই সম্বন্ধ সারা জীবনের দিশারী হয়ে থাকতো।

মোটের উপর উপরিস্থ অফিসারের স্মৃতি অধস্তনের নিকট এরূপ হওয়া চাই ঃ 'একজন মানুষের মত মানুষ'।

www.pathagar.com

মুখোশধারী

এক মুখোশধারী আমার বড় কর্তা হয়েছিলেন। জর্জ বার্ণার্ড শ এক জায়গায় বলেছেনঃ তেমন লোক সম্বন্ধে সাবধান থাকবে যাঁর আল্লাহ্ আছেন স্বর্গে। অর্থাৎ, তার ভিতরে নয়, বাইরে।

একবার উনি আমাকে ডাকালেন। তাঁর কামরায় ঢুকে দেখি ঃ নামাজ শেষ করে জায়নামাজে বসে তিনি তসবিহ্ জপছেন। তাঁর তসবিহ্র মালা ছিল অসাধারণ দীর্ঘ। তিনি চোখ বুজে তসবিহ্ টিপছেন, তিনি ঢুকতেই ইশারায় আসন দেখিয়ে দিলেন। আমি বসলুম।

অতঃপর ঃ

আল্লাহ্! আল্লাহ্! আপনি সেক্রেটারীর কাছে যান ?

আমার উত্তর ঃ না।

আল্লাহ্! আল্লাহ্! মিনিষ্টারের কাছে যান ?

ফের উত্তর ঃ না।

আল্লাহ্! আল্লাহ্! যান না কেন ? আল্লাহ্ এক শখ্ছ আছেন বটে, কিন্তু অনেক দূরে, আর তেমন য়্যাক্টিভ নহেন। এঁরা কাছে এবং য়্যাক্টিভ, এঁদের কাছে যেতে হয়।

আমি ভাবলুম ঃ এই প্রভুটি মুখোশের জোরে বর্তমান পজিশনে এসেছেন। এঁর আল্লাহ্ আল্লাহ্ করার অর্থ হলো আমি আরো এক ধাপ এগুতে যাচ্ছি, তুমি তাতে বাদ সেধোনা যেন।

বড় কর্তারা আমার সাহিত্য-সাধনাকে নানা জনে নানা ভাবে দেখেছেন। আমি যখন ইন্স্পেক্টর আমি দেখতে পেতুম যে আমার ইন্স্পেকশনের বহু মন্তব্য বড় কর্তার কেরানীকুল ধামা চাপা দিয়ে রাখতেন। ফলে, অফিসগুলোর সংশোধনের ও কাজের উন্নতির কোন উপায় হতো না।

আমি দাবী কর্লুম যে যেহেতু আমি এই ডিরেক্টরেটের ইন্স্পেক্টর, বড় কর্তার অফিস ইন্স্পেকশন করেও উহার গলদগুলো তাঁর নজরে আনার আমার অধিকার থাকবে।

www.pathagar.com

অন্ততঃ পক্ষে আমার পরিদর্শন মন্তব্যগুলোর উপর ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে কি না সেটা আমার দেখতে পারা উচিত।

কিন্তু, বড় কর্তার অবস্থা হলো ঃ দশ চক্রে ভগবান ভূত। তাঁর কেরানীকুল তাঁকে বোঝালেন যে আমি তাঁর ক্ষমতায় হস্তক্ষেপ কর্তে যাচ্ছি।

আমার প্রতি কৈফিয়তের নোটিশ জারী হলো ঃ আপনি যে বই-পত্র ছাপিয়েছেন, সরকারের অনুমতি নিয়েছেন ?

কিন্তু, গভর্নমেন্ট সার্ভেন্ট্স্ কণ্ডাক্ট রুল্স্ এ বলেনা যে অনুমতির কোন প্রয়োজন আছে। শুধু এই বলে যে সরকারী চাকুরিয়া সরকারের কোন নীতিকে আক্রমণ কর্তে পার্বেনা। তবে, তাও পার্বে যদি ছদ্মনামে লিখে।

এই কৈফিয়ৎ পেয়েই কেরানীকুল ঠাণ্ডা। তবে, আমার প্রস্তাব আর এগুতে পার্লোনা। যাকে বলে ঃ ষ্টেইল-মেট।

তবে, মুখোশধারীর ব্যাপারটা আরও আগের। তখন আমি সবে মাত্র 'সুপারসিডেড' হয়ে খুলনায় জেলা সাব-রেজিষ্ট্রার রূপে বদলী হয়েছি।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে মুসলমানদের একটা অংশ মনে কর্তেন ঃ ভারতে কোম্পানীর রাজত্ব 'দারুল হবর' শত্রুর রাজত্বে এবং এটার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা মুসলমান মাত্রেরই অবশ্য কর্তব্য। ইতিহাসে এঁরা ওহাবী নামে পরিচিত। বাংলাদেশের ফরায়েজীরা এটার একটা অংশ।

'মুসলমান' সমস্যা নিয়ে একটা পুরো সমীক্ষা করেছিলেন তখনকার জাঁদরেল সিভিলিয়ান ডব্লিউ ডব্লিউ হাণ্টার। তাঁর পরিচয় তাঁর সুবিখ্যাত গ্রন্থ 'ইণ্ডিয়ান মুসলমান'। ওতে তিনি বলেছেন ঃ মুসলমানরা বিদ্রোহ কর্বে না ? ইসলামিক বিধানে কাজী হলেন সমাজের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। তোমরা কি কাজীর পদটা তুলে দাও নি ?

সরকার তখন তার ভুল বুঝতে পারে এবং সাত তাড়াতাড়ি কাজীর পদ পুনরায় সৃষ্টি করে—নূতন আইন করে।

কিন্তু, এটা ছিল মস্ত বড় ফাঁকি। কারণ, মুসলিম রাজত্বে কাজীরা ছিলেন বিচারের প্রভু—একাধারে দেওয়ানী, ফৌজদারী এবং শরীয়তী বিচার কর্তেন। নূতন আইনে কাজীরা হলেন মুসলমানদের বিয়ে এবং তালাকের রেকর্ড রাখার মালিক। কাজ কিছুই না। কেননা এগুলাও বাধ্যতামূলক ছিল না। তবে, সনদ দিতেন স্বয়ং সেক্রেটারী এবং গেজেটে আড়ম্বর করে সেটা বিজ্ঞাপিত হতো।

এই ফাঁকিটা আমার চোখে ধরা পড়ে গিয়েছিল। আমি কাজীদের দুর্দশাটা মনেপ্রাণে অনুভব কর্তুম। আর, এই প্রথাটা আলেমদের মধ্যে একটা বড় রকমের অনৈক্যের কারণও হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ধরুন, যেখানে ঢাকা ও অন্যান্য মুসলিম সেন্টারের কাজীর আয় ছিল মাসে হাজার দেড়-হাজার টাকা সেখানে সিলেটের কানাইর ঘাটের কাজী সাহেব সারা বছরে আয় করেছেন কুল্ল বার টাকা।

www.pathagar.com

আমার প্রস্তাব হলো ঃ কাজীদের বেতনধারী করে একটা ক্যাডার সৃষ্টি করা এবং ইসলামে কাজীর যে ভূমিকা ছিল তার কিছু কিছু উদ্ধার করে তাঁদের পূর্ব গৌরবে যতখানি সম্ভব প্রতিষ্ঠিত করা।

এই মর্মে আমার একটা প্রবন্ধ দৈনিক 'আজাদ'-এ বের হলো।

দেখি ঃ সঙ্গে সঙ্গেই বড় কর্তার অফিস থেকে প্রতিক্রিয়া। এই প্রবন্ধের জন্যে আমাকে অভিনন্দন জানিয়ে এবং এটা যা'তে পূর্ণাঙ্গ করা হয় সে জন্যে অনেক উৎসাহ দিয়ে আমাকে বড় কর্তা মুখোশধারীর এক চিঠি।

ব্যাপার হলো, মুখোশধারীর অবসর গ্রহণের তারিখ ঘনিয়ে আসছে। তিনি এমন একটা ইস্যুর সন্ধান করছিলেন যেটা খাড়া করে তিনি সরকারের নিকট চাকুরির মেয়াদ বৃদ্ধি দাবী কর্তে পারেন। এখন কাজীদের বেতন-ধারী করা তাঁর মনে হয়েছে তেমন একটি ইস্যু।

সঙ্গে সঙ্গে তিনি চলে এসেছেন খুলনা ঃ অবশ্য আমার অফিস পরিদর্শনের অছিলা করে।

আমাকে বল্লেন ঃ আপনি ঢাকা এসে আমাকে একটা স্কীম তৈয়ার করে দেবেন। সরকার আপনাকে ঢাকার ডিষ্ট্রিক্ট রেজিষ্ট্রার করা ঠিক করেছেন এবং ছয় মাসের মধ্যেই আপনি ইন্‌স্‌পেক্টর হতে যাচ্ছেন।

আমি বল্লুম ঃ ঢাকা যাব কোন্ অজুহাতে ?

বল্লেন ঃ আমাকে লিখবেন যে আমাদের কোন কোন ফরম ফুরিয়ে গেছে। সেগুলো আনতে আমি ঢাকা যেতে চাই। আমি মঞ্জুর করে দেব।

আমি বল্লুম ঃ ফরম আনতে পিয়ন বা কেরানীরাই গিয়ে থাকে। জিলার দায়িত্ব ছেড়ে জিলা সাব-রেজিষ্ট্রার যাবেন কেন ?

মুখোশধারী ভারী চটে গেলেন। বল্লেন ঃ এই জন্যই তো আপনার হয় না। আপনি যে সকলের চেয়ে বেশী জানেন।

মুখোশধারী যশোরের কলেক্টরের জাহাজ চেয়ে নিয়েছেন। নওপাড়ার পীর সাহেবের বাড়ী গিয়ে পানি-পড়া নিয়েছিলেন এবং সেই পড়া পানি পুরে নিয়েছিলের জাহাজীদের একটা কলসীতে।

আমি তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে গিয়ে দেখি জাহাজীদের এবং তাঁর পিয়নদের মধ্যে মাইর লাগার উপক্রম। এক কলসী দুই পক্ষই চেপে ধরেছেন। জাহাজীদের দাবী ঃ আমাদের কলসী। পিয়নদের দাবী ঃ আমাদের পানি-পড়া।

আমি নূতন একটা কলসী আনিয়ে দিয়ে বিবাদ মিটিয়ে দিলুম।

বাগেরহাট পরিদর্শন করে তিনি ফিরছেন। আমি অভ্যর্থনা জানাতে গেলুম। দেখি ঃ তাঁর জনা-দুই পিয়নের হাতে অনেকগুলি মোরগ চ্যাঁ চ্যাঁ করছে। বল্লেন ঃ অমুক কিছুতেই ছাড়লে না, এ সব মোরগ গছিয়ে দিলে।

www.pathagar.com

আমার হাতে খপ করে পাঁচ টাকার নোট ধরিয়ে দিলেন। বল্লেন ঃ মূল্য বাবদ এই টাকা অমুককে দেবেন।

যেদিন ঢাকা ফিরে যাচ্ছেন আমি ষ্টীমারে বিদায় দিতে গেলুম। সঙ্গে আমাদের জয়েন্ট সাব-রেজিষ্ট্রার। তিনি আবার রেশন টিন ভরে খানা নিয়ে এসেছেন। খানা দেখে 'মুখোশধারী' জিগ্যেস কর্লেন ঃ এতে কি ? জয়েন্ট বল্লেন ঃ সামান্য খানা, হুজুরের জন্য এনেছি।

'মুখোশধারী'র চোখ চক্ চক্ করে উঠলো। জিগ্যেস কর্লেন ঃ নামাজ পড় ? জয়েন্ট উত্তর কর্লেন ঃ পড়ি, হুজুর। মুখোশধারী পিয়নকে ইশারা কর্লেন ঃ নিয়ে যাও।

জয়েন্ট অবশ্য নামাজ পড়েন না। তবে মুখোশধারী একটা ছুতা খুঁজছিলেন—খানাটা গ্রহণ করার জন্যে। জয়েন্টের উত্তরের মধ্যে তিনি সেটা পেয়ে গিয়েছিলেন।

ঢাকায় পৌছেই তিনি আমাকে সরকারী চিঠি লিখলেন ঃ আপনার অফিস যে আমি পরিদর্শন কর্লুম কোন কোন বিষয় আরও খোলসা হওয়া আবশ্যক। সেজন্যে আপনি অগৌণে একবার ঢাকায় আসুন।

ঢাকায় গেলুম। 'মুখোশধারী' মনে করেছিলেন স্কীমটি তৈয়ার করতে অন্ততঃ দশটি দিন তো আমার লাগবে। আমি তাঁর অফিস থেকে প্রয়োজনীয় পরিসংখ্যানগুলো নিলেম। আমার দু'জন বন্ধুর উপর নির্ভর কর্লুম। এ এফ এম আবদুল হক এ ডি পি আই। তিনি আমাকে সকাল-বিকাল চা-নাস্তা খাওয়াবেন আর তাঁর ষ্টেনো আমার যাবতীয় টাইপ ইত্যাদি করে দেবেন। আর কাজী মোতাহার হোসেন, পরিসংখ্যান বিভাগের হেড্, ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের। তিনি তাঁর কার্জন হলস্থ দফতরে আমাকে দুপুরের খানা খাওয়াবেন আর স্কীমে যত আঁকজোক দরকার সেটা করে দেবেন। চতুর্থ দিনে স্কীম তৈয়ার করে দাখিল করে দিলুম।

স্কীমটার গুরুত্ব সকলে স্বীকার করলেন। মন্ত্রী ছিলেন মফিজুদ্দীন সাহেব, ঠাণ্ডা মাথার বিচক্ষণ লোক। আমি খুলনা ফিরে যাবো বলে বড় কর্তার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলুম। এটা ঘটেছিল তখন যখন 'মুখোশধারী' বড় কর্তা আমাকে বলেন যে আমি মিনিষ্টারের সঙ্গে দেখা কর্তে যাই না কেন।

ব্যাপার হলো, স্কীমটার কোথাও আমার নাম ছিলনা। ওটা দাখিল করা হয়েছিল বড় কর্তার নামে। বড় কর্তা একটা বৈঠকও করেছিলেন মন্ত্রীর সাথে। বেঠকের পর মফিজুদ্দীন সাহেব জিগ্যেস করেন, খুলনার ডিষ্ট্রিক্ট সাব-রেজিষ্ট্রার মাহ্বুব-উল আলম ঢাকায় আছেন কি না। তিনি হ্যাঁ বলতেই মফিজুদ্দীন সাহেব বলে দেন তিনি যেন কাল অফিসে আমার সঙ্গে দেখা করেন।

অফিসে তিনি আমাকে এমনভাবে গ্রহণ কর্লেন যেন অনেকদিন থেকে আমাকে চেনেন। চা খাওয়ালেন, জিগ্যেস করলেন স্কীমটা আমিই রচনা করেছি কি না। আমি বল্লুম ঃ জী, হ্যাঁ। কিছু কিছু আলোচনা কর্লেন। বল্লেন ঃ আরো আলোচনা কর্তে হবে।

বাসায় ফিরে দেখি 'মুখোশধারী' লোক পাঠিয়েছেন এখনই যেন বাসায় গিয়ে দেখা

www.pathagar.com

করি। দেখা হতেই আমাকে দিলেন এক বকা। 'আপনি তো নিজেকে ফলাও করে এসেছেন। মফিজুদ্দীন সাহেবকে বলেছেন স্কীমটি আপনিই করেছেন' ইত্যাদি ইত্যাদি।

আমি মহা ফাঁপরে পড়ে গেলুম। স্কীমটা আমিই তৈরী করেছি। মফিজুদ্দীন সাহেব যখন জিগ্যেস কর্লেন সেটা অস্বীকার করার কোন কারণ ছিলনা।

'মুখোশধারী' বল্লেন ঃ আপনি কালই খুলনা ফিরে যেতে পারছেন না। কাল বিকেল চারটায় আমার বাসায় আসবেন।

গেলুম। তিনি আমাকে নিয়ে বের হলেন। বুঝলুমঃ মফিজুদ্দীন সাহেবের বাসায় চলেছেন।

সেখানে পৌঁছে অন্য চাল। বল্লেন ঃ আমার এই সাব-রেজিষ্ট্রার সাহেবকে দিয়ে সেই স্কীম করিয়েছি। তাঁকে আপনার কাছে নিয়ে এসেছি। মফিজুদ্দীন সাহেব প্রশান্ত ভাবে হাসতে থাকলেন। আমাদের চা-নাস্তা খাওয়ালেন।

এই স্কীমের দরুণ মুখোশধারী চাকুরির মেয়াদ বাড়িয়ে পেলেন, আমি ঢাকার ডিষ্ট্রিক্ট রেজিষ্ট্রার হলুম, ছয় মাসের মধ্যে ইন্‌স্‌পেক্টর হয়ে আগের সুপারশেসনের প্রতিশোধ নিলুম। মুখোশধারী বল্লেন ঃ প্রথমেই গিয়ে তার অফিসটি পরিদর্শন কর্বেন।

কিন্তু, খাজা নাজিমুদ্দীন সামনের নির্বাচনের প্রেক্ষিতে ইসলামী কেন্দ্রের কাজীদের বিরাগভাজন হতে রাজী হলেন না। তিনি ভাবলেন নির্বাচনে কাজীরা বিশেষ সহায়ক হবেন। কিন্তু, নির্বাচনে 'যুক্তফ্রন্ট' জিতে যায়।

ঢাকায় যখন কাজ করছি তখন সাব্-রেজিষ্ট্রারদের বিভাগীয় পরীক্ষার তদারক আমাকে কর্তে হয়। আমার একটা নিয়ম কাজ ফেলে রাখিনে, সঙ্গে সঙ্গে সেরে রাখি।

পরীক্ষার তিনটা অংশ ঃ বই না দেখে, বই দেখে এবং প্রাকটিক্যাল।

এই পরীক্ষার্থী শিক্ষা-নবিশি সাব-রেজিষ্ট্রার হলেও তাঁর ছোট ভাই ছিলেন কনষ্টিউয়েন্ট য়্যাসেমব্লীর ক্ষমতাশালী সদস্য। সাব-রেজিষ্ট্রারের ব্যাপার হলো "বই দেখে" পরীক্ষায় তিনি এক গাদা হাতের লেখা নোট বই নিয়ে আসতেন। উত্তরের জন্য নোট বই ঘাঁটতে ঘাঁটতে তাঁর মাথা গরম হয়ে যেতো—ফলে তিনি নির্ঘাৎ ফেল কর্তেন।

ফল ঘোষণা করা হবে। মুখোশধারী আমাকে তাঁর চেম্বারে ডেকে পাঠালেন। কোন কোন দিন তিনি রোযা রাখতেন। সেদিনও রোযা রেখেছিলেন। এবং তখন 'অজিফা' পাঠ করছিলেন। অন্ততঃ অজিফা তাঁর সামনে খোলা ছিল।

আমাকে বল্লেন ঃ গ্রেইস দিতে হবে।

আমি জিগ্যেস কর্লুম ঃ কত নম্বর ?

বল্লেন ঃ যত নম্বর দিলে সদস্যের ভাই পাস হয়ে যায় তত নম্বর। আমি বল্লুম ঃ অসম্ভব। তা হলে সব ওলট পালট হয়ে যাবে। এটা মেনে নেওয়া ছাড়া তাঁর পক্ষে উপায় ছিল না। কারণ ফল ঘোষণার জন্যে কোন কাজই বাকী ছিল না।

www.pathagar.com

একদিন এক রবিবার হঠাৎ তাঁর বাসায় যেতে হলো। পিয়ন এমন জায়গায় আমাকে বসতে দিল যাতে বৈঠকখানার ভিতরটা আমি দেখতে পাই, কথাবার্তাও শুনতে পাই। অথচ, নিজে অদৃশ্য থাকি।

কয়েক জন সাব-রেজিষ্ট্রার এসেছেন। একজন এনেছেন ঝিটকার হাজারী গুড়। তিনি সেটা গ্রহণ কর্লেন। তিনি সাব-রেজিষ্ট্রারকে দু'টা টাকা ফেলে দিলেন। গুড়ের দাম অবশ্য অনেক বেশী।

তিনি সাব-রেজিষ্ট্রারদের বলছিলেন ঃ ঘি দেবেন পাঁচ সেরা টিনে, আর মধু এক এক সেরা বোতলে—যেন একটার পর একটা খুলে খেতে কোন অসুবিধা না হয়।

সাব-রেজিষ্ট্রাররা চলে গেলেন। তাঁর এক ছেলে ঢুকল আমার বসার জায়গায়। সে পাঁচ আঙ্গুলই মধুতে ডুবিয়েছিল। এখন একটার পর একটা আঙ্গুল চুষে খাচ্ছে।

আমি তাকে দিয়ে খবর পাঠালুম ঃ ঢাকার ডিষ্ট্রিক্ট রেজিষ্ট্রার দেখা করতে এসেছেন।

দেখা হতেই প্রথমে বাগেরহাটের মোরগ বাবদ সেই পাঁচ টাকা তাঁকে ফেরৎ দিলেম। বল্লুম ঃ সেই সাব-রেজিষ্ট্রারের সঙ্গে আমার দেখার সুযোগ হয়নি। আর সামান্য জিনিস দাম দেওয়ার প্রয়োজন কি ?

সাব-রেজিষ্ট্রাররা অনুমতি না নিয়ে এলাকা ছেড়ে আসতে পারেন না। আর, যা দেখলাম, শুনলাম কি করা ?

অনেক চিন্তা করে দেখলাম ঃ নিজের শক্তিতেই আমাকে প্রতিকার কর্তে হবে।

বৎসরে একবার অফিসারদের সম্বন্ধে কনফিডেনশিয়েল রিপোর্ট দিতে হবে।

আমি এক গোপন সার্কুলার জারী কর্লুম ঃ আমার নজরে এসেছে যে কোন কোন অফিসার অনুমতি না নিয়ে এলাকা ছেড়ে আসেন এবং কেউ কেউ উপরিস্থকে বাজারের চেয়ে অবিশ্বাস্য কম দরে কোন কোন জিনিস 'অফার' করে থাকেন। এরূপ স্থলে কনফিডেনশিয়েল রিপোর্টে আমি তাঁদের বিরুদ্ধে প্রতিকূল মন্তব্য লিপি কর্তে বাধ্য হবো।

www.pathagar.com

আভিজাত্যের ফাটল

সব অফিসারে মিলে, সব বন্ধুতে মিলে—বেশ চলছিল। হঠাৎ বন্ধুত্বে এক ফাটল সৃষ্টি হয়ে গেল।

অফিসার হিসেবে দশ জন নানা পথ থেকে এসে এক জায়গায় মিলেছি। কার বাড়ি কোথায়, কার সামাজিক দাঁড় কি রকম তা' আমাদের জানা নেই। এমন কি অনেকের পূর্বেতিহাস পর্যন্ত।

এখন এক জনেরটা ভয়ানক প্রকট হয়ে পড়ল। আভিজাত্যের ফাটল বেয়ে প্রকাশ হয়ে পড়ল আমাদের হাশিম আসলে চাষী পরিবারের ছেলে, তবে পড়াশুনায় ছিল খুব ভাল, ফলে অফিসার হয়ে যায়।

বৃটিশ অধিকারের প্রাক্কালে এদেশে মুসলমানদের মধ্যে মিঞা-বিবি বাঁদী-গোলাম ভেদ ছিল। বাঁদী-গোলাম মানে ক্রীতদাস, ক্রীতদাসী। এদের বংশধরেরাও 'খরিদা বাঁদী-গোলাম' গণ্য হতো। এদের মুক্ত হওয়ার কোন উপায়ই ছিলনা। বৃটিশ আইন করে—এবং ইংরেজী শিক্ষার ফলে এদেশে গণতান্ত্রিক ভাব-ধারা অনুপ্রবেশের ফলে ক্রমে এই প্রথা লোপ পায়।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলের সব চেয়ে বড় কৃতী পুরুষ চট্টগ্রামের খাঁ বাহাদুর হামিদুল্লা খাঁ একাধারে ছিলেন বড় অভিজাত, শ্রেষ্ঠ বিদ্বান ও লেখক (যদিও আরবী, ফার্সী এবং উর্দুতে) এক পিয়নের ছেলে (যদিও লেখা-পড়া এবং যোগ্যতার বলে) হাকিমী চাকুরি পাওয়ায় তাঁর ইতিহাস "আহাদিসুল খাওয়ানীন"-এ তিনি অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন।

অভিজাতদেরও আবার তর-তম ছিল। সামাজিক অনুষ্ঠানে কার পক্ষে কার 'সফ' (পাটি ঃ আসন) পড়বে সেটা সুনির্দ্দিষ্ট ছিল। এমন কি আদালতে মোকদ্দমা করে আদালতের রায় দ্বারা এটা সুপ্রতিষ্ঠিত করা হতো। হামিদুল্লা খাঁ দুঃখ করেছেন যে চট্টগ্রামে লাট সাহেব আসলে যে দরবার অনুষ্ঠিত হয় তাতে মান রাজাকে তাঁদের অগ্রে আসন দেওয়া হয়েছিল। তিনি আঁৎকে উঠে বলেছেন ঃ ওতো আমাদের প্রজা।

হাশিম অফিসার হয়ে সরকারী জরীপের কাজে যোগ দেন। একবার তাঁদের ক্যাম্প্

www.pathagar.com

পড়েছিল এক প্রাচীন অভিজাত মুসলমান জমিদার বাড়ীতে।

তখন অভিজাত পরিবারগুলোর শেষ অবস্থা। ছেলে-মেয়েদের চেহারাগুলো হয়ে গেছে বে-সাইজ ও অ-কর্মা। দায়ের চেয়ে ডাঁট হয়ে গিয়েছে বড়। মনিবদের চেয়ে বাঁদী-গোলামদের সংখ্যা অনেক বেশী।

বাঁদীদের তবুও কর্মের চেহারা ছিল।.আর, অভিজাত পরিবারে পুরুষদের নারী ঘটিত দুর্বলতা সুবিদিত ছিল। বহু পুরুষ বাঁদীর ঘরে সন্তান উৎপাদন করে বসেছিলেন। ফলে, 'বিবির ঘরের সন্তান' এবং 'বাঁদীর ঘরের সন্তান' বলে কথা চালু হয়ে গিয়েছিল।

এককালে দেখা যেতো 'মহলে' বৃদ্ধা বিবি ছেলে-মেয়ে নিয়ে বাস কচ্ছেন। আর বাড়ির দরজায় কুঁড়ে ঘর উঠিয়ে মিঞা তাঁর ছুক্‌রি বাঁদীকে নিয়ে নূতন সংসার পেতেছেন।

কোন কোন মিঞা আবার এই দৃষ্টি-কটু ফ্যাসাদে পড়তে চাইতেন না। তিনি বাঁদীর জন্যে একটা শিখণ্ডী স্বামী যোগাড় করে নিতেন। তবে, বেচারী স্ত্রীর শয্যার ভাগ পেতোনা। কারণ, সে শয্যা জুড়ে থাকতেন মিঞা নিজে। ছেলে-পুলে জন্মাতো মিঞার হুবহু আদল নিয়ে। লোকে ব্যাপারটা বুঝতো। কিন্তু, বলা হতো ওরা শিখণ্ডীরই ছেলে-পুলে।

এই পরিস্থিতিতে কিছু পরিমাণে সমস্যা দাঁড়াতো বিবির ঘরের মেয়েদের নিয়ে। ফলে, একটু বেশী পর্যন্ত ওরা আইবুড়ো থাকতে বাধ্য হতো।

এই জমিদারেরও তেমন মেয়ে ছিল। হাশিমের উপর নজর পড়তেই তিনি খোঁজ নিতে লাগলেন। দেখা গেলো ঃ সবই ভালো, তবে চাষী পরিবারে কোন অভিজাত নেই। কী আর করা ! অবস্থা দিন দিনই প্রতিকূল হয়ে পড়ছে। তিনি অগ্রণী হয়ে হাশিমের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিয়ে দিলেন।

মেয়ে অনেক যৌতুক সঙ্গে আনল। সবচেয়ে বড় যৌতুক হল 'বুবী'—এক জল-জ্যান্ত মানুষ। কিন্তু, সে ক্রীতদাসী, কালা ও বোবা বলেই তার ডাক-নাম বুবী।

কিন্তু কালা এবং বোবা হলেও 'বুবী'র এককালে দেহ সম্পদ ছিল। তার একটি মেয়ে আছে, ঐ মেয়েরও বিয়ে হয়ে গিয়েছে। বুবীকে সঙ্গে দেওয়া মানে হাত-পা বেঁধে তাকে জমিদার নন্দিনীর হরেক রকমের জুলুমের একটা জীবন্ত টার্গেট করে দেওয়া।

সেই টার্গেটের তিনি উত্তম ব্যবহার করেছিলেন।

রাগের মাথায় দায়ের কোপ বসিয়ে দিয়েছিলেন। বুবীর বাহুতে সেটা ঘা হয়ে আছে। চুরি করে খেয়েছে এই সন্দেহে আগুন ফুঁকবার চোঙ্গা গরম করে তার গালে সেঁকা দিয়েছেন—তাতে ওঠ পুড়ে বিশ্রী ঘা হয়েছে।

বিবি সাহেবা এমনি লোক খারাপ ছিলেন না। তবে বাঁদীর ব্যাপারে অন্য কথা। বলতেন ঃ আমরা বহু পুরুষ ধরে বাঁদী-গোলাম শাসন করে আসছি। যাদের বংশে কখনও বাঁদী-গোলামের পাট ছিলনা তারা যেন আমাদের শেখাতে না আসে।

বাঁদী-গোলাম না থাকার অপরাধ সকলের আগে ছিল হাশিমদের পরিবারে। হাশিম বিবি সাহেবের ভয়ে জড়সড় হয়ে থাকতো।

www.pathagar.com

নিয়ম দাঁড়িয়ে গিয়েছিল ঃ যে কোন অপরাধে বুবী বিবি সাহেবার মার খেয়েই পার পেতোনা। হাশিম ঘরে আসা মাত্রই বিবি সাহেবা বুবীর বিরুদ্ধে তাকে লাগাতেন। তখন বুবীকে হাশিম আর এক প্রস্থ পিট্‌টি দিতে হতো। অন্যথায় শোবার কামরায় চলতো ভীষণতম অসহযোগ—যা' ঐ বয়সে হাশিম সইতে পার্তো না।

এই পরিস্থিতিতে বুবীর মাঝে মাঝে পালিয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় ছিলনা। কিন্তু পালিয়ে যাবে কোথায় ? ছোট্ট শহর। ফেরীওয়ালাদের মুখে বিবি সাহেবা খবর পেতেন কোথায় বুবী আশ্রয় নিয়েছে। অতঃপর পিয়নকে দিয়ে তাকে ধরিয়ে এনে জবর এক প্রস্থ পিট্‌টি দিতেন।

ক্রমে সমগ্র শহর বুবীর জন্যে সহানুভূতি বোধ কচ্ছিল।

হাশিমের বড় ভাই—বাড়ীতে চাষ-বাস করেন—একবার বেড়াতে আসলেন। বুবীর ব্যাপার দেখে মনে দুঃখ পেলেন। বৌকে ডেকে বল্লেন ঃ বাছা, তোমার না পোষায় তাকে ছাড়িয়ে দাও, অন্য লোক রাখ। এরূপ বে-ইন্‌সানী মারধর কর কেন ?

বৌ বল্লে ঃ আপনাদের বংশেতো কোনদিন বাঁদী-গোলাম ছিলনা। আপনারা এসব জানবেন কী করে ?

এই উত্তরে সরল চাষী মানুষটি এমন আঘাত পেলেন যে তখনই তল্পি-তল্পা গুটিয়ে বাড়ী চলে গেলেন। হাশিমের এক ছোট ভাই তার সঙ্গে থেকে স্কুলে পড়ে। এবার রাগে ফেটে পড়লো ছেলেটি। বল্লে ঃ ছোট বেলায় বাপ মরেছেন। এই বড় ভাই-ই বাপের মত করে আমাদের পেলেছেন পুষেছেন, লেখাপড়া করিয়েছেন, মানুষ করেছেন। তাঁর এই অপমান ? আমি তোমাদের সঙ্গে থাকতে রাজী নই, সেও চলে গেল বাড়ী।

হাশিমের সঙ্গে সবচেয়ে বেশী বন্ধুত্ব ছিল হামিদের। উভয়ে একই ক্যাম্পে জরীপের অফিসার হয়ে ঢুকেছিল। হামিদ শনৈঃ শনৈঃ উন্নতি করে এডিশনাল ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট পর্যন্ত হয়েছিল চাকুরির শেষ ভাগে।

হামিদ আমারও বিশেষ বন্ধু ছিল। পরে দেখা গেল, অতখানি যোগ্যতা নিয়েও 'অর্ধেক তার নারী'—অর্থাৎ মেয়েদের ন্যায় পেটে সে কোন কথাই রাখতে পার্তো না। এর কথা ওকে বলে বেড়াতো—নিজস্ব একটা ফোড়ন দিয়ে। যার ফলে, ভুল বোঝাবুঝি হতো। কখনও কখনও বন্ধু-বিচ্ছেদও ঘটতো। মজার কথা হলো ঃ হামিদ নিজেই স্বীকার কর্তো ঃ আমি তোদের মত পেটে এত কথা জমিয়ে রাখতে পারিনে।

বুবীর প্রথম পলায়ন হতো হামিদের বাড়ীতে। হাশিমের পর হামিদকেই সে সবচেয়ে বেশী চেনে। কিন্তু, হামিদ তাকে যেমন রাখতে পার্তো না, তার বিষয়ে কি যে উপায় করা যাবে তাও ভেবে পাচ্ছিল না।

অবশেষে সে পেটের ভিতর একটা বুদ্ধি পাকিয়ে ফেল্লে। বুবী আবার পালিয়েছিল। প্রথমেই আসে হামিদের বাড়ী। হামিদ তাকে সঙ্গে করে এনে আমার বৈঠকখানায় ঢুকিয়ে দিয়েছিল। হামিদ ঠিক করেছিল ঃ বুবীকে নিয়ে যদি একটা লড়াই বাধাতে হয় তাহলে মাহ্‌বুব-উল আলমই হবে উপযুক্ত সেনাপতি।

www.pathagar.com

আমি এর কিছুই জানতুম না।

তখন রমজান মাস। সেহ্‌রী খেয়ে উঠে আমার ছেলে মেয়েরা আবিষ্কার করে চেঁচিয়ে উঠে যে বৈঠকখানায় একটা মেয়ে চুপ করে বসে আছে এবং সঙ্গে সঙ্গেই দ্বিতীয় আবিষ্কার সে হাশিম সাহেবের চাকরানী বুবী।

আমরা তাকে সেহ্‌রী খাওয়ালুম।

ইশারায় বুবী অনেক কথাই বলতে পারে। সে জানালে ঃ সে কিছুতেই আর হাশিম সাহেবের ওখানে যাবেনা। তারপর সারা অঙ্গে মারের দাগগুলি দেখালে।

আমি মহা ফাঁপরে পড়লুম। আব্বাকে স্মরণ হলো। যিনি সমাজপতি মানুষ—আর সারা জীবন সামাজিক অবিচার অনাচারের বিরুদ্ধে লড়েছেন।

আমাদের অঞ্চলে বাঁদী-গোলাম প্রথাকে তুলে দিতে যিনি সবচেয়ে বেশী লড়েছেন তিনি ছিলেন আব্বা।

একবার আমার বদলী হয় এক পীর প্রভাবিত অঞ্চলে। পীরের সঙ্গে আমার খুব খাতির জমে যায়। দেশের বাড়িতে আমার স্ত্রীর এক সন্তান প্রসব হয়েছিল। শুনে পীর সাহেব আমাকে এক চতুর্দ্দশী রূপসী বাঁদী দান কর্লেন—সন্তান কোলে করে আমার স্ত্রীকে সাহায্য করবে বলে। আমি পিয়নকে সঙ্গে দিয়ে বাড়িতে পাঠিয়ে দিলুম।

কিন্তু, পিয়ন ফিরে আসতেই তাকে সঙ্গে নিয়ে এলো। খবর ঃ মৌলবী সাহেব (আব্বা) বলেছেন ঃ আমার ছেলেকে বলো ঃ তার শরাফতী মধ্যাহ্ন গগনে পৌঁছেছে—যেহেতু সে আমাদের জন্য বাঁদী পাঠিয়েছে। কিন্তু, তাকে যদি রাখি শরাফতীর সূর্য অমনি অস্ত গগনে ঢলে পড়বে। আর তার সন্তানকে কোলে নেওয়ার জন্য আমরা বুড়াবুড়িই তো আছি।

ক্রমে আমার ব্যবস্থাপনায় নিয়ম দাঁড়িয়ে গিয়েছে যে চাকরানী দিন-মানে কাজ করে তার নিজের ডেরায় চলে যায়। রাত্রে আমার বাসায় শোয় না।

বাবার চেষ্টা ক্রমে সাফল্য লাভ কচ্ছিল। আমার বড় ভাইয়ের বিয়ে হয় মীর-বাড়ী থেকে। আব্বা অবশ্যই বরযাত্রীদের হাত ধোয়াবার জন্য বাঁদী-গোলাম নিয়ে যাননি। মীরেরা বল্লেন ঃ আমরা সৈয়দ, কারও হাত ধোয়াইনা। আব্বা তখন আমাকেই আদেশ কর্লেন বরযাত্রীদের হাত সাফ করিয়ে দিতে।

পরের বৎসর ঃ আমার বিয়ের সময় আমার শ্বশুর আমার শাশুড়ীকে আদেশ কর্লেন মহিলা বরযাত্রীদের হাত-সাফ করাতে। তিনি বল্লেন ঃ আমি সৈয়দের মেয়ে। বাপের বাড়ীতে কেউ যদি শোনে যে আমি বরযাত্রীদের হাত সাফ করিয়েছি, আমাকে আর কখনও ঘরে উঠতে দেবে না। আমার ফুফু-শাশুড়ী স্বয়ং হাত-সাফ করানোর ভার নিয়ে পরিস্থিতিটা বাঁচিয়ে দেন।

তারও পরের বৎসর ঃ আমার জ্যেঠতুত ভাইয়ের বিয়েতে কন্যা-বাড়ীর যিনি সব চেয়ে বর্ষীয়ান বড় মুরুব্বী, মজলিসে তিনি উঠে পড়ে বল্লেন ঃ আমার একটা নিবেদন আছে। আমাকে সকলের হাত ধোয়ানোর সুযোগ দিবেন।

www.pathagar.com

ততদিনে রটে গেছে যে হাত-ধোয়ান সওয়াবের কাজ।

কিছুক্ষণ পরেই হাশিমের পিয়ন এসে উপস্থিত। প্রশ্ন ঃ বুবী আপনার এখানে এসেছে ? উত্তর ঃ এসেছে। ডেকে নিয়ে যাও। কিন্তু, ডেকে নেবে কি ? বুবী ইশারায় বলছে ঃ আমি যাব না। আর ওদিকে গিয়ে আমার স্ত্রীর আড়ালে লুকিয়েছে। পিয়ন চলে গেল।

খানিক পরেই আবার এসে উপস্থিত। বল্লে ঃ সাহেব বলেছেন, আপনি যেন তাকে বাড়ী থেকে বের করে দেন। আমি ভয়ানক গরম হয়ে গেলুম। বল্লুম ঃ আমি তাকে ডেকে এনেছি ? তাকে বের করে দেওয়ার দায় আমার হবে কেন ? আর, সে যদি যেতে না চায়, কিরূপে তাকে বের করে দেব ! আমার ছেলে-মেয়েদের কাছেও কি আমার একটা মান-ইজ্জৎ নেই ? সেটা রক্ষা কর্তে হবে তো!

ততক্ষণে আমি ক্লাবে গিয়ে পৌঁছেছি। জানতুম ঃ ওখানে ফ্লাশ খেলায় রত হাশিমকে পাওয়া যাবে। পেছন পেছন তার পিয়নও গিয়ে উপস্থিত। আমাকে এড়িয়ে সে সোজা পিয়নকে প্রশ্ন কর্লে ঃ বুবীকে এনেছ ? সে বল্লে ঃ না। সাব-রেজিষ্ট্রার সাহেব তাকে বের করে দেননি। সঙ্গে সঙ্গেই হাশিমের ক্রুদ্ধ স্বর ঃ আপনি কেন তাকে বের করে দেননি ? আমার আরও ক্রুদ্ধ জবাব ঃ সে দায় আমার হবে কেন ? লজ্জা করে না ?

দুইজনে আস্তিন গুটাগুটির জোগাড়। খেলা ভেঙ্গে গেল। এস্-ডি-ও বল্লেন "ষ্টেইট্ অব ডেনমার্ক ইজ ভেরী ভেরী ব্যাড্। (ডেনমার্কের অবস্থা খুব খুব খারাপ)।

ষ্টেশনে একটা থম্‌থমে ভাব। হাশিমের সাথে আমার বাক্যালাপ নেই। তবে, বেশীর ভাগ লোকেরই মনোভাব, এবার বিবি সাহেবা শক্ত পাল্লায় পড়েছেন। দেখা যাক, কি ঘটে।

আমার ছেলে-মেয়েরা বুবীকে একটা নাম দিয়েছে, বুবী ডাকে না। আছে বেশ সুখে শান্তিতে। কিন্তু, তাকে নিয়ে আমি কি করবো। তার একমাত্র আনন্দ তার মেয়েটিকে নিয়ে। হাতের কড়ে আঙ্গুলের নখের পিঠে গোল করে নক্‌শা ঘুরালে সে বোঝে তার মেয়েটির কথা হচ্ছে। তখন আনন্দে তার চোখ বিস্ফারিত হয়ে যায়। কিন্তু, আমার কোন সাধ্যি নেই যে মা ও মেয়েতে দেখা করিয়ে দেই।

ভাবনায় পড়ে গেছি।

ওদিকে বিবি সাহেবাও মুশকিলে পড়ে গেছেন। একবার দেশ থেকে ঘুরে আসতে চান। কিন্তু, অভিজাত ঘরের মেয়ে কখনও বাঁদী ছাড়া চলতে পারে ? আর, বুবীকে না নিয়ে গেলে হাজারো প্রশ্ন উঠবে যে।

এবার বিবি সাহেবার পক্ষ হয়ে এলো হামিদ। বল্লে ঃ তুমি তাঁর মুশকিলটা বুঝতে পারছোনা।

আমি বল্লুম ঃ এক কাজ করা যাক। হাশিমতো এর আগেও আমার বাসায় সস্ত্রীক খেয়ে গেছে। আমি তাদের আবার দাওয়াৎ করি।

www.pathagar.com

যাওয়ার সময় তাঁদের চাকরানীকে বুঝিয়ে-পাড়িয়ে তাঁরা নিয়ে যাবেন।

শুনে বিবি সাহেবা ফোঁস করে জ্বলে উঠলেন। কী, আমি তাকে সাধতে যাবো!

আমি বল্লুম ঃ আমার চাকরানী এরূপ পালালে আমি তাকে মাথায় করে আনতুম। কারণ, আমি তাকে আমার ইজ্জতের প্রতীক মনে কর্তুম।

হামিদ যখন আরও চাপ দিতে লাগল আমি নিশ্চয়তা চাইলুম যে ফিরে গেলে তাকে পিট্‌টি লাগান হবে না। হামিদ দিলে সে নিশ্চয়তা।

মেয়ের সঙ্গে দেখা হওয়ার সম্ভাবনায় বুবী ফিরে যেতে রাজী হলো। হামিদ তাকে নিয়ে গেল। আমি সঙ্গে গেলুম উপসংহারটা দেখব বলে। ওটা ঠিক আমার অনুমান মতই হলো।

বুবী গিয়ে বিবি সাহেবার সামনে মাথা নীচু করে দাঁড়ালে। অর্থ ঃ আমি অপরাধী। আর তিনি তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন তাকে ছিঁড়ে টুক্‌রা টুক্‌রা কর্বেন বলে।

বুবীর আর্তনাদে ষ্টেশনের প্রত্যেকটা লোকই বুঝতে পার্লো ঃ সমস্যার কোন সমাধান হয় নি।

আমার ডি এইচ লরেন্সকে মনে হলো ঃ প্রত্যেক খুনের জন্যে যেমন একজন খুনীর দরকার তেমনি অবশ্যই নেপথ্যে থাকে শিকার যে তাকে দিয়ে খুন করায়।

www.pathagar.com

তাসে নাশ

তাসের বাই যৌবন-সন্ধিতে আমাকে পেয়ে বসেছিল। আমি চাকু দিয়ে কেটে বাম হাতের তর্জনিতে ঘা করে ফেলে সে বাই থেকে মুক্তি পেয়েছিলুম।

এক মহকুমা শহরে আমি যখন সাব-রেজিষ্ট্রার তখন এস্-ডি-ও, মুন্সেফ, কন্ট্রোলার অব ফুড ইত্যাদি সকলেই আমার বন্ধু—আমি প্রস্তাব কর্লুম ঃ একখানা ক্লাব করা হউক।

এর আগের ষ্টেশন মহকুমা শহর না হলেও ওটা ছিল বাংলাদেশের বৃহত্তম চৌকি—চার জন মুন্সেফ ছিলেন। এখানে একখানা ক্লাব করেছিলুম—আমি ছিলুম ফাউণ্ডার সেক্রেটারী। আমি আর সার্কেল অফিসার মিলে খুব ভাল চালাচ্ছিলুম।

মহকুমা শহরের প্রস্তাবিত ক্লাবটিকে বই-পত্রিকা পড়ার একটা সাংস্কৃতিক কেন্দ্ররূপে গড়ে তুলব—এটাই ছিল আমার ধারণা।

কুক্ষণে আমার বন্ধুরা এতে তাস নিয়ে বসলেন। বই-পত্রিকার কিছুই হলো না—কিন্তু তাস উন্নীত হলো ফ্লাশে অর্থাৎ জুয়ায়। আমাকে তখন কেটে পড়তে হলো।

জুয়ার নেশা কি যেমন তেমন ?

নূতন একজন এস্-ডি-ও আসছিলেন, স্ত্রী ও বাচ্চা-কাচ্চাদের নিয়ে ষ্টীমারে। সেভাবে খবরও করেছিলেন।

প্রতি সন্ধ্যায় রেডিওতে আবহের সংবাদ দেওয়া হয়— কোন কোন দিন ওয়ার্নিং। সেদিন সন্ধ্যায় খেলায় খুব যশ উঠেছে এমন সময় রেডিও ওয়ার্নিং—প্রচণ্ড ঝড় হবে। মহকুমার প্রশাসকরা তখন খেলায় উন্মত্ত—ওয়ার্নিং তাঁদের কানের পাশ দিয়ে চলে গেল, কিন্তু কানের ভিতরে ঢুকে মর্মে প্রবেশ কর্তে পার্লো না।

তুফান হলো। কিন্তু প্রশাসনিক কোন প্রস্তুতি ছিলনা। ষ্টীমার ঘাটে এসে যাত্রী না নামাতে পেরে আশ্রয় নিল পাহাড়ের আড়ালে গভীর খাড়িতে আর সেখানেই ডুবে গেল জাহাজ ঝড়ের তোড়ে। বহু যাত্রী ডুবে মরলো—হতভাগ্য এস্-ডি-ও বাল বাচ্চা সহ।

সেই দারুণ স্মৃতি ঝিমিয়ে এলো। কিন্তু, ফ্লাশের জুয়া শুধু জোরে চল্লো নয়—সর্বত্র ছড়িয়ে পড়লো বড়দের দেখাদেখি ছোটদের মাঝেও। ক্লাবের আড্ডা জুড়ে রইলেন বড়রা,

www.pathagar.com

ছোটরা আনাচে-কানাচে বহু আড্ডা জমিয়ে তুল্লো।

কিন্তু, জুয়া শুধু পুরুষালি খেলা। মেয়েদের কি অবস্থা ? এস্-ডি-ওর বিবি, মুন্সেফের বিবি, কন্ট্রোলারের বিবি দরজা বাঁধতেও পারেন না, স্বামী রয়েছেন যেহেতু বাইরে; ঘুমুতেও পারেন না, পাছে স্বামীকে এসে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়—তাঁদের খাওয়া উঠলো পাটে। যৌন-জীবন চিড় খেয়ে চল্লো।

এস-ডি-ওর বিবি গেলেন মুন্সেফের বিবির কাছে ঃ কি করা ? দু'জনে মিলে গেলেন, কন্ট্রোলারের বিবির কাছে ঃ কি করা ? তিনি বল্লেন ঃ সকলে মিলে উপায় বের কর্তে হবে, এঁরা যা করছেন তাতে তো কাবিনের শর্ত লঙ্ঘন হচ্ছে। মুন্সেফের বিবি বল্লেন ঃ সে তো ঠিক কথা। দিনে মিঞারা যাই করুক রাত্রে তো বিবিদের তলব মতে জাওজিয়তে হাজির থাকতে হবে।

দু'দিন পরে এর ফল দেখা গেল। ফ্লাশের হৈ-চৈর মাঝখানে মিঞারা যেন হঠাৎ ভূত দেখলেন যার যার বিবির মুখ, কানে গেল তাঁদের শাড়ীর খস্ খস্ শব্দ। পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে তাঁরা তখনই খেলা বন্ধ কর্লেন এবং সুবোধ বালকের মতো যে যার গৃহিনীর পেছন পেছন যার যার ডেরায় ফিরে গেলেন।

অতঃপর শয়ন-কক্ষের আইন জারী হয়ে গেল। জুয়া খেল আপত্তি নেই, কিন্তু রাত সাড়ে এগারটার মধ্যে ডেরায় ফিরতে হবে। অন্যথায় নন-কো অপারেশন। মুন্সেফ সত্যই ভীত হয়ে পড়লেন। তওবা করবার কাছাকাছি।

ছোটদের আড্ডাগুলোতেও এ খবর পৌঁছল। পেশ্কারের বৌ ঠোঁট-কাটা মেয়ে। বল্লে ঃ আমারাও কেউ ভেসে আসিনি। আমার আব্বা কাবিনের উপর আবার আমার শ্বশুর থেকে জিম্মানামা আদায় করে নিয়েছেন। ছেলে কিছু বে-লাইন চলেন, বাপ তার দায়-দায়িত্ব নিতে হবে।

কিন্তু, আইনের গ্রন্থিও যে বজ্র আঁটুনী ফস্কা গেরো হয়ে উঠতে পারে সেটা বোঝা গেল পরের রাত্রে। বড় গিন্নীদের অনুকরণে মেজ এবং ছোট গিন্নীরাও ধাওয়া করেছিলেন স্বামীদের সামলাবেন বলে এবং মহাজনদের অনুসরণে স্বামীরাও বশংবদের ন্যায় স্ত্রীদের পাছ নিয়েছিলেন—কিন্তু এই সাফল্যে ঠোঁট-কাটা মেয়েটা নিশ্চয়ই কিছু বেফাঁস বলে ফেলেছিল যাতে রেগে গিয়ে পেশ্কার প্রভু (পেশকাররাইতো এ দেশের প্রশাসনে অর্ধেকের চাইতেও বেশী) সেই রাস্তার উপরই বেটিকে ধরে এমন মার দেয় যে তার চিৎকারে আমাদের অনেকেরই ঘুম ভেঙে যায়। দেখাদেখি অন্য স্বামীরও এমন অবোধ হয়ে উঠেন যে স্ত্রীরা 'য পলায়তি' নীতি অনুসরণ করে অল্পের জন্যে প্রহার থেকে রক্ষা পেয়ে যান।

কিন্তু, কারও কারও জীবনে এই তাসই শনি হয়ে ঢুকেছিল।

পোষ্ট-মাষ্টার ছিলেন এক কাজী-বাড়ীর ছেলে। সোজা-শান্ত, হিসেব করে চলেন। বৌয়ের গা-ভরা অলঙ্কার, প্রভিডেন্ট ফাণ্ডে কিছু জমিয়েছেনও। সেই লোকই ফ্লাশের পাল্লায় পড়ে একেবারে ফতুর হয়ে গেলেন।

তাঁর স্ত্রীর এক চিঠি ধরা পড়লো। লিখেছেন ঃ আমাদের যে শেষ গতি কি হবে

www.pathagar.com

আল্লাহ্‌তা'লাই জানেন। আমার অলঙ্কার সব বিক্রী হয়ে গিয়েছে, প্রভিডেন্ট ফাণ্ডেও বিশেষ কিছু নেই। সব গিয়েছে তাসের জুয়ায়। পোষ্ট-মাষ্টারকে আমরা বদলী করিয়ে জুয়ার আড্ডা থেকে সরিয়ে দিলুম। ওরূপ দুর্বল চরিত্রকে বাঁচানোর অন্য কোন উপায় ছিলনা।

সৈন্য-বাহিনীর প্রাণ-কেন্দ্র হলো প্রত্যেক রেজিমেন্টের অফিসারদের মেস্। যেখানে তাঁরা যান, অবসর উপভোগ করেন। অফিসার বলতে তখন সবই বৃটিশ, ছিটে-ফোঁটা ভারতীয়। ছিটে-ফোঁটার মধ্যে ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল সার্ভিসের ডাক্তাররাই (যার সকলেই ভারতীয়) প্রধান। এঁরাই নিজের অধিকার বলে বৃটিশদের সমকক্ষ গণ্য হতেন। এক সঙ্গেই খেতেন, এক সঙ্গেই খেলতেন, আর প্রথম দিকে অফিসাররা সাহেবদের অনুকরণে বিলাতকে বলতেন 'হোম'—বাড়ী।

মেসে রীতিমত তাসের জুয়া চলত। তার নাম ছিল 'অকশন ব্রিজ' অকশন মানে নীলাম। সুতরাং, ফতুর হওয়ার রাজপথ এখানেও খোলা ছিল।

মেসের কেরানী অন্য হিসেবের সঙ্গে ব্রিজের হিসেবটাও রাখতেন। কোন্ অফিসার কত হারালেন, কোন্ অফিসার কত জিতলেন—এই হার-জিতে শোধ-বোধ হয়ে যেতো মাসের শেষে বেতন পেয়ে তা' থেকে কর্তন দিয়ে এবং তার সঙ্গে যোগ করে।

কমাণ্ডিং অফিসার (প্রায়ই লেফটেন্যান্ট্-কর্নেল) হতে শুধু বড়-কর্তা নন, সব দিক দিয়েই 'ঝুনা'। পদব্রজে বা ঘোড়ায় যদ্দূর তদ্দূর চলে যেতে পার্তেন, আর দেখা যেতো তাঁকে সকলের আগে, সৈন্যদের কড়া শাসনের জন্য যেমন ভয়ের পাত্র হতেন, তেমনি তাঁদের সুখ-দুঃখ আর প্রয়োজন বুঝতেন বলে ভালবাসার পাত্রও হতেন, যাঁর একটা সম্মতির একটুখানি বাহবার মাথা হেলানের জন্যে সৈন্যরা অকাতরে প্রাণ বিসর্জন কর্তে পার্তো। তিনি যুদ্ধের কৌশল যেমন বুঝতেন, তেমনি ব্রিজ খেলায়ও হতেন অপরাজেয় ধুরন্ধর।

আর, এই খেলায় সবচেয়ে দুর্বল হতেন ছিটে-ফোঁটার ভারতীয় অফিসারটি।

আমরা যখন মেসোপটেমিয়ায় তখন শেষের দিকে কমাণ্ডিং অফিসার ছিলেন লেঃ কর্নেল ভিক্টর ভিনসেন্ট স্যাণ্ডিফোর্ড। সেবারে আমরা বাইজী থেকে রুক্ষ মরুভূমির মধ্য দিয়ে প্রায় একটানা দেড়শ মাইলের মত মার্চ করেছিলাম—যে জন্যে ষ্টেটসম্যান পত্রিকায় আমাদের 'প্রশংসা' বেরোয়।

বাইজী থেকে ফাতাহ্। এই ক্যাম্পে খাওয়া দাওয়া ও সামান্য বিশ্রাম করে আমরা লেসার জবের দিকে এগুই। মধ্যাহ্নের রৌদ্র, পথও দীর্ঘ, অর্ধেক পথ না যেতেই সৈন্যদের পানি ফুরিয়ে গিছ্‌ল। তার উপর মরুভূমিতে প্রকৃতির খেল—যেমন এক সময় মরীচিকায় মনে হয় সামনের অনন্ত বিস্তারে পানি থৈ থৈ করছে—তেমনি আবার মনে হয় পাহাড়ে পাহাড়ে যেন আগুন ধরে গেছে। কোন্‌টা যে আসল রেষ্ট-ক্যাম্প বুঝবার উপায় ছিল না।

বুড়ো স্যাণ্ডিফোর্ড রেষ্ট-ক্যাম্প নির্ণয়ের জন্যে ঘোড়া ছুটিয়ে মরুভূমির মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর পরে যিনি কমাণ্ডার তিনি দিক হারিয়ে ফেলে সৈন্যদের শুধু মরুভূমির মধ্যে ঘুরিয়ে মারছিলেন। পঞ্চাশ মিনিট মার্চ কর্লে দশ মিনিট ঠায় দাঁড়িয়ে

www.pathagar.com

রেষ্ট। কিন্তু, আমরা এমন পিপাসাতুর ও ক্লান্ত হয়ে গিয়েছিলুম যে দশ মিনিটের পর বাঁশী বাজলে কেউ আর এগুতে রাজী হলোনা। সিনিয়র সৈন্যরা বুট খুলে ছুঁড়ে ফেলতে লাগল। কমাণ্ডার একেবারে হতবুদ্ধি হয়ে গেলেন। মরুভূমির বুকে একটা সৈনিক-বিদ্রোহ যেন আঁকা হয়ে যাচ্ছে।

এমন সময় বৃদ্ধ স্যাণ্ডিফোর্ড ঘোড়া ছুটিয়ে দৃশ্যপটে আবির্ভূত হলেন। স্পষ্ট শোনা যায় এমন গলায় বল্লেন ঃ One mile more my boys and you get rest. আমার বাছারা, মাত্র আর একটি মাইল, তারপরই তোমরা বিশ্রাম পাচ্ছ।

মণির ছোঁয়ায় ফণী যেন মাথা নত করে ফেল্ল। সৈন্য বুট কুড়িয়ে নিয়ে আবার পরে ফেল্ল। কমাণ্ডিং অফিসারের এমনই যোগ্যতা।

স্যাণ্ডিফোর্ড ছিলেন ভগিনী সর্বস্ব প্রাণ। যুদ্ধের কাজের অবসরে 'ল্যাণ্ডস্কেপ' বা কোন দৃশ্যপটের ছবি এঁকে ভগিনীকে পাঠিয়ে দিতেন। তাঁর চেহারাও ছিল মাহাত্ম্য-ভূষিত।

এমন ঘটনাও ঘটে যখন কমাণ্ডিং অফিসারকেও য়্যারেষ্ট করা হয়। কোন অফিসারকে য়্যারেষ্ট কর্লে তিনি আর মাথায় টুপী পরতে পারেন না, মেসে খেতে পারেন না আর সৈন্যদের অভিবাদন গ্রহণ কর্তে পারেন না।

যুদ্ধ-ক্ষেত্রে আমরা প্রথম কমাণ্ডিং অফিসার পাই বৃভেট লেঃ কর্নেল এ এল ব্যারেটকে। ইতি কৃতী-সৈনিক। আগেই কোন যুদ্ধে আহত হয়ে তাঁর এক গাল ধ্বসে গিয়েছিল। এখন দাড়ি রেখে ওটাকে চাপা দিয়েছিলেন। বৃভেট মানে অল্প ব্যবধানেই তিনি পুরো কর্নেল হয়ে যাবেন। বৃটিশ যুগে প্রমোশন খুব সহজ ছিলনা।

বাগদাদের উপকণ্ঠে যুদ্ধ করে কর্নেল ব্যারেট তাঁর রেজিমেন্ট অর্থাৎ আমাদের নিয়ে ডাউনে আজিজিয়ায় নেমে এসেছিলেন। আজিজিয়া বাগদাদের নীচে ছোট ঘাঁটি।

যুদ্ধের ঘোড়ার ন্যায় যুদ্ধের সৈনিকদেরও নিরুপদ্রব অবসর ভোগ কর্তে দেয়া হয় না। তাতে তাদের 'মোর‍্যেল' (মনোবল) খারাপ হয়ে যেতে পারে। একটা না একটা উপদ্রব লাগিয়ে রাখা হয়। একটা বড় উপদ্রবের নাম ঃ সি-ও'স্ ট্যাকটিক্স্ (কমাণ্ডিং অফিসারের যুদ্ধ কৌশল)। সৈন্যরা ঠাট্টা করে বলে ঃ সি-ও'স্ টেস্টিকল্স্ (কমাণ্ডিং অফিসারের অণ্ড-কোষ)।

ব্যারেটও তেমন একটা ব্যাপার ঘটিয়ে তুলেছিলেন। এতে ষ্টেশনের সব য়ুনিট্‌কে যোগ দিতে হয়—হউক তারা অন্য কমাণ্ডারের অধীন। সম্মিলিত বাহিনী আদেশ অনুযায়ী একটা বিশেষ পজিশন নিয়েছে এমন সময় অশ্বারূঢ় কর্ণেল ডেভী সেখানে এসে উপস্থিত। কঠোর স্বরে বল্লেন ঃ আমি তোমাকে য়্যারেষ্ট কর্লুম। আমি তোমার সিনিয়র, আমাকে ডিঙ্গিয়ে অথবা আমার হুকুম না নিয়ে তুমি 'সি-ও'স্ ট্যাকটিক্স' কর্তে পারনা।

ব্যারেট তাঁর টুপী জমা দিয়ে দিলেন। খোলা মাথায় ঘোড়ায় চড়ে নিজের তাঁবুতে চলে গেলেন। পজিশন ভেঙ্গে অফিসাররা যার যার বাহিনীকে নিজেদের ঘাঁটিতে নিয়ে এলেন। প্রধান সেনাপতি (জেনারেল মড্ কলেরায় মারা যাওয়ার পর) জেনারেল ম্যাক্সন তখন বাগদাদে। খবর পেয়ে—টাইগ্রিসের বুকে তখন সব যান বন্ধ হয়ে গেল—

www.pathagar.com

হাইড্রোপ্লেনে এক চিৎকারেই তিনি চলে এলেন আজিজিয়ায়। রেকর্ড দেখে মীমাংসা করে দিলেন। ডেভীর দাঁড়ই ঠিক। এক খাড়িতে দুই কুমীর থাকতে পারেনা। ডেভীকে উঠিয়ে নিলেন মান বাঁচিয়ে ষ্টাফ কাজে। কমাণ্ডে ব্যারেটই বহাল থাকলেন।

তবে, বৃটিশ আর্মীর এই আভিজাত্য ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল সার্ভিসে ছিলনা। যুদ্ধের হিড়িকে সদ্য কলেজ ফেরৎ বহু ছোকরা কিংস্ কমিশন পেয়ে প্রায় রাতারাতি কাপ্তেন পদ পেয়ে গিয়েছিলেন। তাঁদের অনেকের না ছিল শিক্ষা, না ছিল দীক্ষা।

আজিজিয়ায় 'কোলাইটিস্' নামক পেটের গুরুতর পীড়ার জন্যে আমাকে হাসপাতালে পাঠানো হয়। একদিন দেখি কি কাপ্তেন রশীদ এক রোগীর বাহুতে সূঁচ ঢুকিয়ে দিয়ে ইঞ্জেক্শন আর শেষ কর্তে পারেন না, সূঁচও টেনে আনতে পারেন না। তাঁর হাত ভয়ানক কাঁপছিল। কাপ্তেন কুমার এই হাল দেখতে পেয়ে সূঁচ ধরে তাঁকে উঠিয়ে দেন এবং নিজে ইঞ্জেকশনটা শেষ করেন। এঁরা দুজনই পশ্চিমা।

স্যাণ্ডিফোর্ডের বাঁধা হিসেবে আমাদের যে ডাক্তার ছিলেন তাঁর নাম বি ভি গুপ্তে। সম্ভবতঃ মেজর হয়েছিলেন। কিছু বয়স্ক মারাঠি ভদ্রলোক। অবসর সময়ে পুনায় ফেলে আসা স্ত্রী ও ছেলে-মেয়ের জন্য কাঁদতেন। গোয়ানীজ আব্রাহাম ছিলেন বৃদ্ধ, সিভিল কেরানী এবং খৃষ্টান। তাঁর অবসরের প্রশ্ন ছিলনা। বাড়ির কথা মনে হলেই সকলের সামনে কাঁদতেন।

আমাদের কেউ কেউ চিঠি লিখে শিরোনাম লিখতে গিয়ে পাশের লোককে জিগ্যেস কর্তো ঃ বাবার নামটা কিছুতেই মনে কর্তে পারছিনা। তোর স্মরণ আছে ?

একেই বলে ঃ ঠেলার চোটে বাপের নাম ভোলায়।

www.pathagar.com

আদর্শের বালাই

আমাদের সমাজ-কল্যাণ কাজে আদর্শের বালাই ঢুকে গিয়েছে।

৭৮ বৎসর আগে যখন আমাদের জন্ম হলো তখন গ্রামে গ্রামে জমিদারদেরই ছিল রাজত্ব।

জুলুম ও জবরদস্তির মধ্য দিয়ে জমিদাররা সমাজকে শাসনে রাখতো। আর সমাজের মান-ইজ্জৎ বজায় রাখার দায়িত্বও ছিল জমিদারদের। অন্য সমাজের কোন গণ্য ব্যক্তি বেড়াতে আসলে জমিদারের বৈঠকখানায় যেমন তাঁর অভ্যর্থনা হতো তেমনি জমিদার বাড়ীতে কোন উৎসব-অনুষ্ঠান হলে মহল বন্ধক দিয়ে হলেও সমাজের সকলের খানা-পিনারও আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা কর্তে হতো।

এখন তেনাহি দিবসা গতঃ।

বাদশাহী আমলে সমাজ-কল্যাণের প্রেরণা আসতো ধর্ম থেকে এবং তার সহজ অভিব্যক্তি ছিল লেখাপড়ার জন্যে মাদ্রাসা ও টোল স্থাপনে। স্থাপয়িতারা ছাত্রদের বই-পত্র, জামা-কাপড় খানা-পিনা সব খরচই বহন কর্তো। রাষ্ট্র নিষ্কর জমী ও বৃত্তি দিয়ে পরোক্ষে সাহায্য করেই নিজের দায়িত্ব পালন কর্তো।

১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে বিদেশী কোম্পানী প্রশাসন দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে ভেঙ্গে তাদের গরজ অনুযায়ী 'কেরানী তৈরী'র কাজের জন্য নূতন ভাবে গড়ে নিলে। ফার্সী-হিন্দী গেল, শিক্ষার ধর্মীয় 'বায়াস' গেল, সরকারী নিরপেক্ষতার পরিবর্তে পুরো সরকারী নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হলো।

এই কাজে আগ্রহের সাথে সহযোগিতা দিচ্ছিলেন তথাকথিত ভদ্রলোক শ্রেণী কিছু ব্রাহ্মণ, কিছু বৈদ্য, প্রচুর কায়স্থের একটা দল—যাঁরা বৌদ্ধ, হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান সব যুগেই রাষ্ট্রের পড়িয়ে-লিখিয়ের কাজ একচেটিয়া করে রেখেছিলেন।

এক সময়ে দেশে স্কুল স্থাপন একটা রেওয়াজ হয়ে দাঁড়ায়। প্রশাসন ছিল এই কাজের অত্যন্ত অনুকূল। স্কুল স্থাপন করা মাত্রই গ্রাণ্ট্-ইন-এইড পাওয়া যেতো।

বহু স্কুলেই ব্যক্তি-বিশেষের নাম দেয়া হয়েছিল। আর্থিক সাহায্য বা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত

www.pathagar.com

ব্যক্তির আনুকূল্যের দরুণ।

কম সংখ্যক স্কুলে গ্রামের নাম দেওয়া হয়েছিল।

প্রকৃত প্রস্তাবে, কালক্রমে স্কুলের এতসব প্রয়োজন বেরিয়ে পড়ে যে ব্যক্তি বা পরিবার বিশেষের পক্ষে তার জোগান দেওয়া অসম্ভব। দীর্ঘ চাকুরি জীবনে বহু স্কুলের সংস্পর্শে আমাকে আসতে হয়েছিল আর, আমি কমিটিতে থাকি আর না থাকি—এ স্কুল ছাড়া সব হেডমাষ্টারই আমাকে ভাবতেন ঃ ফ্রেণ্ড, ফিলসফার য়্যাণ্ড গাইড্।

যিনি সবচেয়ে অন্তরঙ্গ হয়ে গিয়েছিলেন শিক্ষক ও হেড্মাষ্টার হিসেবে তাঁর চেয়ে যোগ্যতর আমি কাউকে দেখিনি। তবুও.....

ঝড়ে স্কুলের হষ্টেল ভেঙ্গে গিয়েছিল। স্থানীয় মুন্সেফ ছিলে স্কুল-কমিটির প্রেসিডেন্ট্। তিনি ছিলেন আমারও বন্ধু, লিখবার ঝোঁক ছিল বলে আমার অনুরাগী ও ভক্ত।

মুন্সেফ হলেও তিনি ছিলেন অত্যন্ত নিরলস ও ডানপিটে মানুষ। অত্যন্ত ক্ষিপ্র-কর্মী। কাজ শেষ করে নূতন কাজ খুঁজে বেড়াতেন।

এই এলাকার বহু লোক ছিলেন রেঙ্গুনে ব্যবসায়ী। তখনও বার্মা পৃথক হয়ে যায়নি। বন্ধে তিনি রেঙ্গুন ঘুরে এলেন। প্রবাসীরা তাঁকে রাজোচিত সম্বর্ধনা জানালেন এবং এত টাকা তুলে দিলেন যে হষ্টেল পুনঃনির্মাণের সহজেই ব্যবস্থা হয়ে গেল।

যেদিন ফিরলেন এক ভ্রমণ-বৃত্তান্ত আমার হাতে ফেলে দিলেন। আমি দেখে দিয়ে মাসিক মোহাম্মদীতে পাঠিয়ে দিলেম। যথাকালে সেটা প্রকাশিত হলো।

রাত্রে এলেন হেড্মাষ্টার। বল্লেন ঃ একটা বিষয়ে আপনার পরামর্শ নিতে চাই। আমি উত্তর কর্লুম ঃ বলেন।

ঃ এই যে মুন্সেফ সাহেব এত কষ্ট করে হষ্টেলটা পুনঃনির্মাণ করালেন। হষ্টেলটায় তাঁর নাম দিতে চাই।

ঃ এই প্রস্তাব আর কাউকে শুনিয়েছেন ?

ঃ না।

ঃ তবে, আর মুখের বার কর্বেন না। মুন্সেফ সাহেব ফাউ একটা প্লেজার-ট্রিপ (আনন্দ ভ্রমণ) দিয়ে এসেছেন বার্মায়। আর, ঝড়ে আবারও ভাঙ্গতে পারে হষ্টেল। তাঁর নাম দিয়ে রাখলে তখন না পাবেন ঘরের সাহায্য (কারণ, নামতো দেওয়াই হয়ে গিয়েছে) না পাবেন ঘাটের সাহায্য (কারণ, অমুকের নামে হষ্টেল তাতে আমরা চাঁদা দেই কেন ?)।

এই মনোভাবের দরুণ আমাদের জন-কল্যাণ চেষ্টাগুলো অবাধে অগ্রসর হতে পারে না।

আমার এক বন্ধু রমণী মোহন মল্লিক এক বইয়ের দোকানের মালিক আমাকে একবার বল্লেন ঃ দাদী বেশ কিছু অর্থ রেখে গিয়েছেন। সেই অর্থটা আমাদের গাঁয়ের স্কুলে দিয়ে স্কুলটা দাদীর নামে করে দিতে চাচ্ছি, আপনি কি বলেন ?

www.pathagar.com

হেডমাষ্টার যেমন অতিযোগ্য হয়েও হষ্টেলের দীর্ঘ মেয়াদী পরিণামটা চোখে দেখতে পাচ্ছিলেন না, রমণীও সেরূপ তা' উপস্থিত স্বদেশানুরাগ সত্ত্বেও স্কুলের ভবিষ্যৎ প্রয়োজন কি দাঁড়াতে পারে সেটা বুঝতে পাচ্ছিল না।

কালের ইতিহাসে ব্যক্তি বা পরিবারের পরিচয় অপেক্ষাও একটা স্কুলের জীবন অনেক বেশী দীর্ঘস্থায়ী। সুতরাং, ব্যক্তি বা পরিবারের নাম দিয়ে স্কুলের ভবিষ্যৎকে বিকিয়ে দেওয়ার কোন অর্থ হয় না।

আসলে সেবা নিয়ে কথা, টাকার অঙ্ক নিয়ে কথা নয়।

যুক্তরাষ্ট্রে ধরুন, দেড়শ বছর অগে মিসেস ব্রাইস্ নামে এক বুড়ির ইচ্ছে হয়েছিল পীড়িতের সেবা কর্বে। রাস্তার ধারে তাঁকে দেখা গেল বাক্সের উপর কতকগুলি বোতল নিয়ে বসেছেন। তাঁর আয়োজন সামান্য হোক, কিন্তু তিনি বেশী দিন বাঁচলেন আর তাঁর সেবার কথা সকলের জানা হয়ে গেল।

এখন ব্রাইস্ মস্ত বড় হাসপাতাল। বড় লোকে তাতে অর্থ দিয়েছে। কিন্তু, কারু মনে হয়নি যে হাসপাতালের নামে নিজের নামটা বসিয়ে দেই। ব্রাইসের স্বপ্নকে সকলে মিলে কল্পনার অতীত বড় করেছেন। আর, একটা কলাম করে তাতে কে কত টাকা দান কর্লেন সেটা পাথরে উৎকীর্ণ করে রেখেছেন। তাতে নূতন নূতন নাম বরাবরই যোগ হয়ে চলেছে। ফলে, হাসপাতাল বেড়ে উঠবার পথ বরাবরই খোলা রয়েছে।

আমার এক বন্ধুর নানারকম ব্যবসা এবং সে উপলক্ষে নানা জায়গায় কতকগুলি গুদাম ঘর ছিল। এক জায়গায় একটা গুদাম ঘরের আর কোন ব্যবহার ছিল না। তিনি ভাবলেন ঃ নিজের নামে একখানা স্কুল দেবেন এবং জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেটের পত্নীকে তার উদ্বোধনের জন্য রাজী করে ফেল্লেন।

উদ্বোধনের অনুষ্ঠানে আমিও হাজির হলুম। আমি বল্লুম ঃ স্কুলটা এলাকার নামে করুন। তাতে তার প্রগতির ও টিকে থাকার সুযোগটা বাড়বে। কিন্তু, সব আয়োজনই এভাবে ঠিক হয়ে গিয়েছিল এবং ম্যাজিষ্ট্রেট-পত্নী এমনভাবে তাঁর অংশ শান দিয়ে এসেছিলেন যে আমার বক্তব্য একরূপ মাঠেই মারা গেল।

এই স্কুলটি কোনরূপে টিকে আছে। অর্থাৎ, সেই গুদাম ঘর পর্যন্তই। তবুও মন্দের ভাল। কারণ, এরূপ কত স্কুল দেখলাম যেখানে তার প্রয়োজন মেটাতে গিয়ে নূতন দাতা স্থাপয়িতার নাম তুলে দিয়ে নিজের নাম বসিয়ে দিয়েছেন। কোন কোন স্থলে গ্রামের নাম তুলে দিয়ে ব্যক্তির নাম বসিয়ে দেওয়া হয়েছে।

রমণী মল্লিককে আমি এসব কাহিনী শোনালুম। পরে বল্লুম ঃ গাঁয়ের নামে স্কুল ঠিকই থাক, একটা কলাম করে তোমার দাদীর দান পাথরে উৎকীর্ণ করে দাও। রমণী বল্ল ঃ ঠিক পরামর্শই দিয়েছেন।

সমাজ-কল্যাণ কাজে নামের মোহ, এক প্রকারের অপরিণামদর্শিতা আমাদের পথের বাধা হয়ে আছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষের দিকে আমি চাকুরিতে নিয়োজিত ছিলুম এক মহকুমা শহরে। বর্ডার বলে বৃটিশ আর্মীর এক মেজরকে সেখানে করা হয়েছিল

www.pathagar.com

এস্-ডি-ও। তাঁর সাথে ও মেম সাহেবের সাথে আমার খুব খাতির ছিল।

একবার বিভাগীয় কমিশনার তাঁর মেম সাহেবকে নিয়ে পরিদর্শনে আসলেন। বন্ধুরা ঠিক কর্লেন ঃ মেম সাহেবকে 'মীট' কর্বেন মহিলারা এবং যেহেতু আমি বয়সে প্রায় সবারই বড়—একমাত্র পুরুষ—আমি হাজির থেকে মহিলাদের পরিচয় করিয়ে দেব।

কিন্তু, কাজের সময় আমি বিশেষ ফাঁপরে পড়ে গেলুম। আমি প্রায় সব মহিলাকেই আটপৌরে পোশাকে চিনতুম বটে—কিন্তু তাঁরা যখন সেজে গুজে আসলেন—অন্য পরে কি কথা—আমি যেন আমার নিজের বিবিকেই চিনে নিতে পারছিলুম না। আমার অবস্থা দেখে মহিলারা উচ্চ হাস্য করে উঠলেন। মেম সাহেব আমাকে প্রবোধ দিয়ে বল্লেন ঃ নেভার মাইণ্ড মিষ্টার আলম, মোটের উপর মনে রেখো, আমরা সকলেই মেয়েলোক, মেয়েলোকদের পরস্পর পরিচয়ের তেমন প্রয়োজন হয় না।

তারপরই আসলো ঈদ-রীয়ুনিয়ন। এতে সাহেব-মেমদের আলাদা করে দাওয়াৎ দেওয়া হলো। মহিলাদের বেলায় 'হাটে হাঁড়ি ভাঙ্গা' অবস্থা হওয়া সত্ত্বেও বন্ধুরা ধরে বসলো সাহেবদের সামনে ইসলাম সম্বন্ধে তোমাকে কিছু বলতে হবে।

বলে যখন চলেছি, এস্-ডি-ও অবাক হয়ে গেলেন ঃ তোমরা যীশুকে মান ?

আমি ঃ মানি কি রকম ? তিনি যে আমাদের এক প্রধান পয়গাম্বর।

সাহেব ঃ তা হ'লে তোমাদের সাথে আমাদের প্রভেদ কি ?

আমি ঃ তুমি বাইবেল দেখেছ ?

সাহেব ঃ দেখিনি আবার ? মাঝে মাঝেই তো পড়ি।

আমি ঃ কোন্ ভাষায় ?

সাহেব ঃ কেন, ইংরেজীতে।

আমি ঃ বাইবেল কি ইংরেজীতে অবতীর্ণ হয়েছিল ?

সাহেব ঃ তা' অবশ্য হয়নি। হয়েছিল হিব্রুতে। এটা তার অনুবাদ।

আমি ঃ সুতরাং, আমাদের মধ্যে আসল প্রভেদ এই যে, আমরা আরবীতে মূল কোরান নিয়ে আছি, আর তোমরা নিয়ে আছো মূলের অনুবাদ।

অনুষ্ঠানের শেষে সাহেব ব্যস্ত হয়ে পড়লেন আমাদের কোন একটা বিরাট অভাব মোচন করে দিতে। আমার চোখে পড়লো কাছারী মসজিদটা—জুমার দিন যেখানে সব লোকের ঠাঁই হয় না। সাহেবকে বলতেই বল্লেন ঃ যুদ্ধ শেষ হয়ে গিয়েছে। মিলিটারীর যত মাল-পত্র সব এখন আমার জিম্মেয়। তুমি যত পারো ইট ও পি-এস-পি শীট নিয়ে এসো।

ফলে আমরা মসজিদখানিকে খুব বড় করে তৈয়ার করালুম।

সমাজ-কল্যাণ কাজ সম্বন্ধে আমার যা' অভিজ্ঞতা হয়েছে তা' মোটামুটি ব্যক্ত কচ্ছি।

দেশকে উন্নত করার বাসনা থেকে সমাজ-মঙ্গল কাজের উৎপত্তি হয়। মনে করুন,

www.pathagar.com

আপনাকে এই স্বপ্ন পেয়ে বসল যে একখানা স্কুল প্রতিষ্ঠা করা দরকার। আপনি ধানের মাঠে দেখতে লাগলেন যে মাঠ যেন স্কুল হয়ে গিয়েছে। কত ছাত্র সেখানে পড়ছে, কত শিক্ষক পড়াচ্ছেন, মাঠে কত খেলায় স্থানটা যেন প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে।

আপনি গেলেন গ্রামের প্রধান ব্যক্তির নিকট। তাঁরা বল্লেন ঃ ঠিক আছে, আমরা আপনার সাথে আছি। একটা কমিটি করুন।

একটা কমিটি কর্লেন। আপনিই হলেন তার সেক্রেটারী। কাউকে করা হলো প্রেসিডেন্ট, কাউকে ভাইস্-প্রেসিডেন্ট ইতি উতি ইত্যাদি।

এঁরা কিন্তু আপনার সহ-স্বাপ্নিক হলেন না। প্রেসিডেন্টের পদ আমারই প্রাপ্য। সেই পদ আমি পেয়ে গেছি। তার অর্থই হলো কাজ ভাল চলছে। এই ভাবে হিসেব কর্তে লাগলেন ভাইস্-প্রেসিডেন্ট ইতি উতি প্রত্যেকেই। অর্থাৎ, এঁদের যোগটা অত্যন্ত আলগা। সামান্যতেই খসে যেতে পারে।

এদেশে পাবলিক ফাণ্ড আত্মসাৎ করার নজির খুব বেশী। আপনি যদি কিছু আত্মসাৎ করে ভেগে পড়েন কেউ তাতে কিছু মনে করেন না। বরং, যাঁদের আপনি দায়িত্ব দিয়েছিলেন মনে করেছিলেন তাঁরাই বলবেন ঃ স্কুল করা কি আর তাঁর কাজ! আমরা আগে থেকেই জানতাম।

কিন্তু, যদি আপনি সত্য সত্যই কাজ বানিয়ে ফেলেন—তখন আপনার হবে আর এক রকমের বিপদ। ৬০ হাজার টাকার বিল্ডিং বানালেন—তার হিসেব সভা করে সঙ্গে সঙ্গে পাশ করাও হয়েছে—তাতে সদস্যদের স্বাক্ষরও আছে। তবুও এখন তাঁরা অবাক হয়ে সে বিল্ডিং-এর পানে তাকাবেন—পরস্পরকে জিগ্যেস কর্বেন কত না খরচ হয়েছে বলা হয়েছে এই বিল্ডিং-এ ?

ঃ ষাট হাজার।

ঃ ষাট হাজার! আমার জামাইও কি এরকম একখানা দালান তৈয়ার করান নি ?

ঃ কত খরচ হয়েছে তাঁর ?

ঃ চল্লিশ হাজার!

এর পরেই তাঁরা বসে যাবেন হিসেব কর্তে ঃ আপনি যদি শতে দশ টাকাও মেরে থাকেন মোট কত টাকা হাতড়াতে পেরেছেন।

এটা কোন আশ্চর্যের বিষয় নয়। কারণ, পাবলিক ফাণ্ড হাতে পেলে তাঁদের প্রত্যেকেই এ ভাবে হাতড়াতেন।

তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের এই অবস্থা। কিন্তু, সাধারণ লোকদের আঁচ থাকে ঠিক। তারা বলবে ঃ জানি জানি, অমুক এমন প্রাণপণ করে খাটলেন বলেই কাজটা সম্ভব হলো।

ব্যাপার হলো আমাদের দেশের বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে আল্লাহ্তা'লা নেই, তিনি আছেন সাধারণ লোকদের মধ্যে।

www.pathagar.com

চাঁদার যদি রসিদ-বই দেন দেশের তথাকথিত নেতারা সেটা নেবেন, কিন্তু যিনি যত বড় নেতা সেই রসিদ-বই ফেরত দিয়ে হিসাব মেলাতে তিনি তত বেশী অনিচ্ছুক থাকবেন। তারপর এ নিয়ে বাধবে বাদ-বিসংবাদ।

আপনার আর একটা বিপদ আসবে কাজটা যদি ফলাও করে চালু করে দেন তারপর। তখন নূতন বড়লোক শ্রেণীর কেউ কেউ ব্যগ্র হবেন চল্‌তি নৌকায় সওয়ার হয়ে তার মাঝি হওয়ার জন্য। তাঁদের তখন মনে হবে ঃ এই কাজ আমাকে ছাড়া কি অন্যকে মানায়। দ্বিতীয় একদল লোক আকৃষ্ট হবে যদি এই কাজে টাকা-পয়সা নাড়া-চাড়ার সুযোগ হয়। যেখানে টাকা-পয়সা আছে সেখানে টাকা-পয়সা হাতে না পড়লেও তার কাছটিতে বসতে ভালবাসেন।

সমাজে কতকগুলি অদ্ভুত লোক আছে যাঁরা নামাজ কালামও পড়েন, আবার ঘুষও এক পয়সা ছাড়েন না। দ্বিতীয় শ্রেণীতে এরূপ লোকই বেশী। যাঁরা নামাজ আদায় করে ভাবেন আল্লাহ্‌র হক তো আদায় কর্লাম, তারপর খুশী মনে বান্দার হক ধ্বংস কর্তে লেগে যান।

সমাজ-মঙ্গলের কাজ কর্তে গেলেই আমাদের ক্ষুদ্র মন বেরিয়ে পড়ে। অথচ, ক্ষুদ্র মন নিয়ে সমাজ-মঙ্গলের কাজ করা যায় না।

গণতান্ত্রিক প্রথায় অর্থাৎ ভোটের সাহায্যে সমাজ-মঙ্গল প্রতিষ্ঠান চালাতে গেলেও অনেক ফ্যাচাং বেরিয়ে পড়ে।

গান্ধী বলেছেন ঃ জন-কল্যাণ প্রতিষ্ঠানেও টাকা যথাসম্ভব সঙ্গে সঙ্গে খরচ করে ফেলবে। সেইটেই ভাল। অতঃপর দক্ষিণ আফ্রিকায় তাঁর রাজনৈতিক কর্মের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে বলেছেন ঃ আমি যতদিন সাউথ ইণ্ডিয়ান কংগ্রেসের চালক ছিলুম ততদিন টাকা-পয়সা কংগ্রেসের কাজে সঙ্গে সঙ্গে খরচ করে ফেলতুম বলে কোন কথা ওঠেনি। কিন্তু, আমি চলে আসার পর কংগ্রেসের ফাণ্ডে বহু টাকা জমা হয়ে যায়। তখন অনেক লাঠালাঠি লেগে যায়, ব্যাপার কোর্ট পর্যন্ত গড়ায়।

মোটের উপর জন-কল্যাণ কাজে যাঁরা নামেন তাঁদের স্রেফ নিজের সন্তোষের জন্য কাজ করে যেতে হবে। কেউ তাঁদের গুণ স্বীকার কর্বেন—এরূপ প্রত্যাশা না থাকাই ভাল।

www.pathagar.com

'খল্যার মা' নানী

আজ পাড়ার 'খল্যার মা' নানীকে মনে পড়ছে।

যেমন মুখরা তেমনই কুঁদুলে ছিলেন। তাঁর পুকুর-পাড়ের কুল গাছটি ছিল পাড়ার সব ছেলেদের আকর্ষণ। যেমন টোপা-কুল তেমনি মিষ্টি। আমরা মাঠের কোণাকুণি একটা পথ বানিয়ে নিয়েছিলুম সেই গাছটির পাশ দিয়ে আর স্কুলে যাতায়াতের কালে কুল গাছে ঢিল ছোঁড়া ছিল আমাদের নিত্যকর্ম।

গাছে ঢিল পড়া মাত্রই নানী সবেগে বেরিয়ে আসতেন এবং আমাদের তাড়া কর্তেন। মুখে গালির খৈ ফুটতো ঃ ও আঁটকুড়ির বেটারা! ওরে বেজম্মার দল। গালি শুনবার জন্যে আমরা অবশ্য দাঁড়িয়ে নেই। যা কয়েকটা কুল হাতের কাছে পেয়েছি কুড়িয়ে নিয়ে তিন লাফেই আমরা পগার পার।

নানীর পক্ষে সহজ ছিল একটা বাঘা কুকুর পোষা। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে আমাদের প্রতি নানীর একটা দুর্বলতা ছিল। বাঘা কুকুর আমাদের তাড়িয়ে নিয়ে যাক, হয়তঃ কোন হতভাগাকে কামড়েই দিক, সেটা নানী পছন্দ কর্তেন না। ছেলেদের তাড়া করা ও গালি পাড়ার অধিকার তিনি নিজের হাতেই রাখতেন।

আমাদের দৌরাত্ম্য সত্ত্বেও নানীর ভাঁড়ারে পাকা কুল শুকিয়ে গিয়ে এক বিরাট সম্পদ জমে উঠতো। নানীর অদ্ভুত ঝোঁক ছিল—শুকনো কুলের মালা গেঁথে রাখার। সে মালা ধারিয়া বিছিয়ে তিনি রোদে শুকোতে দিতেন।

তদ্দিনে বৈশাখ এসে পড়েছে। যাকে বলে কাঠ-ফাটা রোদ্দুর। আমাদের প্রত্যেকের হাতে একখানা র‍্যালীর ছাতা। র‍্যালী ব্রাদার্সের ছাতায় তখন বাঁশের ডাঁট, ডাঁটের মাথাটা আঁকড়ার ন্যায় ঘোরানো থাকতো। আর, আমরা সেই আঁকড়ার সদ্ব্যবহার কর্তুম স্কুল ফেরৎ নানীর ধারিয়া থেকে প্রত্যেকে ছাতায় করে কুলের মালা তুলে নিয়ে।

নানী আমাদের তাড়া কর্তেন। পেছন পেছন কোন আসামীর বাড়ী পর্যন্ত পৌছে যেতেন। আর, আমাদের বাড়ী ছিল পাশেই। এ কারণে মায়ের সাথে তাঁর প্রায়ই দেখা হয়ে যেতো। মা ডেকে শুধাতেন ঃ ও চাচী, কি হয়েছে ? এবার নানীর নালিশ দেওয়ার

www.pathagar.com

পালা। কিন্তু, নানী পাড়ার ছেলেদের নাম কিছুতেই মনে রাখতে পার্তেন না। আমাদের বড় ভাইয়ের ডাক নাম ছিল আলম, নানী বলতেন আলোয়ান। আর প্রত্যেক ভাইয়ের নামের পেছনে ছিল আলম। নানীর নিকট এটা এত গোলমেলে ঠেকতো যে কিছুতেই আমাদের সব ভাইগুলির নাম মনে রাখতে পার্তেন না।

অবশ্য নাম মনে রাখার কোন প্রয়োজনও নানী বোধ কর্তেন না। অবলীলাক্রমে নালিশ দিয়ে বসতেন ঃ তোদের আলোয়ান আমার ধারিয়া থেকে কুলের মালা উঠিয়ে এনেছে। মা অবাক হয়ে বলতেন ঃ সে কি চাচী, আলম তো আজ চারদিন হয় তার নানার বাড়ি গিয়েছে ! তবে আজ মাহ্বুব স্কুলে গিয়েছিল। নানী অমনি ফুঁসে উঠতেন ঃ সে তো বাছা এক কথাই হলো। আলোয়ান করলে যা মাহ্বুব করলেও তা। দু'জনাই তো তোমার ছাওয়াল।

মা অবিশ্যি এর কোন উত্তর দিতে পার্তেন না। সুযোগ পেলে আমার হাত পাকড়ে ধর্তেন। মারবার জন্যে ডান হাতে কঞ্চি উঠিয়ে নিতেন ঃ কেন চাচীর ধারিয়া থেকে মালা উঠিয়ে এনেছিস ?

কিন্তু, তখনই দৃশ্য আশ্চর্যজনকভাবে ঘুরে যেত। নানী চোখ ছানা-বড়া করে ঘুরে দাঁড়াতেন। মায়ের মুখোমুখি হয়ে চিৎকার ছাড়তেন ঃ বৌ, এ জন্যে তুই ছেলেকে মারবি নাকি ? শুকনো কুল তো ছেলেরাই খায়। তারা না খাবে তো তুই আর আমি খাব নাকি! ততক্ষণে এক ঝটকায় আমি মায়ের হাত ছাড়িয়ে পগার পার।

তখন দেখা যেতো নানী ও মা'তে মিলে পানের সাজি নিয়ে বসেছেন। দোক্তার রসে ঠোঁট রাঙ্গাচ্ছেন আর সংসারের সুখ-দুঃখের গল্প কর্তে কর্তে এক সময় নানী বলছেন ঃ তা বৌ, আলোয়ানের জন্যে বৌ দেখছিসনা ! আমি মরবার আগে একটা রাঙ্গা টুকটুকে বৌ দেখবার সুযোগ দিবি নে ?

নানী কাঁঠাল খেয়ে অমনি হাত ধুতেন না। তখন শাস্ত্র ছিল ঃ কাঁঠাল খেয়ে দু'মুঠ অঞ্জলী করে কাঁঠাল বীচি নিতে হবে। সারা বাড়ি ঘুরে সে বীচি এক একটি করে পুঁতে দিতে হবে। পোঁতা শেষ হলে ছালি দিয়ে ঘসে পরিষ্কার করে হাত ধুয়ে নিতে হবে।

সে কালের বুড়ো বুড়িরা এ শাস্ত্র মেনে চলতেন। নানীও মেনে চলতেন। সেই নানীকে বহুকাল পরে আজ রাত্রে স্বপ্নে দেখলাম। নানী যেন অনেক আধুনিক হয়ে গেছেন, তবে মুখের হাসিটি আর গাল পাড়ার অভ্যাসটি ঠিকই আছে।

নানী জিগ্যেস কর্লেন ঃ আমার টোপা-কুলের গাছটির খবর কি ?

আমি বল্লুম ঃ সেই রামও নেই, সেই অযোধ্যাও নেই। তুমি আমাদের ফেলে চলে এলে, আর সেই গাছটিও ঝড়ে উপড়ে গিয়ে মুখ থুবড়ে পড়লো।

নানী দুঃখ করে বল্লেন ঃ আহা, আর কেউ সেটাকে আবার খাড়া করে বাঁচাতে চেষ্টা কর্লিনে ! তা' নূতন চারাতো কত তুলতে পারতিস।

আমি বল্লুম ঃ নানী, আমি কি গাঁয়ে ছিলুম নাকি। এ শহরে ও শহরে চাকরি করে

www.pathagar.com

আমার দিন কাটছে, টোপা-কুল খাইনি কতদিন, তার স্বাদ পর্যন্ত ভুলে গেছি।

নানী জিগ্যেস কর্লেন ঃ হ্যাঁরে, খবরের কাগজে ওসব কি ছবি দেখি ঃ বৃক্ষ রোপন অনুষ্ঠান, বাংলাদেশ গাছপালায় একেবারে বাঁশ ভর্তি হয়ে উঠেছে বুঝি ?

আমি বল্লুম ঃ মোটেই না। কারণ বৃক্ষ রোপন হয় ঐ ছবি তোলা পর্যন্ত। তারপর সেই গাছ কোথায় যায়, তার কি হয় কেউ খোঁজ রাখেনা। নানী জিগ্যেস কর্লেন ঃ আমাদের পাড়ার কাঁঠালের সে সুনাম আছে তো ? তখন তো এ পাড়ার কাঁঠাল হাটে পড়তে পার্তোনা, অমনিই বিক্রী হয়ে যেতো।

আমি বল্লুম ঃ নানী, তোমাকে বলবো কি, এখন আমাদের পাড়ায় কাঁঠালই নেই। গত ষাট বছরে আমরা যত কাঁঠাল গাছ কেটেছি তার এক ভগ্নাংশও লাগাইনি।

নানী এবার মুখ খুল্লেন ঃ ও আঁটকুড়ির বেটারা, গাছ না লাগালে ফল খাবি কোত্থেকে ? ওরে বেজম্মার দল, বাংলাদেশে কাঁঠাল গাছ লাগাতে তোদের কি হয়েছে! যদি বলিস আট কোটি গাছ লাগাব বাংলাদেশে, সেজন্যে স্থানের অসংকুলান হবে নাকি!

www.pathagar.com

চট্টগ্রামের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ঐতিহাসিক পটভূমি

চট্টগ্রাম ১৮৬৬ সালের ১লা মে বর্তমান জেলার রূপ গ্রহণ করে। ইহার পূর্বে কোম্পানী রাজত্বে দেশ বা প্রদেশরূপে মোগল রাজত্বে আলাদা সরকার বা প্রদেশ রূপে এবং আরাকানী রাজত্বে একটা দুর্গরূপে আমরা চট্টগ্রামের উল্লেখ দেখতে পাই। তবে, বিভিন্ন সময়ে উহার আয়তন বিভিন্ন রকম ছিল। এর মধ্যে সুমদ্রের ও পাহাড়ের ভাঙ্গা-গড়াকেও স্মরণ রাখতে হবে।

সমুদ্রে দক্ষিণ ভারত থেকে দ্রাবিড়গণেরই প্রথম সংস্পর্শ হয়েছিল বলে মনে হয়। আর, পাহাড় ছিল তিব্বৎ থেকে শ্যাম পর্যন্ত পাহাড়ী জাতিগুলির যাতায়াত পথ। এই পথে বিপরীত চাপের দরুণ কোন কোন পাহাড়ী জাত আটকে গিয়েছিল এবং এখনও আছে।

দ্রাবিড় হাড়িরা তখন অন্ত্যজ হিন্দুদের সঙ্গে মিশে গিয়েছে।

এককালে দিল্লীশ্বরকে মনে করা হতো সব রাজা-রাজড়ার মডেল। রাজা-রাজড়ারা তাঁর ন্যায় নাম গ্রহণ কর্তেন, সভ্যতা-ভব্যতায় দিল্লী দরবারকে অনুকরণ কর্তেন। চট্টগ্রামের চাকমা রাজারা মুসলমান না হয়েও জব্বর খাঁ, টব্বর খাঁ, ধরম বখ্শ খাঁ প্রভৃতি নাম গ্রহণ করেছিলেন। কোম্পানী আমলে জান বখ্শ খাঁ বিদ্রোহী হলে গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেষ্টিংস এই নীতি অনুসরণের আদেশ দেন ঃ প্রথমতঃ পাহাড়ী জাতগুলোকে 'জুম' চাষ ছাড়িয়ে 'লাঙ্গল' চাষ ধরাতে হবে। দ্বিতীয়তঃ ক্রমে তাদের 'হিন্দু'তে পরিণত কর্তে হবে।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে ত্রিপুরা এবং পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে আরাকান গৌড়ের মুসলমান শক্তির রাজনৈতিক প্রভাবাধীন হয়ে পড়ে। ত্রিপুরা গৌড়ের অনুকরণে সেরেস্তা গঠন করে এবং আরাকানের রাজারা দুইশত বৎসর ধরে একটা অতিরিক্ত মুসলমানী নাম গ্রহণ কর্তেন এবং তাঁদের মুদ্রায় ইসলামী কলেমা অঙ্কিত থাকতো।

চট্টগ্রামের আর একটা ভূমিকা বেরোয় 'জাহাজ ঘাটা' যা এখন বন্দরে পরিণত হয়েছে। ৭০০ খৃষ্টাব্দে আরবরা উহা স্থাপন করে। উদ্দেশ্য ছিল বাণিজ্য ও ইসলাম প্রচার।

ক্রমে চট্টগ্রামের অবস্থান ও প্রাকৃতিক দৃশ্য মুসলমান সাধকদের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এঁদের মধ্যে সুলতান বায়েজীদ বোস্তামীকে প্রথম গণ্য করা হয়। ৮৭৪ খৃষ্টাব্দে তিনি এন্তেকাল করেন।

www.pathagar.com

আধ্যাত্মিক মহলে এরূপ একটা ধারণা বিস্তার লাভ করেছিল মনে হয়—চট্টগ্রামে এসে ভজন-সাধন না কর্লে কারু সিদ্ধি লাভ হবে না। ফলে, প্রবাদ অনুযায়ী কেউ অশরীরীভাবে এসেছেন, কেউ পাথরে ভেসে এসেছেন, কেউ মাছের পিঠে চড়ে এসেছেন, কেউবা জাহাজে করে বা হেঁটে এসেছেন। ফলে, চতুর্দশ শতাব্দীতেই চট্টগ্রাম 'বার আউলিয়ার দেশ' বলে প্রসিদ্ধি লাভ করে। এই জন্য চট্টগ্রামে ইসলামী প্রভাব সর্বাধিক হয়ে রয়েছে।

চট্টগ্রামের আদি বাসিন্দা যাঁরাই হয়ে থাকেন তাঁরা যে বৌদ্ধ ছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। আসলে গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাবের পরে হিন্দুরাই বৌদ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন।

দশম শতাব্দীর দক্ষিণ চট্টগ্রামের কোন স্থানে পূর্ব বঙ্গের প্রধানতম বৌদ্ধ বিহার অবস্থিত ছিল। প্রজ্ঞা ভদ্র উহার প্রধান অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি চট্টগ্রামবাসী এক ব্রাহ্মণের পুত্র। বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণের পূর্বে তাঁর নাম ছিল তিলপাদ।

তবে গৌতম বুদ্ধের মহা-নির্বানের পরই বৌদ্ধ ধর্ম বিকৃত হয়ে পড়েছিল। তান্ত্রিক বৌদ্ধ ধর্ম নাম দিয়ে নানা দেব-দেবীর পূজা প্রচলিত হয়ে গিয়েছিল। বুদ্ধের শিক্ষায় মূর্তিপূজা না থাকলেও এইচ জি ওয়েল্‌স্ তাঁর ইতিহাসে লিখেছেন—বুদ্ধ এসে দেখে অবাক হয়ে যাবেন যে, তাঁর অনুসারীরা তাঁরই মূর্তি করে পূজা কচ্ছে।

গৌতম বুদ্ধের পর তিন শত বৎসরের মধ্যেই হিন্দু-ধর্ম পুনরুজ্জীবিত হয়ে উঠে। কালক্রমে সনাতনী সেনগণ বঙ্গ দেশে অধিকার লাভ করেন। এঁরা ব্রাহ্মণ্য ধর্মের ভক্ত ছিলেন এবং কান্যকুব্জ থেকে পাঁচজন ব্রাহ্মণ এসে এদেশে বসতি করেন। সেনরা স্বভাবতঃই বৌদ্ধদের প্রতি অত্যন্ত কঠোর ছিলেন।

বল্লাল সেন জাতিভেদ তো স্বীকার কর্তেনই, তদুপরি ৩৭ ঘরকে কৌলীন্য দান করেন। নানা কারণে বহু লোক কৌলীন্য প্রথার বিরোধী ছিল। এদের মধ্যে তাঁর দু'জন মন্ত্রীও ছিলেন—ব্যাস সিংহ ও ভৃগু নন্দী। তিনি ব্যাস সিংহের প্রাণ দণ্ড করেন। আর, ভৃগু নন্দীকে ধৃত কর্বার আদেশ দেন। কিন্তু ভৃগু এ পারে পালিয়ে আসতে সক্ষম হন। এ পারকে প্রাচীন ইতিহাসে বলা হয়েছে 'বংগাল দেশ'—যেখানে ঝড় ও জল লেগেই থাকে। ক্রমে ওপার হয়ে উঠে ক্যাথলিক বেঙ্গল, জাতিভেদের উপর যা প্রতিষ্ঠিত, এপার হয়ে উঠে প্রোটেষ্টেন্ট বেঙ্গল—যাঁরা ছিলেন বল্লালী প্রথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদমুখর। এই সূত্রে রাঢ় থেকে বহু হিন্দু পরিবার এসে চট্টগ্রামে অবস্থিত হন। ১৮৫২ সালে কবি ঈশ্বর চন্দ্র গুপ্ত চট্টগ্রাম ভ্রমণ করে লিখেন যে এঁদের মধ্যে জাতিভেদ কি কৌলীন্য প্রথা কোনটাই প্রবল নহে। চট্টগ্রামে হিন্দু অনুপ্রবেশের পর হিন্দু দেব-স্থানগুলো আবিষ্কৃত হয়েছে।

বল্লাল সেন মগধ বা বিহার জয় করেন। তাঁর পীড়নের ভয়ে বহু বৌদ্ধ পালিয়ে এসে চট্টগ্রামে আশ্রয় নেয়। এরূপে চট্টগ্রামে বড়ুয়া সমাজের উৎপত্তি হয়।

কিন্তু বল্লাল সেনের পুত্র লক্ষণ সেনের সময় মুসলমান শক্তি প্রথমতঃ বিহার দখল করে নেয়। তখন রাঢ়ের বহু হিন্দু পালিয়ে এসে এপারে বিশেষতঃ চট্টগ্রামে আশ্রয় নেয়। কিন্তু মুসলমান শক্তি সেনদের রাজধানী নবদ্বীপ দখল করে নিয়ে রাজত্ব চালাতে থাকে।

www.pathagar.com

এই সময় জন-সাধারণ—পূর্বেই বলেছি যারা ছিল বৌদ্ধ, দলে দলে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে এবং বংগাল দেশে ইসলামের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। চট্টগ্রামও এর বাইরে থাকেনি।

চট্টগ্রামকে এক কথায় বলা যায় আশ্রিতের দেশ। এই আশ্রিতগণের মধ্যে গৌড়াগতরাই সব চেয়ে বিশিষ্ট।

১৫৭৫ খৃষ্টাব্দে পাঠানদের গৌড় রাজ্য ধ্বংস হয়ে যায়—মোগলদের ও বসন্ত মহামারীর যুগপৎ আক্রমণে। রাজধানীর বহু বিশিষ্ট ও সম্ভ্রান্ত পরিবার এসে চট্টগ্রামে আশ্রয় নেন। এর মধ্যে মুসলমানও আছেন, হিন্দুও আছেন। অনেকে নাপিত-ধোপা প্রভৃতি অনুচর নিয়ে আসেন। এরা পেশাদারী কাজের পরিবর্তে জমী ভোগ কর্তো। তাদের বলতো 'নানাকার' প্রজা।

চট্টগ্রামে সর্বশ্রেণীর মধ্যে এমন বহু লোক রয়েছেন যাঁদের জিগ্যেস করলে সগৌরবে উত্তর দেবেন—আমরা গৌড় থেকে এসেছি।

চট্টগ্রামে গৌড়ীয় প্রভাব খুব বেশী। আরব প্রভাবের পরই এর স্থান। চেহারা, আঞ্চলিক ভাষা, নাম, খেলাধুলায় এখনও আরব প্রভাব সুস্পষ্ট, সাজ-পোশাক, সামাজিক চলাফেরা, রান্না-বান্না, আমোদ-প্রমোদ বিশেষ করে নাচ গান গৌড়ীয় সভ্যতারই দান।

পাকিস্তানী আমলের ২৪ বৎসরে পশ্চিম থেকে বহু মুসলমান এসে চট্টগ্রামে অধিবাসী হন। কিন্তু তাঁরা চট্টগ্রামী সমাজ-দেহে মিশে যেতে পারেন নি। ভাষাই ছিল প্রধান অন্তরায়।

www.pathagar.com

বাগদাদে ঈদ

(সাল ১৯১৮ ইং)

মুসলমানদের জন্য বাগ্‌দাদের প্রধান আকর্ষণ—বড়পীর সাহেবের রওজা। সাধারণতঃ, একটানা কাজের ফাঁকে আমাদের মাস, তারিখ ও বারের হিসাব থাকত না। কিন্তু এমন কেউ কেউও ছিলেন যাঁরা তলে তলে এ-সবের হিসাব রাখতেন। এঁরা রাত্রে 'রেশন-টিন'-এ পান্তাভাত রাখতেন এবং ভোরের পূর্বে তা' খেয়ে সারাদিন রোযা রাখতেন। হঠাৎ এদের মুখে শুনলাম—কালই ঈদ। এঁরা আন্দোলন করে ছুটি মঞ্জুর করিয়ে নিলেন। আমরাও সে আন্দোলনে যোগ দিলাম। কারণ, সারা মাস রোযা না রাখলেও 'ঈদ' পড়ে না এবং ঐ দিনে হাসিখুশী করতে চান না কোন্ মুসলমান ? আর জীবনে সান্ধ্যা-আহ্নিক না কর্লেও বিজয়ার দিন কোলাকুলি করে না কোন্ হিন্দু ?

ঈদ বটে! তবে দেশের সেই গোসল করে ভাল পোশাক পরে খোশ্‌বু মেখে মিষ্টি মুখে নামাজ পড়তে যাওয়া সনাতন ঈদ নয়। বড় আশা ছিল একটু গোসল করার। কিন্তু তার ফুরসৎ মিলল না। আর পোশাক বলতেও তো বৈষ্ণবের 'ঠুম' ও 'ঝোলীর' ন্যায় আছে একমাত্র লড়াইয়ের 'ইউনিফর্ম'। অগত্যা ওটাই পরে রওয়ানা হওয়া গেল।

এর উৎস কোথায়, কে জানে ? মনে হচ্ছে সমগ্র পৃথিবীতে একটা শান্তি ও পবিত্রতার আবহাওয়া নেমে এসেছে। বাগ্‌দাদের এই civil—রূপ আমাদের সম্পূর্ণ অপরিচিত।

পথে ঘাটে 'buntings'। ঘর-বাড়ীতে পাতার ঝাড় দোলানো পুরুষেরা ভাল পোশাকে হাসিমুখে সরাইখানায় বসে এক হাতে আলবোলার নলে ধূমপান করছে—(প্রতি টানে বেলোয়ারী আলবোলার অভ্যন্তরে যে "সাগর-মন্থন" হচ্ছে তা' রাস্তা হতেই দেখা যাচ্ছে)—আর হাতে 'তসবিহ' টানছে, গৃহিনীরা পেছনে দাসী নিয়ে দোকানে দোকানে 'সওদা' করে বেড়াচ্ছে—দোকানীর সামনে গিয়ে মুখে 'নেকাব' টেনে দিচ্ছেন আবার ওখান থেকে সরেই 'নেকাব' তুলে দিচ্ছেন—যেন শরতের মেঘের আড়ালে পূর্ণিমার চাঁদের লুকোচুরি! হারুণর রশিদের বাগ্‌দাদ সত্যিই আবার জেগে উঠল নাকি ? .....

মসজিদে হাজির হলাম। এ-লোকগুলিকে বাড়ী চড়াও করে আমরা বিনাদোষে খোঁচাতে এসেছি—আজ এদের চোখের দিকে চেয়ে বড় লজ্জা কর্তে লাগল। কিন্তু মহান আরব

www.pathagar.com

তার স্বাধীনতা হারাতে পারে, তবু আতিথেয়তা ভুলতে পারে না। আমাদের পরম আপ্যায়িত করে তাদের সারিতে বসাল। পুরা কাপড়-পরা মানুষগুলির মাঝে আমাদের আধা পেন্টের তলায় উরু ও হাঁটুগুলি গোস্তাখের ন্যায় উঁকি দিতে লাগল। লজ্জায় আমরা রুমাল দিয়ে ওগুলিকে যথাসম্ভব জড়িয়ে নিলাম। পোশাক ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা ফুটবল খেলোয়াড়ের ন্যায় হলেও আমরা মনের ভক্তি দিয়ে নামাজ পড়লাম। অতঃপর খোৎবার পালা। আরবের মসজিদগুলিতে মিম্বর দেখলাম—সম্মুখের একটা থামের ভিতর ফাঁপা করে তৈরী। বেদী ও সোপান বাহির হতে দেখা যায় না। উপরিভাগে একটা বৃত্তাকার গবাক্ষ আছে হঠাৎ ওটা দিয়ে শ্বেত-শ্মশ্রু খতিবের শান্ত মুখচ্ছবি দেখা যেতে লাগল। তিনি আবৃত্তি কর্তে লাগলেন। তাঁর মুখখানি মনে হল বড় করুণ, তাঁর দু'চোখে অশ্রু টস্‌টস্ কর্তে লাগল, ক্রমে তা' ধারা বেয়ে নামতে লাগল। যখন খলিফার প্রতি আনুগত্য স্বীকারের অংশ আবৃত্তি কর্তে লাগলেন, হঠাৎ তাঁর কণ্ঠরোধ হয়ে গেল, পরক্ষণেই তিনি ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন। সঙ্গে সঙ্গেই শ্রোতৃমহলে এমন একটা কান্নার রোল উঠল যে, শুধু কান্নার জোরে মানুষের অভীষ্ঠ সিদ্ধ হলে সেই দিন সেই মুহূর্তেই বাগ্‌দাদের খলিফার আসন পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হত। কিন্তু, এদের চোখের জলে রচিত হল আমাদের 'স্বখাত সলিল'। এতে ডুবে মরা ছাড়া আমাদের আর কোন উপায় আছে বলে মনে হল না।

নামাজের পর রওজা দেখতে বের হয়েছি। পথেই পড়েছে এক রওজা—বড়পীর সাহেবের ওস্তাদের নাম শেখ ফরিদুদ্দীন কি এমনি একটা-কিছু। ভিতরের দৃশ্য বড় গম্ভীর ও মহান। দর্শকের ভীড় নেই বল্লেই চলে—যে দু'চারজন এসেছে সকলেরই তটস্থ ভাব, যেন পান থেকে চুন খসলেই গর্দ্দান যাবে। এ-রওজার প্রতি যত না আছে ভক্তি তার বহুগুণ আছে ভয়। এখানে কোনরূপ বেয়াদবী করলে নাকি আর রক্ষা নেই। তাই সকলেই ইশারায় বা চুপিচুপি কথা বলছে। শুধু এক কোণে এক খাদেম কোরান আবৃত্তি করছেন। তাঁর আবৃত্তি সমগ্র রওজা ও উহার প্রাচীরে ঘেরা আঙ্গিনা জুড়ে মন্দ্রিত হচ্ছে, উহার প্রতিটি বর্ণ বুঝা যায়। এখানে প্রকৃতি যেন যোগমগ্ন হয়ে আছে। বাইরে যে একটা সাম্রাজ্যের পতন হল, ওটার প্রতি তার কোন ভ্রূক্ষেপ আছে বলে মনে হল না। .....

চতুর্ভূজের পশ্চিমের বাহুর দক্ষিণ অংশে রওজা। পূর্বদিক হতে ঢুকতে প্রথমে একটা Ante Chamber—ওটাতে নামাজ পড়া হয়। ওটার পশ্চিমের কক্ষেই মহাপুরুষের সমাধি। সমাধির চারপাশে ballustrade-এর ঘেরা। Ballustrade-গুলি সোনার কি রূপার ছিল। ঠিক কোনটার ছিল তা' আমার মনে পড়ে না। ওগুলোর উপর হাত রেখে আমি অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। বাইরে ভিখারীর দল কিল্‌বিল্ করছে, ভিতরে আমি অভিভূতের ন্যায় দাঁড়িয়ে আছি আর নিম্নে মহাপুরুষ অনন্ত শয়নে শায়িত—ইসলামের এই স্বপ্ন, সুষুপ্তি ও জাগরণ—এর মধ্যে কোনটা সত্য কে বলবে ?

www.pathagar.com

দেখার নজরুল

তখন হাবিবুল্লাহ বাহারের উদয়ন যুগ। মাতামহ আবদুল আজীজ বি-এর চট্টগ্রাম শহরস্থ তামাকু মুণ্ডির ভবনে 'বাহার-নাহার' ভাই-বোন বড় হচ্ছিল।

বাহার লিখতে-বলতে পারে, চট্টগ্রাম কলেজের নাম-করা ফুটবল খেলোয়াড়। উদয়ন-যুগে কলিকাতা মোহামেডান স্পোর্টিং-এর কাপ্তেন আর মুসলিম লীগের সংগঠক কর্মী, কর্মী থেকে অন্যতম প্রধান নেতা হতে চলেছে।

বাহার আমাকে মেজদা ডাকতো। কারণ, আমি দিদারুল আলমের মেজদা।

দিদারুল আলম ছিল চট্টগ্রাম মাদ্রাসায় আবুল ফজলের সহপাঠী। ছিল আমার সাত বছরের পেছনে ছোট ভাই।

আমরা 'মওলবী' বাড়ীর ছেলে। ফজলও তাদের অঞ্চলের 'মওলবী বাড়ী'র ছেলে।

বই লেখা আমাদের পরিবারে পুরাতন ঐতিহ্য। তখন মুদ্রণ যন্ত্র হয়নি। কেতাব লিখে নকল করাতে হতো। প্রচারের অন্য কোন সহজ উপায় ছিল না।

কোম্পানীর আমলে এলো মুদ্রণ-যন্ত্র। তার প্রতিক্রিয়ায় দুশো বছর আগে আমাদের এক পূর্বপুরুষ খোন্দকার মোহম্মদ রওশন লিখছেন ঃ কলিকাতায় এক আশ্চর্য যন্ত্র এসেছে। ওটা চালাচ্ছেন জন চেম্বার, আজিমুদ্দীন আর তিতা তেওয়ারী তিন জন মিলে। তাঁরা দেখতে দেখতে কেতাবের হাজার হাজার কপি ছেপে বার করছেন। এই আশ্চর্য যন্ত্রের প্রথম ক'খানি কেতাবের, তিনি বিশদ বিবরণও দিয়েছেন ঃ অমুক কেতাবের এক হাজার কপি বের করেছেন।

আমাদের যুগ মুসলমানদের বাঙ্গালী কৃষ্টিতে এসে স্থিত হওয়ার যুগ।

১৮৩৫ সালে কোম্পানী রাষ্ট্রভাষার আসন থেকে ফার্সীকে তাড়িয়ে ইংরেজীকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। কিন্তু, 'মওলবী-বাড়ী'গুলোতে—তথা 'কাজী-বাড়ী'গুলোতেও আমাদের শৈশব পর্যন্ত এতে পুরাতন ধারার কোন ইতর-বিশেষ হয়নি।

আমার মা ছিলেন 'কাজী' বংশের কন্যা।

www.pathagar.com

'কাজী-বাড়ী'গুলোতে অবস্থা ছিল ভিন্ন রকম। কাজী-বাড়ী, দরগাহ্, মসজিদ, আজান, নামাজ, জুমা সবই ছিল। তবুও এমন বিত্ত-বিষয় ছিলনা যা ধরে থেকে কাজীরা চালিয়ে যেতে পারেন—প্রতিবেশীদের মামলার তদবির—তালাশী করার মত হীন কাজ তাঁদের কর্তে না হয়।

আর, বর্ধমানের চুরুলিয়া অঞ্চল ছিল 'কয়লার খনি'তে ভর্তি। খনিতে জবর আয়োজন করে হতো 'কালীপূজা' বা 'শ্যামা-পূজা'। এটাই ছিল ঐ অঞ্চলের সাম্বৎসরিক প্রধান উৎসব।

'মওলবী-বাড়ী' এবং কাজী বাড়ীগুলোতে শিক্ষার ধারা চলে আসছিল সেই পুরাতন নিয়মে ঃ কালামুল্লা ও ইস্‌লামিয়ৎ শিক্ষা—ধর্মীয় কারণে। অতঃপর ফার্সী শিক্ষা—রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক—সর্ব কারণে।

ফার্সী শিক্ষার প্রথম সোপানে ছিল শেখ সা'দীর গুলিস্তাঁ ও বুস্তাঁ। একেবারে অপরিহার্য।

যে রেওয়াজটা চলে আসছিল সেটা হলো ফার্সীকে উর্দুতে বুঝে নিতে হবে। এমন কি আমাদের যে সব আলেম 'ওয়াজ' বা ধর্মোপদেশ ফেরি করে বেড়াতেন তাঁদের সঙ্গে থাকতেন 'মোতরজ্জম' অর্থাৎ অনুবাদক। আলেম আরবী উদ্ধৃত করে তার অর্থ কর্তেন উর্দুতে। মতরজ্জম সেটা শ্রোতাদের এ দেশী ভাষায় বুঝিয়ে দিতেন। আলেম, মোতরজ্জম ও দর্শক সব এক গ্রামের অধিবাসী হলেও এর কোন ব্যতিক্রম হতো না।

এই আবহাওয়া যখন বর্তমানে—আমি কালামুল্লাহ খতম করে গুলিস্তাঁ ধর্লুম। পড়তা এমনই হলো যে আমাকে গুলিস্তাঁ পড়াবার ভার বাবা নিজেই নিলেন। বাবার প্রধান চরিত্র হলো ক্ষিপ্রতা। আমি মা-ঘেঁসা ছেলে। আমি একে ধীর, তাহে বোকা-বোকা। শুধু মায়ের সঙ্গে তর্ক চলতো ঃ কে বেশী বোকা। আমি বলতুম ঃ মা, তোমার মত বোকা মেয়ে আর নেই। মা বলতেন ঃ তোর মত বোকা ছেলে সংসারে আর দুটো নেই।

মার কেমন সন্দেহ ছিল আমাকে গুলিস্তাঁ পড়ানো বাবার কর্ম নয়। যতটা পারেন আমাকে আড়ালে রাখতেন। তবুও বিস্ফোরণ হলো। আমাকে একেবারে অপদার্থ ঠাউরে বাবা রেগে গিয়ে এক লাথিতে মাটিতে ফেলে দিলেন। মা হাঁ হাঁ করে এসে আমাকে তুলে নিয়ে গেলেন। বাবা বল্লেন ঃ তা হ'লে তোমার ছেলেকে আমি পড়াতে পার্বোনা। মা উত্তর কর্লেন ঃ তোমার পড়িয়ে কাজ নেই।

বাস, আমার গুলিস্তাঁ পড়া বন্ধ হয়ে গেল।

কিন্তু, ইংরেজী স্কুলে ঢুকে আমরা বেশ প্রতিভার পরিচয় দিয়ে চল্লুম।

তবে, একাডেমিক লেখাপড়ার সঙ্গে প্রতিভার একটা যেন বৈরিতা ছিল। আমি কলেজ ছেড়ে যুদ্ধে গেলুম। দিদার কর্লে নন-কো-অপারেশন। মাদ্রাসা থেকে বেরিয়ে গেল—কিন্তু, মাদ্রাসার প্রধান শমসুল ওলামা কমালুদ্দীন আহমদ হয়ে রইলেন তার প্রতিভা ও চরিত্রে মুগ্ধ চিরকালের শুভার্থী।

ছাত্র-মহলের কাছে দিদার ছিল চির-কালের বিস্ময়।

www.pathagar.com

দিদার মোটর-ড্রাইভারী করে, পত্র-পত্রিকায় বের হয় তার কবিতা ও গল্প। ১৯২৫। তাকে পরিবেশ দেওয়ার জন্যই আমি বের করে দেই ত্রৈমাসিক 'যুগের আলো'। 'যুগের আলো'কে মাসিক করে দিদারুল আলম রেঙ্গুন গিয়ে উঠে।

১৯২৯। মাত্র ২৬ বৎসর বয়স। রেঙ্গুনে দিদার প্রায় দিগ্বিজয়ী। রবীন্দ্রনাথ যখন রেঙ্গুন গিয়েছিলেন তাঁর অভিনন্দন রচনা ও পাঠ করেছিল দিদার। কিন্তু, শুভার্থীরা ও বন্ধুরা যখন আসল তাকে রবীন্দ্রনাথের কাছে নিয়ে যেতে দিদার যেতে রাজী হলোনা। বল্লো ঃ আমি দূর থেকে তাঁকে দেখবো।

কলিকাতায় দিদার বন্ধু রূপে পেয়েছিল আবদুল কাদিরকে। আরও অনেককে। তন্মধ্যে খান মোহম্মদ মৈনুদ্দীনও। কলিকাতা গিয়েও দিদার কিছু কিছু দিন থেকেছে।

দুখু মিঞা বহু অবস্থান্তর ভোগ করে খোলস থেকে বেরিয়ে বাংলার আসল প্রজাপতিটি হয়ে হাবিলদার কাজী নজরুল ইসলাম রূপে বেঙাচির লেজের ন্যায় তাঁর হাবিলদার পদবী ত্যাগ করে কবি কাজী নজরুল ইসলাম হয়ে জেঁকে বসেছেন—তখন চট্টগ্রাম তাঁকে আকর্ষণ করছে—মাধ্যম হাবিবুল্লাহ বাহার ও দিদারুল আলম।

কবি ও লেখক হিসেবে দিদারুল আলম অনেকটা সুপ্রতিষ্ঠিত। জসীম তখনও অনেক পেছনে। মাঝে মাঝে দিদারুল আলম চিঠি পায় জসীমুদ্দীনের।

১৯২৮ এর শেষ ভাগে নজরুলকে নিয়ে এলো হাবিবুল্লাহ বাহার তাদের তামাকু মুণ্ডির বাড়ীতে। লোকে লোকারণ্য।

আমিও তাঁকে দেখতে গেলুম। তাঁর তখন সেই সর্বজয়ী ভাব। আমাদের উভয়ের দেখা কিরূপ হয় দেখবার জন্য অনেকের ঔৎসুক্য ছিল। নজরুল 'মহবুব' বলে কিছু উল্লসিতও হয়েছিলেন। কিন্তু, সামনা-সামনি হতেই বোঝা গেল আমরা একে অপরকে কখনো দেখিনি।

১৯২৯ এর প্রথমে নজরুল আমাদের ফতেয়াবাদের বাড়িতে এসে উঠলেন। অবশ্য দিদারুল আলমের টানে।

www.pathagar.com

এই দেশেতে জন্ম যেন এই দেশেতে মরি

কাছে থেকে দূরে। এমনকি দূর থেকে না দেখলে কাছেকেও বোঝা যায় না।

যখন ক্লাস এইট-এ পড়ি পালিয়ে শাহ্‌জাদা ষ্টীমারে চড়ে সমুদ্র পাড়ি দিয়ে কলকাতা পৌঁছি। মোটে পাঁচ হাজার টনী জাহাজ। কিন্তু, আমার কিশোর চোখে মনে হয়েছিল কত না বড়। আর, শীতের সমুদ্রকে দেখেছিলাম আশ্চর্য সুন্দর—কী শান্ত, চাঁদ-সুরুজ পানির ভেতর থেকে উঠে পানির ভেতর ডুবে যায়, কী চমৎকার!

ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করে কলেজে ঢুকেছিলাম। এবার নাম দিয়ে দিলুম যুদ্ধে, বাঙ্গালী পল্টনে। অভিজ্ঞতা হলো রেলে চড়ার—চট্টগ্রাম থেকে কলকাতা, কলকাতা থেকে করাচী—মাঝখানে রাজপুতনার মরুভূমি। ধুলোর ঝড়, গরমে প্রাণ ওষ্ঠাগত—অথচ, পানি নেই কোথাও।

করাচী থেকে আরবের মরুভূমি—ইরাকে কাটালুম তিনটি বৎসর। ছায়ায় থেকেও মোটা কাপড় গায়ে রাখতে হয়। নতুবা হাওয়ার হলা এত গরম যে গায়ে ফোস্কা পড়ে যায়। কত পানি খাই, কিন্তু ঘাম হয় না। উটের নাকের দড়ির সঙ্গে উটের নাকের দড়ি বেঁধে দিয়ে দীর্ঘ কাফেলা চলেছে। উট তো নয়, মরুভূমির জাহাজ। পিঠে আরোহী অমন কাঠ-ফাটা রোদেও ঘুমে অচেতন। এসে পড়লো একটা মরুদ্যান। উটগুলো আপনা থেকেই থেমে গেল, আরোহীরা আপনা থেকেই জেগে গেল। তারপর খাওয়া পিনা। উটগুলো শুয়ে জাবর কাটছে। এবার তার গায়ে হেলান দিয়ে বাঁশী বাজাও, এমন বাঁশী তার সুরে প্রাণ কেড়ে নেয়। মরুভূমির হাওয়ায় কোন রোগ-জীবাণু নেই—না ম্যালেরিয়া, না ওলাউঠা, না যক্ষ্মা। তবে স্যাণ্ড-ফ্লাই অর্থাৎ বালি-পোকা যেন না কামড়াতে পারে। কামড়েছে তো জ্বর হবেই। এর মধ্যে ঝিলিক মেরে চলে যায় আরবী ঘোড়া—যেমনি সুঠাম দেহ তেমনি দ্রুতগতি।

আর আশ্চর্য এই আরব জাতটা। কে না জানে তাদের গৌরবময় ইতিহাস।

তখন আমার বয়স প্রায় চল্লিশ। দেশ-ভ্রমণে বের হলুম। মনে হলো ঃ একই মানুষ আব-হাওয়ার, সমাজ-ব্যবস্থার, জীবিকার চেষ্টার পরিবর্তনে এমন বদলে গেছে যে তাকে আগের মানুষটি বলে আর চেনা যায়না। তার রং বদলে গেছে, নাম বদলে গেছে ভাষা

www.pathagar.com

বদলে গেছে, পোশাক আর খাদ্য সব বদলে গেছে। কিন্তু, গভীর দৃষ্টিতে ধরা পড়ে সে একই মানুষ। আশ্চর্যও লাগে, এটা দেখে আনন্দও হয়।

আরও বিশ বছর কেটে গেল। হঠাৎ যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট দাওয়াত দিলেন ঃ ৬০ দিন ঘুরে আমাদের দেশটা দেখে যান। ফল হলো ঃ খুব উঁচু দিয়ে বিমান ভ্রমণ। আল্পস পর্বতে তুষার জমেছিল। মনে হচ্ছিল সাগুদানার বিভিন্ন পাহাড় যেন জমে আছে। সুইজারল্যাণ্ডের হ্রদগুলিকে এক নাগাড়ে দেখা যাচ্ছিল একটা জলাশয়ের মত আর শহরগুলো যেন তার তীরে তীরে ঘাট। গ্রেট বৃটেনের সবটাই এক সঙ্গে দেখা যাচ্ছিল। ক্ষুদ্র জায়গা। কিন্তু, কলার খোলের মত জাহাজগুলো সার বেঁধে করছে আসা যাওয়া দ্বীপটির চতুর্দিকে। আটলান্টিক পারাপার কর্লেম এত উঁচু দিয়ে, সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ-ভঙ্গকে মনে হচ্ছিল যেন দানা দানা সাগু সিদ্ধ হচ্ছে।

সাজানো-গোছানো সুন্দর দেশ। তবে, তার নিজস্ব ধারা আছে। যেমন, বৃটিশের কায়েম করা আমাদের অভ্যাস Keep to the left বাঁয়ে চলো। এদের হলো উল্টো ঃ ডানে চলো। এটা মনে না থাকায় উইনষ্টন চার্চিল প্রথম যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণে এসে রাস্তায় নেমেই গাড়ি চাপা পড়ে যান। জখম হয়ে বেশ কিছু দিন ভুগেছিলেন।

বিদেশ-ভ্রমণে সাফল্যের চাবিকাঠি হলো ঃ কৌতূহল এবং লোককে জিজ্ঞাসা করার নিরলস উদ্যম। সব দেশেই বিদেশী দেখলে লোকে সাহায্য কর্তে তৎপর হয়। যুক্তরাষ্ট্রের পুরো গণতান্ত্রিক চেহারা। মলবাহী মেথর নেই, মালবাহী কুলী নেই। তুমিও যেমন, আমিও তেমন। পথের হদিস জিগ্যেস করলে তো যে কেউ আপনাকে দেখিয়ে দেবে। তার মধ্যে হয়তো প্রেসিডেন্টও রয়েছেন।

জওহর লাল নেহ্রুর খুব ভালো লেগেছিল ভ্যাকুয়াম ক্লীনার, কলের ঝাড়ু। এ ঝাড়ু মান-ইজ্জৎ বজায় রেখে সকলেই চালিয়ে যেতে পারে। কোমর বাঁকিয়ে পিঠ দুমড়িয়ে ঠেলতে হয়না। তাই দেখা যায়, বিশ্ব বিদ্যালয়ের কোন কোন প্রেসিডেন্ট অবসর গ্রহণ করার পর সময় ক্ষেপনের জন্যে ঝাড়ুদারের কাজ নিয়েছেন।

মস্ত দেশ। আবহাওয়া অনুকূল। হোটেলে মশারি খাটাতে হয় না। আদিম অধিবাসী রেড ইণ্ডিয়ানেরা এখন মুষ্টিমেয় উপজাতিতে পরিণত হয়েছে। তাদের কোন ঠাসা করে দিয়ে ইউরোপের প্রায় সব জাতের লোকই একদিন পথ-প্রদর্শক হয়ে এখানে এসেছিল। তারাই গোড়া পত্তন করে মিশ্র আমেরিকান জাতির। তাঁরা উদ্যোগী, পরিশ্রমী এবং অত্যন্ত কর্ম-কুশল।

ফিরার পথে হজ্ব কর্লুম। সৌদী আরবে কাউকে ভিক্ষে কর্তে নিষেধ করা হয়না। কিন্তু একমাত্র এই শর্তে যে বসে বসে ভিক্ষে করবে। দাঁড়িয়ে বা হেঁটে হেঁটে ভিক্ষে কর্তে চাইলেই পুলিশ ধরে দেয় মার। এই সহজ উপায়ে পেশাদারী ভিক্ষুকদের নিয়ন্ত্রণে রাখা গেছে।

স্থান-মাহাত্ম্য অনুভব করা যায় আরাফাতের ময়দানে। হজ্ব-ব্রতীরা যেন আল্লাহ্র ডাক শুনতে পান আর উত্তর দেন—'লব্বায়কা, লব্বায়কা'ঃ 'জ্বি হুজুর, জ্বি হুজুর'।

www.pathagar.com

অতঃপর কয়েক দফা সফর করেছি তখনকার পশ্চিম পাকিস্তান ঃ করাচী, লাহোর, পেশাওয়ার, ওয়ার্সাক আর ইস্তক-জামরুদ থেকে তোরখাম—পুরো খাইবার পাস—লাণ্ডিকোটাল সহ।

আমাদের পাহাড়গুলো যেন অনেক প্রাচীন ও নির্জীব। তুলনায় ওদের পাহাড়গুলো যেন অধিকতর তরুণ এবং একটা প্রচণ্ড শক্তি বিকিরণ করে চলেছে।

তবে, যতবারই চট্টগ্রামের ক্রোড়ে ফিরেছি—জাহাজে করে কর্ণফুলীতে ঢুকে পুবে দেয়াঙের পাহাড় ও পশ্চিমে সবুজ বনানীর উপর চোখ ফেলেছি, ততবারই মনে হয়েছে এমন সুন্দর দেশ আর নেই। ওমা, তোমার চরণ দু'টি বক্ষে আমার ধরি, আমার এই দেশেতে জন্ম যেন এই দেশেতে মরি!

www.pathagar.com

জানার নজরুল

গাছের সাথে আমার ভাব ছিল। মনে হতো এক একটা মানুষ, বাড়ীর পশ্চিম দিকেই পাহাড়, গভীর জঙ্গল, মাঝে মাঝে বড় বড় গাছ। সেই জঙ্গলে ঢুকে সব চাইতে উঁচু গাছটিতে চড়ে আমি বসে থাকতুম; চারধারে গভীর শান্তি সেই শান্তিতে তন্ময় হয়ে আমি গাছের কথা, বনের নীরব কথা বুঝতে চাইতুম। বাড়িতে সুপারী বাগানের ভেতর ছিল বাঁশের তৈরী আমাদের ছোট দেউড়ি ঘর। জ্যোৎস্না রাতে ওর ক্ষুদ্র বাতায়ন খুললেই চোখে পড়তো অপূর্ব এক রহস্য, সুপারী গাছগুলো যেন মানুষ হয়ে উঠেছে।

১৯২৯ এর ২৫শে জানুয়ারী হবে, নজরুল আমাদের বাড়ী এলেন। আকাশে শাঁক ডাকার মত গলার আওয়াজ, চোখে সর্বজয়ী দৃষ্টি, দেশ ভেঙ্গে ছাত্ররা ও যুবকেরা আসতে লাগলো আমাদের বাড়ী। পুকুর থেকে মাছ তুলেছিলাম, তাজা মাছ খেয়ে খুব খুশী হলেন। একপাশ থেকে বেড়ালটি মিউ মিউ করছিল। কবি বললেন ঃ বাবা, কিছু কাঁটা দিয়ে দাও, আমি তাতেই তুষ্ট। তাকিয়ে দেখি, আমরা পাঁচ জনই খেতে বসেছি বটে।

তখন নাম নিয়ে রহস্য করার খুব ঝোঁক। নবযুগ যখন চালাতেন তখন আয়ার্ল্যাণ্ডে সিনফিনদের খুব প্রাবল্য আর স্যর গ্রীনউড হ্যামার ছিলেন বৃটিশ হোম সেক্রেটারী। নজরুল লিখতেন ঃ কাঁচা কাঠের হাতুড়ি মশাই। 'সওগাত'-এর সম্পাদক নাসির উদ্দীনের কথা উঠল, কবি বল্লেন ঃ কবন্ধ উড্ডীন।

রাত্রে পাশাপাশি শুয়েছিলাম। হঠাৎ গভীর রাতে উঠে কবি বাতায়ন খুল্লেন। এমন রহস্য চোখে পড়লো কবি তন্ময় হয়ে গেলেন, মুখে রব 'আ-হা-হা, কি দেখলাম! আ-হা-হা কি দেখলাম!'

কবির মনে হলো ঃ আমার বাতায়ন-পাশে এই তরুর সারি, এরাতো আমার নিশীথ জাগার সাথী। জ্যোৎস্না তো পাণ্ডুর হয়ে আসছে, এবার যে বিদায় নিতে হবে! এই ঝিলিমিলিও বন্ধ হয়ে যাবে, আমাদের নিরালা আলাপও আর চলবেনা।

আমি ঘুম থেকে জেগে উঠেছিনু হঠাৎ, ললাটে যেন কাদের নিঃশ্বাস পেলাম। কারা যেন শিয়রে জেগে আমাকে ব্যজন কচ্ছে। ওরাই তো স্বপ্নচারী আমার নিশীথ রাতের বন্ধু শুবাক তরুর সারি।

www.pathagar.com

এখন যে পড়ছে মনে সারা রাত আঁখি-ইশারায় আমরা কত যে আলাপ করেছি। একাকি জেগে আঁখি জ্বালা করে যখন জল আসতো তোমাদের পাতাকে মনে হতো আমার প্রিয়ার সুশীতল করতল, পল্লব-মর্মরকে মনে হয়েছে যেন তারই কণ্ঠের সকাতর আবেদন। তোমাদের পাতায় পাতায় যেন তারই চোখের কাজল লেগে রয়েছে।

আরে আরে, তোমাদের দেহের মতনই তো দীর্ঘ তার দেহখানি। তোমাদের মৃদু আন্দোলনে যে ঝিরঝির মির রব উঠছে তার মধ্য দিয়ে যেন শুনতে পাচ্ছি আমার প্রিয়ারই কুণ্ঠিত বাণী।

আরে, আরে, তার শাড়ীর আঁচল যেন তোমাদের শাখায় ঝোলান দেখতে পাচ্ছি।

ভাবতে ভাবতে হয়তো ঘুমের শ্রান্ত কোলে ঢলে পড়েছি। আর, অমনি শুরু হয়েছে ঝাঁকে ঝাঁকে স্বপ্ন দেখা, আমার শিথানের পাশে তোমাদের সুনীল ঝালর যেন তেমনি দুলতে রয়েছে, আর তোমরা যেন গোপনে এসে আমার তপ্ত ললাটে চুমো খাচ্ছ।

'আ-হা-হা, কি দেখলাম! আ-হা-হা, কি দেখলাম!' মুখে নিয়ে সকাল থেকে নজরুল যেন দানোয় পাওয়া। কাগজ কলমতো সাথেই। নজরুল হিজিবিজি লিখেই চলেছেন। কিন্তু এ যেমন তেমন দানো নয়। এ দানোর নাম 'বাতায়ন পাশে গুবাক তরুর সারি।' এর একটা রূপকে কবিতায় বন্দী করেছেন তো মননে তার আরেকটা রূপ উদিত হয়ে জ্বলজ্বল করতে থাকে। তার কত রূপ, কত ছটা!

স্বপ্নে হয়তো হাত বাড়িয়েছে তোমাদের একটু ছোঁবে বলে, হাত ঠেকে ফিরে এসেছে। মাঝখানে যে বাতায়ন! কী লজ্জা, বাতায়নের অস্তিত্ব যে একদম ভুলেই গিয়েছিলুম, আর এখন ? সে বাতায়ন যে একদম রুদ্ধ করে চলে যেতে হবে। পথ যে আমাকে আবার ডাকছে, ঘণ্টা পড়ে গেছে ঃ কর যাত্রার আয়োজন।

সে দিনই 'আলম পরিবার' থেকে তাঁকে এক অভিনন্দন জানানো হচ্ছিল। কিন্তু, কবির অন্তর তখনও গুমরে মরছে, আমার যে সাধ রয়ে গেছে ঃ নিজেকে তোমাদের নিকট আরও প্রকাশ করি, তোমাদের আরও একটুখানি জানি।

শুধু মুখের ভাষায় কি মন প্রবোধ মানে! আমার লোভ হচ্ছে তোমাদের বুকের ভাষা জানতে। আমার বেদনার বীণা-পাণি যে শুধু বুকে বুকে বীণা বাজাতে অভ্যস্ত।

এবার কবি দ্রষ্টা হয়ে উঠলেন, হয়তঃ তোমরা যা নও তাই বলে আমি দেখেছি। তাতেই যদি আমার হৃদয় ভরে উঠে তাতে কি তোমাদের কোন ক্ষতি আছে ? আমার আঁখির জল যদি তোমাদের সুন্দর করে তোলে, হীরা মমতাজকে নিয়ে কেউ যদি নূতন তাজ মহল গড়তে চায়—তাতে কার কি ক্ষতি ?

হয়তো তোমাদের শাখায় কখনো পাখি এসে বসেনি, কোকিল ডেকে ওঠেনি, শূন্যের পানে পল্লব আবেদন তুলে হয়তো তোমরা একাই জেগেছ। হয়তো সকলের আগে আমিই তোমাদের দিকে চেয়ে নিশি জাগলাম, তোমাদের ভালবেসে গেলাম, তোমাদের পাতায় প্রথম প্রণয়-লিখা লিখলাম আর দেখা হোক না হোক—এটাই আমার সান্ত্বনা হয়ে থাক। অতঃপর কবি-চিত্ত সমুদ্ভাসিত হলো—প্রকটিত হলো নিয়তির অলঙ্ঘ্য বিধান; কবি নিজের

www.pathagar.com

সম্বন্ধে ভবিষ্যৎবাণী কর্লেন।

তোমাদের পানে চাহিয়া বন্ধু আর আমি জাগিবনা।
কোলাহল করি সারাদিন-মান কারো ধ্যান ভাঙ্গিবনা
—নিশ্চল নিশ্চুপ
আপনার মনে পুড়িব একাকী গন্ধ-বিধুর ধূপ।

নজরুলের এই পরিণতি শুরু হয় প্রায় এক যুগ পরে। গুবাক তরুর সারির রহস্যালোকে বসে সেদিন নজরুল নিজের বিধিলিপি পড়ে নিয়েছিলেন।

আমি তাঁর এই কবিতা পড়ি পরে। কিন্তু তাঁর সেইদিনের মুগ্ধতা ও তন্ময়তা আমি লক্ষ্য করেছিলাম। আমার মনে ছিল।

১৯৫১ সাল। আমি খুলনায় ডিষ্ট্রিক্ট সাব রেজিষ্ট্রার, বাগেরহাটের কোথাও এক নজরুল জয়ন্তী হচ্ছিল। আমাকে উদ্যোক্তারা প্রধান অতিথি করে নিয়ে গেলেন। সে অনুষ্ঠানে একজন সুশীল জানার এক প্রবন্ধ পড়লেন। সুশীল জানা বলছেন ঃ নজরুলকে দেখতে গিয়েছিলুম। তাঁর কবিতার বই সঙ্গে ছিল। ওল্টাতে নজর পড়লো 'বাতায়ন পাশে গুবাক তরুর সারির'র উপর। কবি তাঁর আড়ষ্টতা অগ্রাহ্য করে চেঁচিয়ে উঠলেন' "চট্টগ্রাম! চট্টগ্রাম!"

এটা শুনে আমি এমন অভিভূত হই যে আমার আঁখি সজল হয়ে উঠে। মনে পড়লো ঃ 'আ-হা-হা, কি দেখলাম!' আর মনে পড়লো আমি তো নজরুলকে দেখতে যাইনি।

অতঃপর কবি আবদুল কাদির ও কাজী আবদুল ওদুদকে নিয়ে তাঁকে দেখতে যাই।

www.pathagar.com

অম্বর মসজিদ

রাজপুতনা বা রাজস্থান। মার্বেল পাথরের দেশ, আগ্রার সুবিখ্যাত তাজমহল যা' দিয়ে গড়া।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ডামাডোলে হঠাৎ দেখি ঃ আমি অম্বর প্রাসাদের সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছি।

প্রাসাদের সঙ্গেই ছোট্ট হলেও ভারী সুন্দর একখানি মসজিদ। এই দৃশ্য রাজস্থানের আর কোথাও নেই।

ব্যাপার হলো, অম্বরের রাণী বিহারী মলের কন্যা যধো বাই ছিলেন আকবরের প্রধান মহিষী। বিকানীর ও যশল্মীরের রাজারাও আকবরকে কন্যা দান করেছিলেন।

আকবরের পিতামহ বাবর বাংলাদেশকে বলতেন বল্যাকপুর অর্থাৎ বিদ্রোহপুরী যেখানে বার মাস বিদ্রোহ লেগেই থাকতো। বাঙ্গালী চরিত্রে যুদ্ধবাজিতা অতি প্রাচীন।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে বঙ্গদেশ কৌরব পক্ষে যোগ দিয়েছিল। মহাভারতের ভীষ্ম পর্বে বলা হয়েছে যে বঙ্গাধিপ ১০ হাজার হস্তী নিয়ে ভীম পুত্র ঘটোৎকচের পশ্চাদ্ধাবন করেছিলেন। এরূপ রণ-হস্তীর সমাবেশও ভারতের আর কোন রাজার পক্ষে সম্ভব ছিল না।

সগরের এক উত্তরাধিকারী রঘু রাজা হয়ে বিশ্বজিৎ যজ্ঞ করার উদ্যোগ নিলেন। তখনকার জানা বিশ্ব আর কতটুকু! তখন গোটা আসামই কামরূপ নামে পরিচিত ছিল। তিনি কামরূপ জয় কর্লেন। কিন্তু ফিরার পথে বাংলাদেশীরা তাঁকে জলযুদ্ধে বড়ই বিব্রত করেছিল।

ঐ ত্রেতাযুগের আর্যদের শারীরিক দৈর্ঘ্য ছিল চৌদ্দ হাত। রঘু হ্রস্বকায় বাংলাদেশীদের শেষ পর্যন্ত পরাজিত করতে সক্ষম হন বটে, কিন্তু তাদের বীরত্ব দেখে তিনি বিস্মিত ও মুগ্ধ হয়েছিলেন।

রঘু যে সমতটের বাংলাদেশীদের পরাজিত করেছিলেন তাঁর পৌত্র দশরথের সময় পর্যন্ত তা' অক্ষুণ্ন ছিল বলে মনে হয়। কারণ বলা হয়েছে দশরথের রাজত্বকালে বাংলাদেশ অযোধ্যার অধীন ছিল। কেননা আমরা দেখতে পাই, দশরথ কৈকেয়ীকে বলছেন, ধন

www.pathagar.com

ধান্য পূর্ণ বিশাল ও সমৃদ্ধ বঙ্গদেশ তোমার ভরতকেই দেই তথাপি তুমি রামের বনবাস কথাটি ত্যাগ কর ইত্যাদি।

এখানে এখন যেটা বাংলাদেশ সেটার প্রাকৃতিক গঠনের প্রতি একবার দৃষ্টি দিতে হবে।

বাংলাদেশের অধিকাংশই প্রধানতঃ গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র নদের অববাহিকা। তবে, সিলেট জেলার পাহাড়-পর্বত ও সমগ্র চট্টগ্রাম অঞ্চল এ অববাহিকার সম্পূর্ণ বাইরে ও পৃথক।

ভৌগলিক কারণে—যেমন সমুদ্র তলের এগিয়ে আসা বা সরে যাওয়ার ফলে ভূত্বকের গঠন ধর্মও প্রভাবিত হয়। এইভাবে উক্ত অববাহিকার গঠনকার্যও প্রভাবিত হয়েছে। ফলে ওটার বৃহত্তর অংশ উপরে উঠে এসেছে। আবার কোন কোন অংশ নীচের দিকে দেবে যাওয়ার প্রবণতার অধীনে।

বরেন্দ্র ভূমি ও ত্রিপুরার ভূ-পৃষ্ঠ এবং মধুপুরের গড় অঞ্চল ক্রমেই উপর দিকে উঠে যাচ্ছে। সমগ্র খুলনা বিভাগ ও ফরিদপুরের বিল সম্বলিত পরিষ্কার ভূ-ভাগটি এবং ময়মনসিংহ জেলার পূর্বাংশে হাওড় অঞ্চল ক্রমেই নীচের দিকে দেবে যাচ্ছে। এই অঞ্চল গত দুইশ' তিনশ' বৎসরের ৩০ থেকে ৪০ ফুট দেবে গেছে বলে অনুমান করা হয়।

এই অববাহিকা ওটার সংলগ্ন কতক এলাকাসহ ভূ-ত্বকের গঠনধর্মী ক্রিয়াকার্যে পৃথিবীর অত্যন্ত সক্রিয় এলাকাসমূহের অন্যতম। আর, বাংলাদেশের ন্যায় এমন নদীবহুল দেশও পৃথিবীতে আর নেই। কিরূপে নদীর ভাঙ্গা গড়া দ্বারা ভূ-পৃষ্ঠের নির্মাণ কার্য অব্যাহত গতিতে চলছে তা' বাংলাদেশে দেখতে পাওয়া যায়।

চট্টগ্রাম অঞ্চল ভারতীয় ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্য দিয়ে সিলেট জেলার দক্ষিণ পর্যন্ত জুড়ে রয়েছে। এখানে হারার গজশৃঙ্গ ১১০২ ফুট উঁচু। এই অঞ্চল যেমনি পৃথক তেমনি প্রাকৃতিক দৃশ্যে ছবির মত সুন্দর। সীতাকুণ্ড শৃঙ্গ ১১৫৫ ফুট উঁচু। এখানে কয়েকটি উষ্ণ প্রস্রবন আছে। এই অঞ্চলের দক্ষিণ অংশে মৌডক মুরাল শৃঙ্গ ৩২৯২ ফুট বাংলাদেশে সর্বোচ্চ। এই অংশে অনেক জলপ্রপাত আছে। ৭০ ফুট থেকে ৩৫০ ফুট পর্যন্ত পতনের পরিমাণ। ৩৫০ ফুটের সর্বোচ্চ প্রপাতটি লুসাইং শৃঙ্গের নিকট অবস্থিত। কাপ্তাই মনুষ্য নির্মিত হ্রদের মধ্যে পৃথিবীতে অন্যতম বৃহত্তম। এর পরিমাণ ২৯৬ বর্গ মাইল। বর্ষাকালে উহা ৪০০ বর্গ মাইল পর্যন্ত প্রসারিত হয়। মহেশখালী (১০০ বর্গ মাইলের অধিক) বাংলাদেশের মধ্যে একমাত্র দ্বীপ যার অভ্যন্তরে পাহাড় রয়েছে।

সুন্দরবন অঞ্চল অতিশয় নিম্ন। ৩০০০ বর্গ মাইলের এই এলাকার উচ্চতা ৩ ফুট থেকে ৮ ফুটের অধিক নহে। সুতরাং বাংলার বীর্য এসেছে বাংলার মাটি থেকে। এরূপ উর্বর সদা গঠনশীল, মনোমুগ্ধকর ও জীবন-যাত্রা-সহজ মাটি পৃথিবীর আর কোথাও নেই। এরূপ নদী বহুল দেশও পৃথিবীর আর কোথাও নেই।

যাই হোক, রাণী বিহারী মল দেখেছিলেন জামাতাকে মুসলমান রূপে। তাই প্রাসাদে ছোট্ট একখানি মসজিদও যোগ করে দিয়েছিলেন। বলা যায় না হঠাৎ কখনো যদি জামাতার ইচ্ছে হয় যে তিনি নামাজ পড়বেন, আল্লাহ্‌র কাছে সেজদা দেবেন।

www.pathagar.com

কিন্তু এই মসজিদই নিরক্ষর সম্রাটকে দারুণভাবে জাগিয়ে তোলে। আকবর সঙ্গীতের অত্যন্ত অনুরাগী ছিলেন। এক সময় ৩৬ জন সঙ্গীত শিল্পী তাঁর দরবারে শোভা বর্ধন কর্তেন। তম্মধ্যে প্রধান ছিলেন মিয়া তানসেন এবং মাল্ওয়ার ভূতপূর্ব সুলতান খান বাহাদুর।

মীরা বাই ছিলেন প্রসিদ্ধ ভজন গায়িকা রাজকন্যা এবং রাজরাণী হয়েও এই গানের কারণে তিনি সর্বস্ব ত্যাগ করে অম্বরে এসে জুটেছিলেন।

আকবর ফকিরের বেশ ধরে মীরার অলক্ষিত তাঁর গান শোনার ব্যবস্থা করেন। তাঁর গলায় ছিল মূল্যবান মোতির মালা। গান শুনতে শুনতে তিনি নিজেকে এমন হারিয়ে ফেলেন যে মালা ছিঁড়ে গিয়ে বহুমূল্য মোতিগুলি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। তখন ফকিরের বেশধারী আসল ব্যক্তিটা কে সে সম্বন্ধে কারও সন্দেহ রইল না। যা হোক আকবর মীরার ভক্ত শ্রোতা হয়ে থাকলেন।

কিন্তু সম্রাট ভুলেন নি যে তাঁকে সুবে বাংলার বাঙ্গালীদের বিদ্রোহ এবং সুবে উড়িষ্যার পাঠানদের বিদ্রোহ দমন কর্তে হবে। এ কাজে যোধা বাইয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র রাজা মানসিংহকে সর্ব প্রকারের ক্ষমতা দিয়ে নিযুক্ত করেছিলেন।

উড়িষ্যার পাঠান শাসনকর্তা সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হলে সম্রাট তাঁকে দমন করবার জন্যে রাজা মানসিংহকে প্রেরণ করেন।

রামচন্দ্রের মহানুভবতার পরিচয় পেয়ে আকবর তাঁর সব অপরাধ ক্ষমা করে দিলেন। তাঁকে সুবে বাংলা ও সুবে উড়িষ্যার সদর কানুনগো নিযুক্ত করেছিলেন।

এখন বিদ্রোহ দমনে রামচন্দ্র রাজাকে প্রভূত সাহায্য কর্লেন। রাজাও তাঁকে প্রভূত রূপে পুরস্কৃত কর্লেন।

বাঁশবেড়িয়ার সাবর্ণ পরিবারকে রাজা মানসিংহ 'রায় চৌধুরী' উপাধি প্রদান করেন।

মানসিংহের এক সেনাপতি ছিলেন ধর্মদাস কুণ্ডু। বাংলা বিজয়ের পর মানসিংহ তাঁকে 'জায়গীর' ও রাজা উপাধি অর্পন করেন।

আরও নয়জন সেনাপতিকে মানসিংহ এভাবে সম্মানিত করেন। কিন্তু বহু চেষ্টা করেও মানসিংহ বাংলার বার ভুঁইয়াকে দমন কর্তে পার্লেন না। পদ্মা ও ভাগিরথী নদীর পূর্ব ও উত্তর দিকস্থ সমুদয় স্থান বার ভুঁইয়ার অধিকারভুক্ত ছিল।

বাংলাদেশের শেষ পাঠান রাজ দাউদ খাঁকে যখন সিংহাসনচ্যুত করা হয়েছিল তখন পূর্ব দিকে বিষ্ণুপুর থেকে চন্দ্রদ্বীপ, দক্ষিণে কোচবিহার থেকে হিজরীর উত্তরাংশ বার ভুঁইয়ার আক্রমণে বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছিল। তবে ভুঁইয়ারা পরস্পরের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছিলেন। দাউদ খাঁর পরাজয়ের পর একাদশজন ভুঁইয়া দ্বাদশ ভুঁইয়া (যশোরের মহারাজা) প্রতাপাদিত্যের নিকট বশ্যতা স্বীকার করেন। পরে মোগল বাহিনীর হস্তে মহারাজ প্রতাপাদিত্য শোচনীয় রূপে পরাজিত হন।

www.pathagar.com

মোহর্‌রম

চট্টগ্রামে 'গরুর লড়াই' 'মোষের লড়াই' থেকেই এত সব উৎসব প্রচলিত ছিল যে আজ এসব কথা ভেবে অবাক লাগে। তেমন এক উৎসব মোহরমের 'তাজিয়া', চট্টগ্রামীরা বলে 'গোঁ'রা'। আসল শব্দটি কি বলতে পারিনে।

'কারবালা'র দেশ ইরাকে আমি তিন বছর সৈনিকতা করেছি। প্রথম 'মোহরম'-এর সময় রাত্রে হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে মনে হলো ঃ সমগ্র প্রকৃতি যেন ফুকারছে 'হাসান! হোসেন!' পরে জানলাম দু'দল হয়ে যুদ্ধের মহড়া দেখানো হয় এবং হোসেন পক্ষের নেতাকে প্রকৃতই হত্যা করে মাথা কেটে ফেলা হয়। সেটা দেখবার আমাদের সুযোগ হয় নি। কারণ, বৃটিশ আর্মী কর্তৃপক্ষ আদেশ জারী করে এরূপ মহড়া বন্ধ করে দেয়।

চট্টগ্রামে ১৬৬৬ থেকে শতেক বৎসরের নবাবী আমলে প্রশাসনে ছিল শিয়া এবং তাদের নিম্নতর স্তরে ছিল কুট্টিরা। সম্ভবতঃ এ সময়ে এদের হাতেই 'গোঁ'রা'র সূত্রপাত হয়। ক্রমে এটা চট্টগ্রামী মুসলমানদের জাতীয় উৎসব হয়ে উঠে।

'গোঁ'রা' হলো কারবালার ঘটনার একটা প্রতীক—যাকে সাজানো হতো—শীর্ষে কাটা-মস্তকের একটা আদল তার উপর চাঁদোয়া ছাতির মত খাটান।

প্রত্যেক 'গোঁ'রা'র পেছনে খেলোয়াড়ের দল—লাঠি, সড়কি, গোপ্তা, বুরুজ নানা অস্ত্র-শস্ত্রের —আর তার সঙ্গে বাজনা। ওস্তাদরা গাঁজা ভাং খেয়ে মাঠে নামতো, খেলার মাধ্যমে তারা অমানুষিক বিভীষিকার সৃষ্টি করে তুলতো।

আমি যতই বড় হচ্ছিলাম ততই মুসলমানদের ভূমিকা দেখে আমার অন্তর ক্ষোভে-দুঃখে ফেটে পড়ছিল। মুসলমান-সাধারণ মহাজন ও জমিদারের শোষণের শিকার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। যারা অসাধারণ এমন কি মওলবী-মোল্লারা পর্যন্ত শোষকদের দালালে পরিণত হয়েছিল।

এই বৎসর আমার পাড়ার ছেলেরা পর্যন্ত একটা অনুপ্রেরণা খুঁজে বেড়াচ্ছিল এবং সন্ত্রাসবাদীদের দেখে শুনে তারা একটা গোঁ'রা তোলাই সাব্যস্ত করে। গোঁরা'র উৎসব বরাবরই হয় স্কুলের মাঠে। আমাদের গোঁ'রা মাঠে নামতেই শোনা গেল ঃ জমিদার নিজের

www.pathagar.com

বাড়ির দরজায় একটি মেলা বসাবেন ঠিক করেছেন এবং বটতলীর এয়ার আলী—যার লাঠিয়ালের সংখ্যা এবং দাপট সবচেয়ে বেশী, জমিদারকে আশ্বাস দিয়েছে এবার সব গোঁ'রাই ঐ মেলায় সমবেত হবে এবং কাউকে স্কুলের মাঠে গোঁ'রার উৎসব কর্তে দেয়া হবে না।

আমাদের দল কিন্তু সেটা মানতে রাজী হলো না। স্কুলের মাঠের ন্যায় এমন উপযুক্ত মাঠ আর কোথায় আছে ?

এদিকে এয়ার আলীর দল খবর পাঠালো যে তারা আমাদের গোঁ'রা লুট করে নিয়ে যাবে।

একটা হাঙ্গামা অনিবার্য। পাড়ার প্রধানরা ছেলেদের ছেড়ে রাস্তায় গিয়ে উঠলেন। কিন্তু, আমিও ছেলেদের ছেড়ে যেতে চাইলুম না, এবং ছেলেরাও আমাকে ছাড়তে চাইলো না। বল্লে ঃ আপনিই আমাদের বাঁচাতে পারেন।

এয়ার আলীর দল বটতলী থেকে রওয়ানা হয়েছে। তাদের বাদ্যের আওয়াজ ও হুঙ্কার ক্রমেই আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে।

সময় অত্যন্ত কম। আমাকে ত্বরিত সিদ্ধান্ত কর্তে হবে। মুস্তফা কামালের একটা মুহূর্ত মনে পড়লো। মিত্রশক্তি বৃহত্তর বাহিনী নিয়ে স্তাম্বুল দখল করে আছে। আতাতুর্ক গ্রীসকে পরাজিত করেছেন, এবার ন্যায়ের বলে বলীয়ান হয়ে মিত্র-বাহিনীর মধ্য দিয়ে চানক অতিক্রম করে তাঁকে স্তাম্বুলে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। তিনি তাঁর বাহিনী নিয়ে অগ্রসর হলেন কিন্তু বন্দুকের নল মাটির দিকে নীচু করে। শক্তির দ্বন্দ্ব তিনি চালান। তিনি স্তাম্বুল পৌঁছে গেলেন, তাঁকে ঠেকাবার কোন বুদ্ধি মিত্রশক্তি কর্তে পার্লো না।

আমি এক লাফে গিয়ে গোঁ'রার পরিবহন দণ্ডের উপর চড়ে বসলুম। অর্থাৎ আমাকে স্থানচ্যুত না করে কেউ গোঁ'রা নিয়ে যেতে পারবে না। আমাদের খেলোয়াড়দের বল্লুম যে সকলে লাঠি নীচু করে দাঁড়াবে।

আমার মনে মনে দুটো ভরসা। প্রথমতঃ এয়ার আলী আমার বাবার দীর্ঘকালের অনুরাগী বন্ধু। আমাকে পরিবহন দণ্ডের উপর থেকে স্থানচ্যুত করার কল্পনা তাঁর নাও থাকতে পারে।

দ্বিতীয়ত ঃ পিটুনী পুলিশের দারোগা হয়ে এসেছে নূরুর রহমান। এককালে তাঁদের এলাকায় আমি সাব-রেজিষ্ট্রার ছিলাম, তখন তাঁদের বেশ শ্রদ্ধা কুড়িয়েছিলাম। পরিস্থিতি তাঁকেও জানিয়ে রাখলাম।

এয়ার আলীর দল মাঠে ঢুকল। এয়ার আলী সকলের আগে। আমাকে পরিবহন দণ্ডে আসীন দেখে এয়ার আলী দল নিয়ে এক চক্কর ঘুরে মাঠ থেকে বেরিয়ে গেল।

এরই কিছু স্মৃতি লেপ্টে আছে আমার মোহর্‌রম গল্পে।

www.pathagar.com

নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু

বিশ্ব ঐতিহাসিক এইচ জি ওয়েল্‌স্ ভারতীয় হিন্দুদের বলেছেন ঃ Stratified অর্থাৎ প্রস্তরীভূত—বিভিন্ন স্তরে ভাগ করা সমাজ। কায়স্থদের একটা স্তর লিখিয়ে পড়িয়ের কাজ করে প্রাধান্য ভাগ কর্তো। দ্বাদশ শতকে রাজা বল্লাল সেন যখন ২৭ ঘর কায়স্থকে কৌলীন্য দান করেন ওদের মধ্যে সর্ব প্রথম ছিলেন 'বসু'।

১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এই দেশে ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তন করার পর এই লিখিয়ে পড়িয়ে সমাজ তা' মনে প্রাণে গ্রহণ করে নেয়। ফলে, এই সমাজ একদিকে দেশ শাসনে বিদেশী শাসকদের প্রধান অবলম্বন হয়ে উঠে—অন্যদিকে ইংরেজী শিক্ষার সংস্পর্শে এর তরুণ সমাজ অতিমাত্রায় স্বদেশ সচেতন হয়ে উঠে। পরিণতিতে ১০০ বছরের ব্যবধানে এই সমাজের চেহারা দাঁড়ায় ঃ বাপ সরকারী বড় চাকুরে, খেতাবধারী; ছেলে—এমনকি মেয়ে স্বদেশী। এই স্বদেশীকে প্রাণ নেওয়া, প্রাণ দেওয়ার চরম ক্রিয়ায় নিয়ে পৌছায় ১৯০৮ সালে কিশোর ক্ষুদিরাম বসু মজঃফরপুরের শ্বেতাঙ্গ জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের উপর বোমা ছুঁড়ে এবং ধরা পড়ে গিয়ে ফাঁসী কাঠে প্রাণ দিয়ে।

সুভাষ চন্দ্র বসু কটকের সরকারী উকিল রায় বাহাদুর জানকী নাথ বসুর ষষ্ঠ পুত্র। জন্ম ১৮৯৭।

কিন্তু, ক্ষুদিরাম বসুর ফাঁসী তরুণ সমাজকে ভয়ে নিবৃত্ত করা দূরে থাকুক বরং মরণ-মন্ত্রে এবং দেশের জন্যে চরম ত্যাগে দীক্ষিত করেছিল।

যে ১০০ বছরের কথা বলেছি সেটা আমাদের ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ১৮৩৩ সালে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব জন্ম গ্রহণ করে তাঁর 'সত্য চক্ষু'র সাহায্যে লোককে সরল আর সুন্দর এক জীবনের সন্ধান দিচ্ছিলেন।

১৮৬০ সালে জন্মেছিলেন রবীন্দ্রনাথ যিনি বিশ্ব-কবি বলে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেয়েছিলেন। তিনি জাতিকে শেখাচ্ছিলেন ঃ অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে, তব ঘৃণা তারে যেন তৃণ সম দহে। আর ঃ ওদের বাঁধন যত শক্ত হবে, মোদের বাঁধন ততই টুটবে।

www.pathagar.com

১৮৬২ সালে জন্মেছিলেন বিবেকানন্দ—যাঁর অলৌকিক প্রতিভা ও কার্য-কলাপ ভারতবাসীর মনে এক অভূতপূর্ব প্রেরণার সঞ্চার করে।

১৮৭০ সালে জন্মেছিলেন চিত্তরঞ্জন দাশ—দেশবাসী যাঁকে 'দেশবন্ধু' আখ্যা দেয়—যিনি আমাদের রাজনীতির মোড় ঘুরিয়ে দিয়ে ওটাকে অনেকটা বাস্তবমুখী করে তুলেছিলেন।

বিবেকানন্দ ১৮৮৪ সালে রামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আসেন। মাত্র ২ বৎসর এই সংস্পর্শ স্থায়ী হয়। কারণ ১৮৮৬ সালেই রামকৃষ্ণ দেহ রক্ষা করেন। কিন্তু, এই অল্প সময়ের মধ্যেই বিবেকানন্দের দিগ্বিজয়ী প্রতিভার সাথে রামকৃষ্ণের সহজ মানবিকতা যোগ হয়ে—সকল কলুষের ঊর্ধ্বে ভারতকে নূতন এক মহিমাময় ও মুক্তির সন্ধান দিচ্ছিল।

১৮৯৯ সালে জন্মেছিলেন কবি কাজী নজরুল ইসলাম, যাঁর কবিতা

'চল চল চল
ঊর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল'

পাকিস্তান তার সৈন্যদের 'মার্চিং সং' রূপে গ্রহণ করেছিল।

বাল্যকাল থেকেই সুভাষ চন্দ্রের ধ্যান গুরু ছিলেন বিবেকানন্দ। তিনি চাচ্ছিলেন বিবেকানন্দকে আদর্শ করে তাঁর জীবনকে গঠন কর্তে।

বিবেকানন্দ রাজনীতি করার সময় পাননি। কারণ ১৯০২ সালের ৪ঠা জুলাই তিনি মহাসমাধি লাভ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর বাণী রেখে গিয়েছিলেন ঃ শক্তি ও সাহসিকতাই ধর্ম, দুর্বলতা ও কাপুরুষতাই পাপ। স্বাধীনতাই ধর্ম, পরাধীনতাই পাপ।

সুভাষ কটকের সরকারী স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে ২য় হয়ে। প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হন। তখনকার দিনে অনেক য়ুরোপীয় এমন ব্যবহার কর্তেন যাতে এ দেশবাসীদের প্রতি তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য বোঝা যেত। প্রেসিডেন্সীর অধ্যাপক ওটেন সাহেবও ছিলেন তেমন একজন। ফলে তাঁকে কিছু শায়েস্তা করা হয়। এরপর সুভাষের আর প্রেসিডেন্সীতে টেকা সম্ভব হয়নি। তিনি স্কটিশ চার্চ কলেজে ভর্তি হয়ে দর্শন শাস্ত্রে অনার্সসহ বি-এ পাশ করেন এবং বিলাতে গিয়ে ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় ৪র্থ হয়ে উত্তীর্ণ হন, ইংরেজী ভাষায় প্রথম হয়ে।

ইতিমধ্যে অমৃতসরের জালিয়ানওয়ালা বাগের হত্যাকাণ্ডটি অনুষ্ঠিত হয় ১৯১৯ সালের ১৩ই এপ্রিল। বেআইনী জনতাকে শায়েস্তা করতে গিয়ে জেনারেল ডায়ার সৈন্য ও ট্যাঙ্ক নিয়ে নিষ্ক্রমনের একমাত্র পথ বন্ধ করে দিয়ে নিরস্ত্র জনতার উপর গুলি চালান। এতে ৩৭৯ জন নিহত ও ১২০০ জন আহত হয়। প্রাদেশিক সরকার এর অনুমোদন করেন এবং সামরিক আইন জারী করে একটা নির্দিষ্ট স্থান ভারতীয়দিগকে হামাগুড়ি দিয়ে অতিক্রম কর্তে বাধ্য করা হয়, সামান্য অপরাধে লোককে ধরে বেত মারা হয়।

এটা এমন এক ঘটনা যা' একাই যথেষ্ট ছিল ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের অবসান ঘটানোর জন্য। তখনও ১ম বিশ্বযুদ্ধের জের চলছে যার ১৯১৪ সালের প্রথম ধাক্কা বৃটিশ সামলেছিল ফ্রান্সের ইপ্রে রণক্ষেত্রে বহু ভারতীয় সৈন্য বলি দিয়ে। বৃটিশ যুদ্ধে জিতে যায়। ১৯১৮ সালের ১১ই নভেম্বর যুদ্ধ-বিরতি স্বাক্ষরিত হয়। এই ঘটনার সময়েও বহু

www.pathagar.com

রণক্ষেত্রে যে সকল ভারতীয় সৈন্য বৃটিশের হয়ে যুদ্ধ কচ্ছিল, কিন্তু তখনও তাদের সকলকে ভারতে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়নি। ঘটনাটির সব সংবাদই বৃটিশ যথাসাধ্য চাপা রেখেছিল। কিন্তু ক্রমে সব জানাজানি হয়ে গেল। ক্রোধে ও ক্ষোভে সমগ্র ভারতবর্ষ একেবারে ফেটে পড়লো। নয়া দিল্লীতে এসে সম্রাটের চাচা ডিউক অব কনট বৃটিশ গভর্নমেন্টের হয়ে ভারতবাসীর প্রতি আবেদন জানালেন ঃ ক্ষমা করো ও ভুলে যাও। কিন্তু কোন ভারতবাসীর পক্ষে জালিয়ানওয়ালা বাগকে ভুলে যাওয়া সম্ভব ছিল না।

সুভাষ ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসে যোগ দিতে অস্বীকার কর্লেন।

১৮৯০ খৃষ্টাব্দে অরবিন্দ ঘোষ দশম হয়ে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। গ্রীক ভাষায় তিনি প্রথম হন। কিন্তু অশ্বারোহনে অকৃতকার্য হওয়ায় তাঁকে সার্ভিসে গ্রহণ করা হয়নি। তাঁর সঙ্গেই পাশ করেছিলেন চিত্তরঞ্জন দাশ। কিন্তু বিলাতে তাঁর ভারত সম্বন্ধে একটা বক্তৃতা আপত্তিকর বিবেচিত হওয়ায় তাঁকে সার্ভিসে গ্রহণ করা হয় না। তিনি ব্যারিষ্টারী উত্তীর্ণ হয়ে দেশে ফিরে আসেন।

বিবেকানন্দের পরই সুভাষ ছিলেন অরবিন্দ ও চিত্তরঞ্জনের অনুসারী।

১৯০৮ খৃষ্টাব্দে রাজদ্রোহ ও ষড়যন্ত্রের অপরাধে ইদানিং কালের প্রথম 'ষ্টেট ট্রায়াল' অনুষ্ঠিত হয়। ওটাতে প্রধান আসামী ছিলেন অরবিন্দ ঘোষ। কিন্তু চিত্তরঞ্জন তাঁর কৌসুলী স্বরূপ এমন অসাধারণ যোগ্যতার পরিচয় দেন যে আদালত অরবিন্দকে বেকসুর খালাস দিতে বাধ্য হন। অরবিন্দ পরিণামে বৃটিশ ভারত ত্যাগ করে পন্দিচেরীতে চলে যান এবং আধ্যাত্মজ্ঞান সাধনায় বাকী জীবন কাটিয়ে দেন।

সুভাষ কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দর্শন শাস্ত্রে ট্রাইপোস ডিগ্রী নিয়ে ১৯২১ সালের জুলাই মাসে দেশে ফিরে এলেন।

এর মধ্যে ভারতীয় রাজনীতিতে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী ক্রমে প্রধান পরিচালকের আসনে পৌছেছিলেন। অনেকটা জালিয়ানওয়ালা বাগের প্রতিক্রিয়ায় ১৯২০ সালের জুন মাসে সরকারকে 'কায়সার-ই হিন্দ' মেডাল ফিরিয়ে দেন, তাঁর সেবার কাজের জন্যে এক কালে যা দিয়ে সরকার তাঁকে সম্মানিত করেছিলেন। সেপ্টেম্বর মাসে তিনি সরকারের বিরুদ্ধে অহিংস অসহযোগ ঘোষণা করেন। ১৯৪৩ সালে গোড়সের গুলিতে নিহত না হওয়া পর্যন্ত তিনি ভারতের সবচেয়ে ব্যাপক ও শক্তিশালী রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের সর্বময় কর্তৃত্বে অধিষ্ঠিত ছিলেন। কিন্তু অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন না।

অরবিন্দ ঘোষকে 'ষ্টেট ট্রায়াল' থেকে মুক্ত করার পর চিত্তরঞ্জন দাশ বাংলায় বিশেষ প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন। ১৯১৭ সালে তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলনে সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন।

সুভাষের কিছু পূর্বেই হোসেন শহীদ সুহ্‌রাওয়ার্দী অক্সফোর্ড থেকে বি-সি-এল এবং রাষ্ট্র-বিজ্ঞান, অর্থনীতি ও ইংরেজী ভাষায় এম.এ ডিগ্রী নিয়ে ১৯২০ সালে দেশে ফিরে এসেছিলেন।

গান্ধীর প্রতি প্রথম প্রতিদ্বন্দ্বিতা এসেছিল চিত্তরঞ্জন দাশ থেকে। চিত্তরঞ্জন অসহযোগের

www.pathagar.com

হাত গুটান নীতি পছন্দ কর্লেন না। তাঁর মত হলো ঃ আইন সভার নির্বাচন বর্জন না করে বরং নির্বাচনের সাহায্যে আইন সভায় ঢুকে ভেতর থেকে সরকারকে অচল করে দিতে হবে। এই উদ্দেশ্যে ১৯২৩ সালের ১লা জানুয়ারী তিনি ও মোতিলাল নেহরু কংগ্রেস খেলাফৎ স্বরাজ্য পার্টির প্রতিষ্ঠা ঘোষণা করেন। কংগ্রেসের ভিতর এঁরাই সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেন। গান্ধী তাঁদের দাবী মেনে নিতে বাধ্য হন।

সুভাষ দেশে ফিরে এসেই কংগ্রেসের প্রচার সম্পাদক এবং জাতীয় কলেজের অধ্যক্ষের ভার নিয়েছিলেন। ঐ ১৯২১ সালের ডিসেম্বর মাসে রাজনৈতিক কারণে গ্রেফতার হয়ে তিনি ৬ মাস জেল ভুগেন। মুক্ত হয়ে আবার কংগ্রেসের এবং বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটির সম্পাদক হন।

বাংলায় একটা নব-যুগের সূচনা হওয়ার উপক্রম হয়েছিল—দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বোস এবং হোসেন শহীদ সুহ্‌রাওয়ার্দীর মিলনে। সুহ্‌রাওয়ার্দী দেশে ফিরে এসে খেলাফৎ ও স্বরাজ আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। ১৯২১ সালের নির্বাচনে তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় ঢুকতে সক্ষম হয়েছিলেন। দেশবন্ধু সুহ্‌রাওয়ার্দীর ব্যক্তিত্বে ও গুণপনায় মুগ্ধ হয়েছিলেন। তাঁর সমর্থনপুষ্ট হয়ে সুহ্‌রাওয়ার্দী স্বরাজ্য পার্টির কোয়ালিশনে ডেপুটি লীডার এবং কলিকাতা কর্পোরেশনের ডেপুটি মেয়র নির্বাচিত হয়েছিলেন।

দেশবন্ধু হিন্দু মুসলিম ঐক্যের জন্য বাস্তব পন্থা গ্রহণ করেন। ঐ ঐক্যের কারণে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব এই সূত্র প্রকাশ করেন যে, যেহেতু ঈশ্বর সর্বশক্তিমান তিনি একই সঙ্গে নিরাকার ও সাকার হতে পারেন, নতুবা তিনি সর্বশক্তিমান হবেন কিরূপে। কিন্তু, নিরাকার একেশ্বরাবাদীরা ইহাতে আপত্তি করেন যে ঈশ্বর যেই সাকার রূপ ধারণ করেন তিনি আঞ্চলিক হয়ে পড়েন, তাঁর আর কোন বিশ্বভূমিকা থাকে না। দেশবন্ধু বাংলাদেশে ১৯২৩ সালের বেঙ্গল প্যাক্টে মুসলমানদের সংখ্যাধিক্য এবং আনুস্ত্রদিক প্রভাব মেনে নিলেন। এটা তিনি প্রাদেশিক কংগ্রেস কর্তৃক অনুমোদন করিয়েও নিলেন। ১৯২৪ সালের ২৩শে এপ্রিল সুভাষ সর্বসম্মতিক্রমে কর্পোরেশনের চীফ এক্সিকিউটিভ অফিসার নির্বাচিত হয়ে নূতন নীতিকে কার্যে রূপ দিতে লাগলেন। কিন্তু, পর বৎসরই ১৬ই জুন দার্জিলিং-এ হঠাৎ দেশবন্ধুর মৃত্যু হয়। এদিকে সরকার সুভাষকে অন্তরীণ করে রেখেছিলেন। কলিকাতা, বহরমপুর ও রেয়বনে তাঁকে অন্তরীণ রেখে ১৯২৭ সালের জুন মাসে মুক্তি দেওয়া হয়।

ইতিপূর্বেই ১৯২৩ সালে উত্তর বঙ্গের প্রবল বন্যার সময় সুভাষ জনগণের সেবার যে অত্যুজ্জ্বল আদর্শ স্থাপন করেছিলেন তা' দেশবাসীর মনে প্রবল রেখাপাত করেছিল। এখন তিনি যুব সমাজের সাথে সম্পূর্ণ রূপে এক হয়ে গিয়েছিলেন। তখন থেকেই তাঁর 'নেতাজী' আখ্যা।

এইবার তিনি গান্ধীর সাথে প্রকাশ্য প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হন। ১৯৩৮ সালে গান্ধীর সমর্থন ছাড়াই তিনি কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন এবং পর বৎসর উহার আবার পুনরুক্তি করেন। কিন্তু গান্ধী অসহযোগিতা করায় তিনি পদত্যাগ কর্তে বাধ্য হন। তবে তাঁর অনুসারীদের নিয়ে ফরোয়ার্ড ব্লক গঠন করে কংগ্রেসকে দুর্বল করে ফেলেন।

www.pathagar.com

ওদিকে দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধ শুরু হয়ে গিয়েছিল। সরকার ১৯৪০ সালে সুভাষকে গৃহ-বন্দী করেন, কিন্তু সুভাষ সুকৌশলে ভারত ত্যাগ করে কাবুল হয়ে বার্লিনে পৌঁছতে সমর্থ হন। এখানে হিট্‌লারের সাথে মিলিত হন এবং ভারতীয় যুদ্ধ বন্দীদের নিয়ে ফ্রী ইণ্ডিয়া লিজিয়ন গঠন করেন। নাৎসী বাহিনীর সাথে কাঁধ মিলিয়ে এরা বৃটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামে।

সৈন্য বাহিনী হলো। এবার সুভাষ গঠন কর্লেন আজাদ হিন্দ্ রেডিও। বার্লিন থেকে তিনি রেডিও ভাষণ দিতে লাগলেন সোজা ভারতবাসীর প্রতি ঃ আমি সুভাষ বলছি। সমগ্র পৃথিবী সচকিত হলো, বাঙ্গালী নেতাজীর কণ্ঠস্বর শুনে আবর যেন পুনরুজ্জীবিত হয়ে উঠল, নূতন উদ্যমে কোমর বাঁধল। শীঘ্রই সুভাষ ডুবোজাহাজে চড়ে এবং বিমানে উড়ে টোকিও এসে দেখা দিলেন। এতে তাঁর আঠার সপ্তাহ লেগেছিল। জাপানীরা ভারতীয় যুদ্ধ বন্দীদের নিয়ে একটা 'ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মী' গঠন করে দিয়েছিল। এখন সিঙ্গাপুর থেকে সুভাষ একটা 'স্বাধীন ভারতের অস্থায়ী' সরকার গঠন কর্লেন এবং সৈন্য বাহিনী নিয়ে দিল্লীর পথে কোহিমা পর্যন্ত অগ্রসর হলেন। এবার তাঁর প্রয়োজন হলো আবার টোকিও পৌঁছার। ১৯৪৫ সালের ১৮ই আগষ্ট তিনি বিমানে উঠলেন। কিন্তু, বিমানটি দুর্ঘটনায় পড়ে জ্বলে যায়। ফরমোসার একটা দ্বীপে ভয়ানক ভাবে দগ্ধ হয়ে সুভাষ প্রাণত্যাগ করেন।

রবীন্দ্রনাথ তাঁকে লক্ষ্য করে লিখেন ঃ সুভাষ চন্দ্র তোমার রাষ্ট্রিক সাধনার আরম্ভক্ষণে তোমাকে দূর থেকে দেখেছি। ...আজ তুমি যে আলোকে প্রকাশিত, তাতে সংশয়ের আবিলতা আর নেই, মধ্য দিনে তোমার পরিচয় সুস্পষ্ট। এই শক্তির কঠিন পরীক্ষা হয়েছে কারা দুঃখে, নির্বাসনে, দুঃসাধ্য রোগের আক্রমণে, কিছুতে তোমাকে আভিভূত করেনি; তোমার চিত্তকে করেছে প্রসারিত। তোমার দৃষ্টিকে নিয়ে গেছে দেশের সীমা অতিক্রম করে ইতিহাসের দূর বিস্তৃত ক্ষেত্রে। দুঃখকে তুমি করে তুলেছ সুযোগ, বিঘ্নকে করেছ সোপান। সে সম্ভব হয়েছে, যেহেতু কোন পরাভবকে তুমি একান্ত সত্য বলে মানোনি। তোমার চারিত্র শক্তিকেই বাংলাদেশের অন্তরের মধ্যে সঞ্চারিত করে দেবার প্রয়োজন সকলের চেয়ে গুরুতর।

www.pathagar.com

আমাদের কুটির শিল্প ঃ ঢাকায় মসলিন ও মল্‌মল্‌

কুটির শিল্প বাংলাদেশের বিশেষ উপযোগী। কেননা, বাংলাদেশের লোক বেশী, লোক বৃদ্ধির হারও অত্যাধিক।

এই প্রসঙ্গে স্মরণে পড়ে আমাদের একটা কুটির শিল্প ঢাকাই মসলিন জগদ্বিখ্যাত ছিল।

বিশাল নদী মেঘনা। প্রতি বছর বর্ষাকালে যে কি প্লাবন তার! দুই কূল তিন মাস ডুবে থাকতো এই প্লাবনের নীচে। ফলে এই জমিতে মেঘনার পলি পড়তো। এই পলিতে থাকতো বালি, নরম সুন্দর মাটি, লবণাক্ততা ও অন্যান্য খনিজ সার। এই পলি জমিকে অসম্ভব রকম উর্বর করে তুলতো। এই জমিতে উৎপন্ন হতো পৃথিবীর সবচেয়ে উন্নত মানের তুলো।

এলাকাটি ছিল ঢাকা শহরের বারো মাইল দক্ষিণ-পূর্বে ফিরিঙ্গীবাজার থেকে শুরু করে প্রমত্তা মেঘনা নদীর তীর বরাবর ঢাকার বারো মাইল উত্তরে ইদিলপুর পর্যন্ত দীর্ঘ প্রায় ৪০ মাইল। এর মধ্যে তুলোর জন্য বিশেষ বিখ্যাত হলো কেদারপুর, বিক্রমপুর, রাজেন্দ্রপুর, কার্তিকপুর, শ্রীরামপুর ও ইদিলপুর। উৎকৃষ্ট তুলোর আরও কয়েকটি এলাকা ছিল। একটা ধলেশ্বরী নদী থেকে শীতলক্ষ্যা নদীর উপকূল বরাবর উপরে রূপগঞ্জ পর্যন্ত দীর্ঘ প্রায় ৬০ মাইল। অন্য একটি ধলেশ্বরী নদীর উত্তরে ব্রহ্মপুত্র নদের উপকূলবর্তী বেশ কয়েক মাইল।

জনৈক বিশেষজ্ঞ জন টেইলর বলেন ঃ ঢাকার তুলোই ছিল পৃথিবীতে সর্বশ্রেষ্ঠ। এই তুলো পেঁজে সূতো কাটতো ঢাকার তাঁতীরা। এরা পুরুষানুক্রমে অভিজ্ঞতার ফলে উৎকৃষ্টের চরম পর্যায়ে পৌছে গিয়েছিল। তাদের কাটা সূতো হতো অন্য যে কোন সূতোর তুলনায় অধিকতর সূক্ষ্ম, কিন্তু প্রধান তন্তু অধিকতর মোটা, অথচ মোটা তন্তুর সংখ্যা অনেক কম। ঢাকার বিশেষতঃ সোনার গাঁ, জঙ্গলবাড়ি, ধামরাই, তিতাবাদী ও বাজিতপুর অঞ্চলের তাঁতীরা অসাধারণ নৈপুণ্য অর্জন করেছিল। সোনার গাঁর তাঁতীরা ছিল বেশীর ভাগই মুসলমান। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কুঠিতে একমাত্র সোনার গাঁরই ১৩/১৪ শত তাঁতী তালিকাভুক্ত ছিল। জঙ্গলবাড়ির লোকদের প্রধান জীবিকাই ছিল বস্ত্র বয়ন। ধামরাই ছিল

www.pathagar.com

হিন্দু তাঁতীদের বসতি, উৎকৃষ্ট সূক্ষ্ম সূতা কাটার জন্য এদের খুব নাম ছিল।

তিতাবাদী কাপাসিয়া থানার অন্তর্গত, লক্ষ্যানদীর পূর্ব তীরে অবস্থিত একটি গ্রাম। এখানে বনেদী তাঁতীদের বাস ছিল। আবার উৎকৃষ্ট ফুটি তুলোও জন্মাত। বাজিতপুর তাঁতী ও তুলো উভয়ের জন্যই প্রসিদ্ধ ছিল।

তাঁত নির্মিত হতো অত্যন্ত সাধারণভাবে। দেশজ কাঠ, বাঁশ এবং ছোট এক টুকরো লৌহ তার জন্যে যথেষ্ট ছিল। বহু ক্ষেত্রে তাঁতী নিজেই ছুতার মিস্ত্রীর কাজ করে নিজের তাঁত তৈরী করে নিত। তার ব্যবসা চালাবার জন্যে কিছু তাকে বাহির হতে আমদানী কর্তে হতো না।

তাঁতীর কোন দালান-কোঠার প্রয়োজন হতোনা। কারণ, বছরের অর্ধেক কাল সে খোলা আঙ্গিনাতেই কাজ চালাতে পার্তো। আর প্রয়োজন হলে নিজের বাসস্থানে।

সতর শতকের মাঝামাঝি ওলন্দাজ, ইংরেজ ও ফরাজী কোম্পানী ঢাকা শহরে বাণিজ্য কুঠি স্থাপন কর্লে মসলিনের রফতানী বাণিজ্যে নূতন যুগের সূচনা হয়।

কিন্তু, যে কারণে আরব নৌ প্রাধান্যের অবসান হয়েছিল, সে কারণে মসলিন ব্যবসায়েও মন্দা লেগে যায়। তা' হলো ১৭৬৯ সালে জেম্‌স্ ওয়াট কর্তৃক ষ্টীম ইঞ্জিন আবিষ্কার যার ফলে ইউরোপে শিল্প-বিপ্লব উপস্থিত হয়। কলের ব্যবহার মানুষের খাটুনী ও কারিগরিকে অপ্রয়োজনীয় করে তোলে। তবুও ১৮৫১ সালের বিখ্যাত লণ্ডন প্রদর্শনীতে ঢাকাই মসলিন সর্বোৎকৃষ্ট বিবেচিত হয়।

তবে বস্ত্র-শিল্পের গুরুত্ব চলে যায় বিলাতে। দামের এবং পরিমাণের দিক দিয়ে কলের কাপড়ের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া আমাদের তাঁতীদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে ওঠে। তদুপরি বাংলাদেশে কোম্পানীর শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। তারা মসলিন ব্যবসায়ে দাদন বা অগ্রিম আংশিক মূল্য দেয়া এবং নিজেদের গোমস্তার মাধ্যমে চুক্তির মসলিন আদায় করার নীতি প্রবর্তন করে। দুটো মিলে তাঁতীদের উপর এমন উৎপীড়ন চলতে থাকে যে বহু তাঁতী নিজের বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যায় এবং জনশ্রুতি এই যে অনেকে গোমস্তার হাত থেকে বাঁচবার জন্যে হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি কেটে ফেলে।

যা' মোগল বাদশাহের আমলে মলবুস খাস নামে পরিচিত ছিল মোগল সূর্য অস্ত গেলে তারই নাম হয় মল্‌মল্।

www.pathagar.com

জাতীয় আদর্শ নিষ্ঠা

তিনটি মূল সম্পাদ্য থেকে জাতীয় আদর্শ রূপ লাভ করে ঃ

১) জাতির প্রত্যেকে পরস্পরকে ভালবাসবে।

২) জাতির প্রত্যেকে নিজের হাত-পা, চোখ-কান দিয়ে কাজ করে যাবে।

৩) জাতি মানুষের পুঞ্জীভূত অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে তার লক্ষ্য পথে অগ্রসর হবে।

জাতির কোন না কোন মানুষ, কোন না কোন অংশ বিকারগ্রস্ত হয়ে পড়ে। তবুও তার প্রতি আমাদের প্রেমের দৃষ্টি রাখতে হবে। এই নীতি অনুসরণ করে কোন কোন দেশে সামাজিক অপরাধ সম্বন্ধে প্রশাসনিক দৃষ্টি ভঙ্গিতে মৌলিক পরিবর্তন ঘটেছে। তাঁরা এখন বলছেন দোষীকে শাস্তি দেয়া যথেষ্ট নয়। প্রশাসনের উদ্দেশ্য হবে ঃ তার সংশোধন। অর্থাৎ অপরাধ নিবারণ পদ্ধতিতে জবরদস্তির পরিবর্তে প্রেমের সঞ্চার কর্তে হবে। তাঁরা দেখতে পাচ্ছেন যে, ব্যক্তি যে অপরাধ করে তার জন্যে এক ভাবে না এক ভাবে সামাজিক অবস্থাও দায়ী। সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন না ঘটিয়ে শুধু অপরাধীকে শাস্তি দিয়ে উন্নততর জাতি গঠন সম্ভব নয়। এটা জানবার পর দেখা যাচ্ছে যে আমাদের আরও অনেক বেশী কাজ কর্তে হবে এবং সেটা কর্তে হবে মানুষের পুঞ্জীভূত অভিজ্ঞতার আলোকে।

নিজের হাত-পা-চোখ-কান দিয়ে কাজ করার ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে সূয়েজ খালের এপাড়ে ওপাড়ে অবস্থার মধ্যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। এ পাড়ে ব্যক্তি নিজের গণ্ডীর উর্ধ্বে ওঠার জন্য কোন উচ্চাকাঙ্ক্ষা বোধ করে না। যেটা জুটে গেছে সেটা নিয়েই সে সন্তুষ্ট এবং ফাঁকি দেওয়াকে সে নিজের ব্যক্তিগত লাভ গণ্য করে। ফলে আমাদের সময়—আর যেহেতু সময় মানেই জীবন—সুতরাং আমাদের জীবন যা' উৎপন্ন করে সেটা প্রথমতঃ পর্যাপ্ত নয়, দ্বিতীয়ত ঃ মূল্য মান হিসাবে সেটা নিকৃষ্ট।

সূয়েজের ওপাড়ে ব্যক্তির উচ্চাকাঙ্ক্ষার সীমা নেই। খনির মজুর আশা করে যে একদিন সে দেশের প্রধান মন্ত্রী হবে। সুতরাং এক দিকে সে যেমন একটা কাজ ধরে আটকে থাকতে চায় না তদ্রূপ তার কর্মসূচীতে ফাঁকি বলে কোন কথা নেই। সে অল্প সময়ে বেশী কাজ করতে চায় এবং কর্মপদ্ধতিতে এমন উন্নতি আবিস্কার করতে চায় যেটা

www.pathagar.com

তাকে খ্যাতি ও সাফল্যের পথে নিয়ে যাবে। নতুবা সে প্রধান মন্ত্রী হবে কি করে ?

মানুষের পুঞ্জীভূত অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রেও আমাদের চিরন্তনী ধারায় ও মানুষের আধুনিক অভিজ্ঞতায় অনেক তফাৎ। আখেরাৎ বা পারলৌকিক জীবন ভাল করার জন্যে আমাদের একটা লোলুপতা আছে। এর ফলে এক দল লোক নেমে গিয়েছে ভিখারীর পেশায়। এরা যেমন তারস্বরে পয়সার বদলে ঝরঝরে আখেরাতের নিশ্চয়তা ঘোষণা কর্তে থাকে তেমনি দেশের অগণিত লোক একটা পয়সার বিনিময়ে আখেরাতে বেহেস্ত কেনার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ে। ফল এই হয়েছে যে যদিও আমাদের মাটি অত্যন্ত উর্বর আমরা তার পুরোমাত্রায় সদ্ব্যবহার কর্তে পারিনে অথচ বহু বেকার লোককে আমাদের খেতে পরতে দিতে হয়। ভিখারীরা দেশে যে শুধু আলস্য ও অকর্মণ্যতা ছড়ায় তা' নয়, দেখা গেছে যে তারা নানারূপ অপকর্ম এবং যৌনব্যাধির উৎস। তাদের মধ্যে বংশ বৃদ্ধির হিড়িক উল্লেখযোগ্য ভাবেই বেশী।

কিন্তু বহু দেশে আধুনিক অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগানো হয়েছে, আইন করে ভিক্ষাবৃত্তি তুলে দেওয়া হয়েছে। সৌদি আরব একটা মাঝামাঝি ব্যবস্থা অবলম্বন করেছে। সেখানে এক জায়গায় বসে ভিক্ষে করার অনুমতি আছে। কিন্তু, দাঁড়িয়ে বা চলমান অবস্থায় কাউকেও ভিক্ষে কর্তে দেওয়া হয় না। এরূপ চেষ্টা কর্লেই পুলিশ সে ব্যক্তিকে ভীষণ প্রহারে জর্জ্জরিত কর্তে থাকে। এই উপায়ে হজ্বের সময় যখন লক্ষ লক্ষ তীর্থযাত্রীর সমাগম হয় তাদের ভিখিরীর আক্রমণ থেকে রক্ষা করা হয়।

জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে জনকল্যাণ প্রতিষ্ঠান সমূহের ভূমিকা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এর মধ্যে আবার সমবায়ের স্থান অত্যন্ত উঁচুতে। এই ক্ষেত্রে আমাদের প্রচেষ্টা অত্যন্ত ক্ষীণ এবং ক্রমিক উন্নতির কোন পরিচয় বহন করে না। অবশ্য ব্যক্তির জীবন যেমন জাতীয় জীবনকেও তেমন কতগুলি পরস্পর নিরপেক্ষ খণ্ডে বিভক্ত করা যায় না। জাতীয় জীবনের সব খণ্ডকে একই উদ্দেশ্যে প্রণোদিত করে একই লক্ষ্যে চালিয়ে নেওয়ার উপায় হলো দেশের সকল লোককে পড়তে লিখতে অভিজ্ঞ করে তোলা—যাকে আমরা বলি সাক্ষরতা আন্দোলন। এই আন্দোলন যে কত দরকারি এবং কত বিরাট সে সম্বন্ধে আমাদের জাতীয় ধারণা এখনও সুস্পষ্ট হয়ে উঠেনি। যদি এই একটা কাজে আমরা সাফল্য লাভ করতে পারি, জাতীয় লক্ষ্যে আমরা অনেকখানি অগ্রসর হয়ে যাবো।

www.pathagar.com

স্পিরিট ও ফর্ম

ধর্মের যখন প্রবর্তন হয় তখন তার চেহারা থাকে একটা শস্যদানার ন্যায়। তার সবটুকুই থাকে সার, তাতে অসার বা বাহুল্য কিছুই থাকেনা। কিন্তু, ধর্ম প্রবর্তকের অভাব ঘটা মাত্রই স্থান ও কাল, পাত্র ও উদ্দেশ্যের বিভিন্নতা হেতু এই দানার চার দিকে অনেক কিছু জমতে থাকে এবং কালক্রমে তারই একটা আস্তরণের মাঝে দানাটি অদৃশ্য হয়ে যায়।

আমরা দানাটিকে বলতে পারি 'স্পিরিট' বা ভাব, আর আস্তরণকে বলতে পারি 'ফর্ম' বা মূর্তি। এই স্পিরিট ও ফর্মের দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে ধর্ম টিকে থাকে এবং অগ্রসর হতে থাকে। একদল লোক চিন্তাবিদ ও ধর্মীয় নেতা রব তোলে ঃ চলো 'স্পিরিট'-এ ফিরে যাই। তখন শুরু হয় ইযতেহাদ—ঐ সার বস্তু শস্যদানাকে নূতন করে আবিষ্কার। কিন্তু, ইতিমধ্যে বাকী বেশীর ভাগ লোক তারা সংসারী ও সাধারণ—অধৈর্য হয়ে ওঠে। তারা রব তোলে ঃ অত সূক্ষ্ম তত্ত্ব আমরা বুঝতে পারিনে। আমাদের একটা কবর দেখিয়ে দাও যেটা সালাম কর্লেই আমরা উপকার পেয়ে যাব। একবার স্পিরিট-এর দিকে, আবার ফর্ম-এর দিকে ধর্মের কাঁটা ঘড়ির দোলকের ন্যায় দুলতে থাকে এবং তার মধ্য দিয়েই পথ চলতে থাকে।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে আরবে মুহম্মদ ইব্নে আবদুল ওহাব এবং ভারতে শাহ্ অলীউল্লাহ এই 'চলো স্পিরিটে—অর্থাৎ কোরান ও হাদীসে ফিরে যাই' আন্দোলন শুরু করেছিলেন। উভয়েরই জন্ম ১৭০৩ খৃষ্টাব্দে। প্রথম জন ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে, দ্বিতীয় জন ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে লোকান্তরিত হন।

শাহ্ অলীউল্লাহ দিল্লীর এক প্রসিদ্ধ আলেম বংশে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর পূর্ববর্তী শেখ আবদুল হক মুহাদ্দেস এবং শাহ্ অলীউল্লার নিজের পুত্র শাহ্ আবদুল আজীজও বিখ্যাত সাধক এবং শিক্ষক ছিলেন।

এই শাহ্ আবদুল আজীজের নিকট এক সঙ্গে শিক্ষা লাভ করেন শাহ্ অলীউল্লার এক পৌত্র শাহ্ ইসমাইল এবং সৈয়দ আহমদ। উভয়ে ছিলেন সমবয়সী। শাহ্ ইসমাইল ১৭৮২/৮৩ খৃষ্টাব্দে এবং সৈয়দ আহমদ ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। উভয়ে এক

www.pathagar.com

সঙ্গে হজ্ব করেছিলেন ১৮২২-২৩ খৃষ্টাব্দে এবং শিখদের রিদ্ধে জেহাদ বা ধর্মযুদ্ধ করে একই সময়ে শহীদ হন ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে।

আমাদের প্রতিরোধ-সংগ্রামে এক অনন্যসম্মানিত নাম হচ্ছে সৈয়দ আহমদ শহীদ। তাঁর মনে কোন সন্দেহ ছিলনা যে বিধর্মীর অধিকার ভারতকে 'দারুল হরব'-এ পরিণত করেছে এবং আমাদের ধর্মীয় কর্তব্য দাঁড়িয়ে গিয়েছে হয় যুদ্ধ করে বিধর্মীকে তাড়ানো, নতুবা এদেশ ত্যাগ করে চলে যাওয়া।

বঙ্গদেশের ২৪ পরগনার বাদুরিয়া গ্রামে জন্ম হয়েছিল মীর নেসার আলীর, ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে। তিনি তিতুমীর ডাক-নামে সুপরিচিত হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর সমসাময়িক ছিলেন শরীয়তুল্লা। তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন মাদারীপুর মহকুমার শামাইল গ্রামে ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে।

এই সময় দেশের অবস্থা এই দাঁড়িয়েছিল যে প্রাক-বৃটিশ যুগের সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় বিরাট এক পরিবর্তন ঘটে গিয়েছিল। এতে বাংলার চাষীরা যারা চাষের মৌসুম চলে গেলে বৎসরের বাকী অংশটুকু বিখ্যাত মসলিন বস্ত্র তৈরী করে কাটিয়ে দিত— বিশেষ সঙ্কটের সম্মুখীন হয়েছিল। তাদের স্বার্থ দেখার কেউ ছিল না। পুরাতন বনেদী ঘরগুলি প্রায় উচ্ছেদ হয়ে গিয়েছিল। তাঁদের স্থান গ্রহণ করছিল ইংরেজ প্রভুদের এক শ্রেণীর দালাল যারা প্রধানতঃ ছিল ব্যবসায়ী এবং নানা ফন্দীতে এমন কি লোককে বেঁধে রেখে এবং মারধোর করেও কিছু বেশী অর্থ আদায় করাই ছিল যাদের লক্ষ্য। এদের কেউ কেউ জমিদারী অর্জন করে বসেছিল। এরা কোম্পানীর পণ্য বেশী দামে কিনে নিতে এবং নিজেদের পণ্য সস্তায় বিক্রী করে দিতে লোককে বাধ্য কর্তো।

১৭৯৫ খৃষ্টাব্দের দিকে নীলের ব্যবসা খুব লাভজনক হয়ে উঠে এবং নীলের চাষ বাড়াবার উদ্দেশ্যে ব্যবসায়ীরা বাংলাদেশের ঢাকা, ফরিদপুর, যশোর, রাজশাহী, নদীয়া এবং মুর্শিদাবাদ জেলায় বহু কুঠি স্থাপন করে। এরা চাষীদের আগাম মূল্য নিতে বাধ্য কর্তো এবং এই মূল্য এমন নাম মাত্র হতো যে চাষীরা কিছুতেই নির্দিষ্ট পরিমাণ নীল আদায় দিতে পার্তোনা। ফলে তাদের উপর নানারূপ অত্যাচার চালানো হতো। পঞ্চাশ বৎসর কুঠিয়ালেরা নীলের এই নাম মাত্র মূল্য বজায় রাখে; অথচ ইতিমধ্যে ধানের দাম প্রায় সাত গুণ বৃদ্ধি পেয়েছিল, নীল চাষ না করে ধানের চাষ করতে পারলে চাষীরা সহজেই বেশী পরিমাণ লাভবান হতো।

বঙ্গদেশে হাজী শরীয়তুল্লাহ স্থির করেন যে এই পরিস্থিতি থেকে বাঁচবার একমাত্র উপায় হলো ঃ ইসলামের স্পিরিট-এ অর্থাৎ কোরান ও হাদিসে ফিরে যাওয়া এবং তাকে ঘিরে যে সমস্ত কুসংস্কার ও কুপ্রথা জমে গিয়েছে সেগুলো সম্পূর্ণ রূপে বর্জন করা। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে তিনি তাঁর এ আন্দোলন প্রবর্তন করেন এবং চাষীগণের মধ্যে ওটা এক অভূতপূর্ব সাড়া জাগিয়ে তোলে। তিনি ব্যবস্থা দেন যে যতদিন মুসলিম প্রশাসন প্রতিষ্ঠিত না হচ্ছে ততদিন দেশে 'জুমা' এবং ঈদের নামাজ আদায় করা যায়েজ হবেনা। এই ব্যবস্থা থেকে তাঁর আন্দোলন ফরায়েযী আন্দোলন নাম গ্রহণ করে।

সৈয়দ আহমদ শহীদ ১৮২০ সালে একবার এবং ১৮২২ সালে দ্বিতীয় বার কলিকাতায়

www.pathagar.com

প্রচার উপলক্ষে আসেন। জনসাধারণ এত বিপুল সংখ্যায় তাঁর নিকট 'বায়াৎ' বা দীক্ষা গ্রহণ করতে আসে যে সকলের সঙ্গে হাত মিলান তাঁর পক্ষে সম্ভব হলোনা। তিনি মাথার পাগ্‌ড়ি খুলে বাড়িয়ে দিলেন এবং ব্যবস্থা দিলেন যে তাঁর পাগ্‌ড়ি ছুঁলেই দীক্ষা হয়ে যাবে। দ্বিতীয় বার তিনি কলিকাতায় মাত্র তিন মাস থাকেন এবং এখান থেকেই মক্কা শরীফ গমন করেন। মক্কাতেই তিতুমীর তাঁর দর্শন লাভ করেন এবং তাঁর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। তখন তিতুমীরের বয়স ৪০ বছর। তিনি দৈহিক চর্চায় অসামান্য সাফল্য অর্জন করেছিলেন। প্রতিপক্ষের কোন কোন লেখায় তাঁকে বিখ্যাত লাঠিয়াল রূপে উল্লেখ করা হয়েছে।

তিতুমীর ১৮২৭ সালে মক্কা থেকে দেশে ফিরে আসেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই 'কোরান ও হাদিসে ফিরে চলো' বিশুদ্ধ ইসলাম ধর্ম প্রচার শুরু করে দেন। হাজী শরীয়তুল্লাহর মধ্যে পূর্ববঙ্গের চাষী সমাজ তাদের নেতা খুঁজে পেয়েছিল। এখন পশ্চিম ও উত্তর বঙ্গের ২৪ পরগনা, যশোর, মালদহ এবং দিনাজপুরের চাষী সমাজ তিতুমীরকে এক বাক্যে নেতা মেনে নিলো। তিতুমীরের জীবন চরিতকার বিহারী লাল সরকারের মতে তিনি পীর পূজা নিষেধ করেছিলেন; বিবাহ ও জন্ম মৃত্যু উপলক্ষে বহু সংস্কারকে অনৈসলামিক ঘোষণা করেছিলেন এবং তাজিয়া উৎসব ও সর্বপ্রকার ফাতেহা বর্জন করতে উপদেশ দেন।

দাড়ি রাখা এবং কাছা না দিয়ে ধুতি অর্থাৎ তহ্‌বন্ধ পরা তাঁর অনুসারীদের প্রধান লক্ষণ হয়ে উঠে।

তিতুমীরের অনুসারীদের মধ্যে সাম্য ও ঐক্য দেখে জমিদারেরা এবং নীলকুঠির মালিকগণ শঙ্কিত হয়ে উঠে। আর তিনি বিশুদ্ধ ইসলাম প্রচার করাতেও কতক কুসংস্কারাচ্ছন্ন মুসলমান তাঁর বিরোধী হয়ে উঠে। তারা গিয়েও জমিদারগণের নিকট নালিশ করে। এতে তিন জন জমিদার তাঁকে দমন করতে ঐক্যবদ্ধ হয়। এরা হলো ঃ তারাগোনিয়ার রাম নারায়ণ, নাগরপুরের গৌর প্রসাদ চৌধুরী ও পুরওয়ার কৃষ্ণ দেব রায়। তাদের প্রথম কাজ হলো দাড়ির উপর ট্যাক্স বসান, বৎসরে আড়াই টাকা। তখনকার দিনে আড়াই টাকা খুব বেশী অর্থ ছিল। পুরওয়ায় এই ট্যাক্স সত্যিই আদায় করা হয়। কিন্তু, সফদরপুরে জমিদারদের পাইকেরা প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়। চাষীরা বলে যে জমিদারের এই ধরনের ট্যাক্স বসানোর ক্ষমতা নেই। এর প্রতিশোধ নিতে গিয়ে পুরওয়ার জমিদার বিশাল এক লাঠিয়াল বাহিনী নিয়ে ১৮৩০ সালে সফদরপুর আক্রমণ করে। এরা লুট-পাট চালায়, কয়েকখানি বাড়ি ও একখানি মসজিদ জ্বালিয়ে দেয়। গ্রামবাসীরা পুলিশের সাহায্য প্রার্থনা করে। তাতে ব্যর্থ হয়ে আদালতে মোকদ্দমা দায়ের করে।

কিন্তু, তখন জমিদার ও নীলকর জুটির বিরুদ্ধে আদালতে প্রতিকার পাওয়া সম্ভব ছিলনা।

নদীয়া জেলায় এক নীলকর (হোয়াইট), শেখ মুনসেফ নামে এক চাষীকে মারতে মারতে মেরে ফেলে। তাকে বিচারের জন্যে হাইকোর্টের দায়রায় সোপর্দ করা হয়। দুই দিন পর সাক্ষ্য প্রমাণ গ্রহণ করার পর জাষ্টিস পন্টিফেক্স্ জুরীদিগকে চার্জ বুঝিয়ে দিতে গিয়ে বলেন ঃ সাক্ষ্য প্রমাণ নেই এই কথা আমি বলতে পার্বোনা, তাবে আপনারা কি ভাবছেন সেইটেই আসল কথা। তখন জুরীদের মুখপাত্র বলে উঠেন ঃ আমরা আগেই মন

www.pathagar.com

স্থির করে ফেলেছি। আসামী নির্দোষ, আমরা তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য বিশ্বাস করি না। জজ তখন বলেন ঃ আমিও আপনাদের সঙ্গে একমত। আসামী খালাস।

এটা অবশ্য আরও পরের ঘটনা। ১৮৭৮ সালের ৮ই জুলাই বিচারের নামে এই প্রহসন অনুষ্ঠিত হয়।

আদালতে ব্যর্থ হয়ে ১৮৩১ সালে চাষীরা একযোগে অভ্যুত্থান করে পুরওয়ার বাজারে ঢুকে পড়ে এবং সেখানে অনাচার চালায়।

এর পর জমিদারেরা ও নীলকরেরা একজোট হয়ে যায়। তখন উভয় পক্ষে বড় বড় সংঘর্ষ বাধতে থাকে। কিন্তু প্রতি ক্ষেত্রেই তিতুমীরের দল জয়লাভ করে। তিতুমীর তাঁর অনুসারীদের রীতিমত লাঠিখেলা শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন এবং ইতোমধ্যে নারিকেল বেরিয়ায় এক বাঁশের কেল্লা তৈয়ার করিয়েছিলেন।

লাঠি যুদ্ধে মুকাবিলা কর্তে না পেরে জমিদার নীলকর জুটি ইংরেজ প্রশাসনিক কর্মচারীদের সাহায্যে সরকারের নিকট তিতুমীরকে রাজদ্রোহী রূপে খাড়া করে। এতে গভর্নর-জেনারেল লর্ড বেন্টিঙ্ক তিতুমীরের বিরুদ্ধে কলিকাতা থেকে এক কর্নেলের অধীন এক সেনা বাহিনী প্রেরণ করেন।

কর্নেল ১৮৩১ সালের ১৯শে নভেম্বর নারিকেল বেরিয়ায় পৌছে বাঁশের দুর্গের উপর কামান দাগতে থাকেন। গোলার আঘাতে তিতুমীর শহীদ হন।

"আল্লার পথে যাঁরা প্রাণ দিলেন তাঁদের মৃত বলোনা। তাঁরা চিরঞ্জীব যদিও তোমরা দেখতে পাওনা।"

www.pathagar.com

বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজদ্দৌলা

স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশে আজ নবাব সিরাজদ্দৌলার স্মরণী। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের ২রা জুলাই অর্থাৎ এখন থেকে ঠিক ২১৮ বৎসর পূর্বে বুদ্ধিজীবী ষড়যন্ত্রের ফলে তিনি প্রাণ হারান। সঙ্গে সঙ্গে বাংলার স্বাধীনতা সূর্য অস্তমিত হয়, জাতির ভাগ্যাকাশ অন্ধকারে ডুবে যায়। ২১৪ বৎসর ব্যাপী সুদীর্ঘ অমানিশার পর ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বাঙ্গালীর ভাগ্যাকাশে আবার সে স্বাধীনতা সূর্যের উদয় হয়েছে।

নবাব সিরাজদ্দৌলাকে সত্যকার ভাবে বলা যায় ইতিহাসের বলি।

এক কালে প্রাচ্যের ভারতবর্ষ ছিল সমুদ্রের অধিপতি। ভারতের উপকূল থেকে ইন্দোনেশিয়া পর্যন্ত তার বহু স্বাক্ষর এখনও ছড়িয়ে আছে। কিন্তু, 'যোগ্যতমের উদ্বর্তন' নীতিতে এই আধিপত্য ক্রমে পশ্চিম দিকে সরতে থাকে—ভারতের পর আরব, আরবের পর পর্তুগাল স্পেন।

কিন্তু, এত দিন এই আধিপত্যের মূল ছিল পাল ও হাওয়া এবং উহাদের নিয়ন্ত্রণে নাবিকের দক্ষতা।

ভারতের গত পাঁচ শত বৎসরের ইতিহাসে প্রশাসক চরিত্রে সম্রাট আকবর ছিলেন সর্বাপেক্ষা মহান। আকবরের সমুদ্র দর্শনের সুযোগ হয়েছিল একবার যখন রাজকার্যে তিনি সুরাটে এসেছিলেন।

আকবর ছিলেন স্থল শক্তি। ঐতিহাসিকগণ পরম বিস্ময়ে প্রশ্ন করেছেন ঃ তিনি কি বুঝতে পেরেছিলেন সমুদ্র ভারতের তথা পৃথিবীর ইতিহাসে কি যুগান্তকারী পরিবর্তন এনে দেবে !

নবাব সিরাজদ্দৌলার চরম দুর্ভাগ্য হলো তিনি এমন এক শক্তির সঙ্গে বিরোধে জড়িত হয়েছিলেন যার ভবিতব্য ছিল সমুদ্র শক্তিতে ষ্টীম ইঞ্জিন আবিষ্কার করে পালের জাহাজকে অচল করে দিয়ে বিরাট এক বিপ্লবের সূচনা এবং নিজে শ্রেষ্ঠতম নৌশক্তি হয়ে দীর্ঘকাল অর্ধেকেরও বেশী পৃথিবীকে শাসন।

১৭৫৬ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে সিরাজদ্দৌলা সিংহাসন লাভ করেন। তার পূর্বেই

www.pathagar.com

ইংরেজ শক্তি বঙ্গদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। হুগলী বন্দর তাদের জাহাজের নিকট উন্মুক্ত হয়ে পড়েছিল। কাসিমবাজার, হুগলী, ঢাকা ও মালদহে তারা কুঠি স্থাপন করেছিল, কলিকাতা শহর স্থাপন করে ওখানে 'ফোর্ট উইলিয়াম' দুর্গ নির্মাণ করেছিল।

সিরাজের বয়স তখন মাত্র তেইশ বৎসর। রাজত্বের সর্বস্তরে আত্ম-পরায়ণ ব্যক্তিরা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থেকে নিজেদের দুর্দমনীয় লোভ চরিতার্থ করার জন্যে প্রহর গুণছে। এদের না ছিল দেশপ্রেম, না ছিল রাজানুগত্য। এমন কি তাঁর আত্মীয়-স্বজনেরাও এর ব্যতিক্রম ছিলনা। এর মধ্যে ছিলেন নবাবের প্রধান সেনাপতি মীর জাফর, নবাবের আপন খালা ঘসেটি বেগম, নবাবের কোষাধ্যক্ষ জগৎ শেঠ, দেওয়ান রায় দুর্লভ, ঘসেটির দেওয়ান রাজ বল্লভ, জগৎ শেঠের ভ্রাতা স্বরূপ চাঁদ, কলিকাতার এক প্রধান বণিক উমি চাঁদ।

তাঁর রাজত্বকাল ছিল মাত্র এক বৎসর আড়াই মাস। কিন্তু, কত ঘটনা পূর্ণ এই স্বল্প সময়! প্রথমতঃ ইংরেজদের কাশিমবাজার কুঠি অধিকার, দ্বিতীয়তঃ তাদের কলিকাতা দুর্গ আক্রমণ ও অধিকার, তৃতীয়তঃ বিহারে তাঁর খালাত ভাই শওকৎজঙ্গ বিদ্রোহী হলে মনিহারীর যুদ্ধে তার পরাজয় ও নিধন, চতুর্থতঃ ইংরেজদের সঙ্গে সন্ধি।

কিন্তু, সিরাজকে ধ্বংস কর্বার ষড়যন্ত্র এরূপ পেকে উঠেছিল যে ইংরেজ-শক্তিও গোপনে এদের সাথে হাত মিলিয়েছিল। কোষাধ্যক্ষ জগৎ শেঠ এরূপ শক্তিশালী ছিলেন যে শেষ পর্যন্ত নবাবীর দাবীদার দাঁড়ায় সেনাপতি মীর জাফর এবং জগৎ শেঠের দেহরক্ষী দলের অধিনায়ক লুৎফ ইয়ার খান। কিন্তু জগৎ শেঠ মীর জাফরের পক্ষে মত প্রকাশ কর্লে ইংরেজ সেনাপতি ক্লাইভও সেটা মেনে নেন।

ষড়যন্ত্রের সংবাদ নবাব পূর্বেই পেয়েছিলেন। তাই ২রা ফেব্রুয়ারী আলীনগরের সন্ধি দ্বারা ইংরেজদের সঙ্গে একটা মিটমাট করে ফেলেছিলেন। কিন্তু, তিনি তখন এমন অবস্থায় পড়েছিলেন যে কে শত্রু কে মিত্র তাঁর পক্ষে নির্ণয় করা সম্ভব ছিলনা। রাজা জানকী রামকে বিহারে তিনি তাঁর প্রতিনিধি নিযুক্ত করেছিলেন। কলিকাতায় নিযুক্ত করেছিলেন মানিক চাঁদকে। কিন্তু মানিক চাঁদ বজ্‌বজে ইংরেজদের সঙ্গে একটা ক্ষুদ্র সংঘর্ষের পরই পালিয়ে এসেছিল। বণিক প্রধান উমি চাঁদকে তিনি বিশ্বাস কর্তেন। কিন্তু সে গোপনে ষড়যন্ত্রকারীদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল। শুধু তাই নয়, বাঙ্গালী ব্যবসায়ীরা কলিকাতায় থেকে ফল্‌তায় অবস্থিত ইংরেজদের সর্বপ্রকারে সাহায্য কচ্ছিল।

এই অবস্থায় সিরাজ চেষ্টা কর্লেন ঃ ষড়যন্ত্রকারীদের প্রধান বল ও ভরসা সেনাপতি মীর জাফরকে বাংলার স্বাধীনতা ও সার্বভৌমতার নামে অনুযোগ করে কর্তব্য ও আনুগত্যের পথে ফেরাতে। নবাব গোপনে তাঁর নিকট উপস্থিত হলেন এবং স্বাধীনতা ও ক্ষমতার প্রতীক স্বরূপ তাঁর উষ্ণীষ মীর জাফরের পায়ে স্থাপন করে বল্লেন ঃ আপনি আমার নিকট আত্মীয়, এই উষ্ণীষের মর্যাদা ও সম্মান আপনাকে রক্ষা কর্তে হবে। মীর জাফর অবশ্যই তাঁকে আশ্বাস দিয়ে বলেছিলেন ঃ তথাস্তু।

যুদ্ধ করা ছাড়া নবাবের কোন উপায় ছিলনা। নিয়তিই তাঁকে সসৈন্য নিয়ে গিয়েছিল পলাশীর প্রান্তরে ২৩শে জুন বৃহস্পতিবার। যুদ্ধ যখন শুরু হল দেখা গেল মীর জাফর ও

www.pathagar.com

রায় দুর্লভের বাহিনী নিষ্ক্রিয় দাঁড়িয়ে থাকল। একমাত্র তরুণ সেনাপতি মীর মদনই তাঁর বাহিনী নিয়ে প্রাণপণ যুদ্ধ কর্তে লাগলেন।

কিন্তু, মীর জাফরের অভিপ্রায়, নবাব বাহিনী পরাজিত হোক। এরই প্রেক্ষিতে 'পলাশীর যুদ্ধ'-র কবি আমাদের চট্টগ্রাম-গৌরব নবীন চন্দ্র সেন মীর জাফরের মুখ দিয়ে বলিয়েছেন, এক হীন ষড়যন্তের কথা। মীর মদনের আক্রমণে শত্রু যখন উদ্ব্যস্ত, তাদের বাঁচাবার জন্যে মীর জাফর তাঁর এক চাল চাল্লেন। তিনি প্রধান সেনাপতি। তাঁর আদেশ ধ্বনিত হলো ঃ ক্ষান্ত হও সৈন্যগণ, কর অস্ত্র সংবরণ, নবাবের অনুমতি কালি হবে রণ।

বিজয়ে উন্মুখ সৈন্যদের রণে ক্ষান্ত দেওয়া আর জোয়ারের ঢেউকে পিছিয়ে দেওয়া একই কথা। এই আদেশ শুনে মীর মদনের বাহিনী বিভ্রান্ত হয়ে যায়। তাদের ক্ষণিক কিংকর্তব্যবিমূঢ়তার সুযোগে শত্রু বাহিনী প্রবল আক্রমণ চালায়। তাদের একটা গুলিতে স্বয়ং বীর সেনাপতি মীর মদন নিহত হন।

সিরাজের শেষ আশা "রণক্ষেত্রে জয়লাভ" নির্মূল হয়ে গেল। তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠলো রাজমহল। ওখানে হাওয়া এখনও বাংলার ন্যায় দূষিত হয়নি। আর, ইংরেজের প্রতিদ্বন্দ্বী ফরাসী শক্তি তাঁকে সাহায্য করার কথা আছে। তাদের সেনাপতি মসিয়ে লা যেকোন মুহূর্তে তাঁর বাহিনী নিয়ে এসে পড়তে পারে।

নবাব রাজমহলের অভিমুখে পালাতে লাগলেন। কিন্তু, 'অভাগা যদ্যপি চায় সমুদ্র শুকিয়ে যায়।' নদীতে পানি না হওয়ায় তাঁকে ঘুর পথে যেতে হলো। আর, এই পথেই দানা শা ফকির পায়ে বহুমূল্য জুতা দেখে অনুমান কর্ল ঃ এ নবাব না হয়ে যায় না। সে ব্যক্তি শত্রুদের খবর দিয়ে দিল। নবাব তাদের হাতে ধরা পড়ে গেলেন।

সিংহাসনে বসবার আগে সিরাজ সাত বৎসর নানা আলিবর্দী খাঁর যুবরাজ ও উত্তরাধিকারী পদে অভিষিক্ত ছিলেন। তখন বহু যুদ্ধে নানার অনুগামী হয়ে বীরত্বও প্রদর্শন করেছেন।

৮২ বৎসর বয়সে প্রবীন যুদ্ধবাজ আলিবর্দী খাঁর যখন মৃত্যু হলো তখন বাংলায় এমন কোন নেতা ছিলেন না যিনি তাঁর স্থান গ্রহণ কর্তে পারেন অথবা যুদ্ধ্যমান বহু স্বার্থের মধ্যে একটা সমীকরণ এনে দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপন কর্তে পারেন।

তখনও বাংলাদেশে গণ সচেতনতা আসেনি। সুতরাং জননেতা বলে কারো কোন ভূমিকা দেখা দেয়নি। শক্তিধরেরা স্বেচ্ছাচার চালালে তাকে রুখ্বার কেউ ছিলনা। আর, যুবরাজ ছিলেন স্বেচ্ছাচার চালাবার এক নম্বরের অধিকারী।

সিরাজ বন্দী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ষড়যন্ত্র রূপ ধরে উঠেছিল। মীর জাফর আলী খাঁ হলেন সুবে বাংলা বিহার ও উড়িষ্যার নূতন নবাব, কিন্তু, স্বাধীন নন, ইংরেজ কোম্পানীর সায় মতে। আর, তাঁর পুত্র মীর্জা মীরন হলেন যুবরাজ, তাঁর পরেই সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ব্যক্তি।

জ্ঞাতির জাত ক্রোধ, ভাগ্যাহতের প্রতি ঘৃণা এবং স্বার্থের সংঘাত মীর্জা মীরনকে

www.pathagar.com

বাংলার শেষ স্বাধীন ও সার্বভৌম নবাবের প্রতি কতখানি বিদ্বিষ্ট করে তুলেছিল সেটা আমরা সহজেই অনুমান কর্তে পারি। সিরাজ হয়তো ভেবেছিলেন ঃ এত বড় রাজ্যে তাঁর কি একটু মাথা গুঁজে থাকবারও ঠাঁই হবেনা। কিন্তু, তখনকার রাষ্ট্রনীতিতে উষ্ণীষ-পরা মাথা বেঁচে যাওয়ার কোন সম্ভাবনাই ছিল না। মীর্জা মীরন এক মাত্র আদেশ দিলেন ঃ হত্যা। ষড়যন্ত্রের সিদ্ধির জন্যে ওটা অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল।

কিন্তু, এমন লোক কে আছে যে বাংলায় নবাবকে হত্যা কর্তে রাজী হবে! তেমন লোকও পাওয়া গেল মোহাম্মদী বেগ ঃ আলিবর্দীর অন্নপুষ্ট ও এক কালের আশ্রিত। অর্থ লোভে এই দুর্বৃত্ত শানিত তরবারি হাতে বন্দীশালায় ঢুকে নবাবকে নৃশংসভাবে কুপিয়ে হত্যা করে। তাঁর খণ্ডিত দেহ হাতীর উপর চাপিয়ে মুর্শিদাবাদ শহরে প্রদক্ষিণ করানো হয়। শুধু তাই নয়। যাতে উত্তরাধিকারের কোন প্রশ্ন উঠতে না পারে সেজন্যে সিরাজের ছোট ভাই মীর্জা মেহেদীকে এবং অপর ভাই ইক্‌রামদ্দৌলার পুত্র মীর্জা মুরাদকেও হত্যা করা হয়। সিরাজের কোন পুত্র সন্তান ছিল না। 'একজন না রহিল বংশে দিতে বাতি'। সত্যই সিরাজ হলেন ইতিহাসের বলি।

কিন্তু, নিধনেই ইতিহাসের বলিরা শেষ হয়ে যায় না। কালের চক্র একদিন ঘুরে যায়। জাতির জীবনে নূতন সম্বিত জাগে। সেই সম্বিতকে ধরে রাখার জন্যে, এগিয়ে নেওয়ার জন্যে নূতন প্রতীকের প্রয়োজন হয়। তখন ইতিহাসের এই বলিরাই জিয়ন কাঠির কাজ করে।

আর, কাল হচ্ছে নির্মম বিচারক। কাল পলাশী ষড়যন্ত্রের সিরাজ-পরিণতির তিন নায়ককে জবর শাস্তি দান করে। মীরনের বজ্রাঘাতে মৃত্যু হয়। বিলাতে ক্লাইভের শেষ পরিণতি হয় আত্মহত্যা। আর, ঘৃণ্য কুষ্ঠরোগ হয় মীর জাফরের শেষ সঙ্গী ও হন্তা।

ইংরেজের শাসন তখনও দোর্দণ্ড প্রতাপে চলছে। এর মধ্যেই বাঙ্গালীর সম্বিৎ ফিরে আসে। সিরাজ-ইতিহাস বাঙ্গালীর প্রিয় গবেষণা হয়ে উঠে। অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়, মৃণালিনী দেবী তাঁর ভূমিকা ও চরিত্রকে নূতন ভাবে তুলে ধরেন। সিরাজ হয়ে উঠেন বাঙ্গালীর নূতন স্বাধীনতা স্পৃহার প্রতীক, চির জন-প্রিয় নাট্য।

৬৩ বৎসর পূর্বের কথা। তখন অষ্টম শ্রেণীতে পড়ি। স্কুল পালিয়ে আমি মুর্শিদাবাদ চলে গেলাম। মুর্শিদাবাদে দু'টা ঐতিহাসিক সমাধি-ভূমি আছে ঃ রৌশনীবাগ ও খোশবাগ —আলোর উদ্যান ও খুশীর উদ্যান। খুশীর উদ্যানে শায়িত আছেন নবাব মন্‌সুর-উল মুল্ক সিরাজদ্দৌলা শাহ্ কুলি খান মীর্জা মুহম্মদ হায়বৎ জং বাহাদুর—স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলার শেষ স্বাধীন নৃপতি।

কোন কুমোরই হবে—এক গাদা মাটির প্রদীপ রেখে গেছে। সম্ভবত ঃ মানৎ। কত দর্শনার্থী সেই প্রদীপে শল্‌তের বা মোমের বাতি জ্বেলে দেয়। আর, দেওয়ালের গায়ে লিখে রেখেছে কত আবেগপূর্ণ উচ্ছ্বাস।

আজ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ তার শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করছে ইতিহাসের বলি তার শেষ স্বাধীন নবাবকে।

www.pathagar.com

বালকের জগৎ

আমার এক বন্ধু মুশকিলে পড়েছেন। একমাত্র ছেলে। ক্লাস নাইনে পড়ে। সব দিক দিয়ে আদর্শ ছেলে। পড়ায় ভাল। পান বিড়ি সিগারেট তাস কি অন্য নেশা করেনা। কারু সাথে মিশেনা। কম কথা বলে, অথচ, স্কুল ফাঁকি দেয়। স্কুলের নাম করে বেরিয়ে যায়—কিন্তু কোথায় যায় কি করে কেউ বলতে পারে না।

ছেলেটির প্রতি আমার সহানুভূতি হলো। বন্ধুকে বল্লাম, ঘাবড়াবেন না। স্মরণ হলো ঃ বাল্যকালে আমার এক নিজের জগৎ ছিল সেখানে সকলের আড়ালে আমি লুকিয়ে থাকতাম। আমাদের বাড়ির মাইলখানিক পশ্চিমেই পাহাড়। তখন পাহাড় ছিল অঘোর জঙ্গল।

পাহাড়ে ঢুকলেই আমার বালক-আত্মা তৃপ্তিতে ভরে উঠত। টিলাগুলোকে মনে হতো এক একজন দরবেশ আল্লাহ্‌র সেজদায় পড়ে আছেন। নিঃশব্দ প্রকৃতির বুক থেকে একটা ঐকতান বেরিয়ে আমার বুকে বাজতে থাকত।

ক্রমে আমি একটি খুব উঁচু গাছ আবিষ্কার কর্লুম। এই গাছে উঠে এর মগ্‌-ডালে বসে আমি পাখীর ছানার ন্যায় হাওয়ায় দুলতাম। অনেকক্ষণ বসে থাকতুম। মনে এক অনির্বচনীয় শান্তি পেতুম।

সে বয়সে খুব ছুটতে পার্তুম। ছুটতুম, আরও জোরে ছোটার জন্যে মন-মানুষের তাগাদা পেতুম। ছুটে আনন্দ হতো একটা হরিণ শিশুর ন্যায়।

জঙ্গলে লতা ও ফুল দিয়ে বহু স্থানে এমন বিচিত্র মুকুট প্রকৃতি বানিয়ে রেখেছিল যে দেখে আমি মুগ্ধ হয়ে যেতুম। কোথাও কোথাও আশ্চর্য ফটক। মানুষের বানানো মুকুট ও ফটক এর কাছাকাছি হবে—কি সাধ্যি !

একবার এমন তুফান শুরু হলো, অমি তড়বড়িয়ে গাছ থেকে নেমে পড়লুম। তারপর দে ছুট। বাড়ী পৌঁছে দেখি—সামনের উঠোনে প্রকাণ্ড এক আম গাছ—তার আম পড়ে উঠোন ভরে গিয়েছে। বাপ্‌রে, ঐ বয়সে সারাদিন এত আমও খেতে পার্তুম!

কাল বৈশাখীতে আমার জঙ্গলের জগতে বিচরণ একটুখানি বিপজ্জনক হয়ে উঠছে

www.pathagar.com

এমন সময় এক সন্ধ্যায় বড় ভাই কর্লেন অমাকে এক চপেটাঘাত।

মোটে দু'বছরের বড়। পড়ায় খুব নাম। তবে, আমার রাগকে খুব ভয় কর্তেন। এক চপেটাঘাতেই সেই রাগকেই তিনি উসকিয়ে দিলেন।

আমি সিংহের ন্যায় রাগে ফাটা গর্জন করতে লাগলুম। বড় ভাই আগে পালিয়ে গিয়েছিলেন। গর্জনের মর্ম হলো ঃ আমি বাড়ি ছেড়ে চল্লাম।

মা ধরতে আসলেন। এক ঝটকায় তাঁর হাত ছাড়িয়ে ফেল্লুম। গ্রাম সম্পর্কের দুই ভাবী ধরে ফেল্লেন। দুই ঝটকায় তাঁরা মাটিতে ছিটকে পড়লেন।

এইবার মৌলবী বাড়ির মাহবুব লুঙ্গী-মাত্র পরনে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসল।

মা কাঁদতে লাগলেন ঃ যে রাগী, হয়ত জঙ্গলে গিয়ে বসে থাকবে—বাঘেই খায় কি সাপেই কাটে।

তাই শুনে অভিমানী মন বলতে লাগল ঃ তা-ই যেন হয়। মাকে কাঁদিয়ে এত সুখ পেতুম। আবার পরক্ষণেই তাঁর চোখে হাসি ফোটাবার জন্যে পাগল হয়ে উঠতুম।

আমি কিন্তু অত অন্ধকারে জঙ্গলের দিকে গেলাম না। সেই গাছে উঠে যদি বসে থাকতে না পারি জঙ্গলে যাওয়ার কোন অর্থ হয় না। অন্ধকার রাত্রে সেটা অসম্ভব। আমি সড়ক বেয়ে উত্তর দিকে চলতে লাগলুম।

চার মাইল চলে এলাম। মায়ের আওতার, ভাবীদের আওতার এমন কি বড় ভাইয়ের আওতার বেশ বাইরে। কিন্তু ততঃকিম্ ? এরপর কি ? যাব কোথায় ? শোব কোথায় ? রাতের খানা না হয় বাদই দিলাম।

ফকীরের মসজিদে এক দল মুসল্লী তখনও জামাৎ করে এশার নামাজ পড়ছেন। আমি গিয়ে মসজিদের সাঁইচে উপুড় হয়ে পড়ে থাকলুম—তবে গভীর নিদ্রার ভান করে। মুসল্লীরা চলে যাওয়ার সময় আমাকে দেখলেন। এক আধজন বাতি উঁচিয়ে নিরীক্ষণ করে মন্তব্য কর্লেন ঃ কোন বালক মস্তানই হবে। মাইজ ভাণ্ডার কাছেই। সুতরাং সেটা কিছু অসাধারণ নয়। মসজিদ খালি হতেই আমি ভিতরে ঢুকে পড়লুম। শেষ রাত পর্যন্ত মসজিদে শুয়ে থাকা যাবে। কিন্তু কোথায় ছিল এত মশা! তারা সুর তুলে আমাকে ছেঁকে ধরল। আমি অগত্যা একটা পাটি খুলে নিয়ে তার ভিতর নিজেকে রোল করে নিলুম।

ভোর না হতেই মসজিদ থেকে বেরিয়ে আসলুম। পেটে চোঁ-চোঁ ক্ষিধে। আমি বস্তির পথ ধর্লুম।

মীরদের প্রকাণ্ড বাড়ী। বাহির ঘরে আমারই বয়সের কয়েকটি ছেলে পড়ছিল তরুণ এক মাষ্টারের কাছে। আমি গিয়ে নিঃশব্দে তাদের সামনের বেঞ্চিতে বসে পড়লুম। মাষ্টার পড়া ধরছিলেন, এরা উত্তর দিচ্ছিল।

"আক্রমণ"—

"আক্রমণ মানে ভয় দেখান"।

www.pathagar.com

মাষ্টার পরের শব্দটি ধর্তে যাচ্ছিলেন আমি বাধা দিয়ে বল্লুম ঃ আক্রমণ মানে ভয় দেখান তো ঠিক হলো না। আক্রমণ মানে হলো চড়াও হওয়া।

মাষ্টার বল্লেন ঃ ওদের অর্থ বইতে ভয় দেখানই দিয়েছে। আমি বল্লুম ঃ ও অর্থ বই খারাপ। যে কোন ভাল অর্থ বইতে দেখবেন—চড়াও হওয়া।

ছেলেদের চোখে যেন বিজলী খেল্‌ল। তারা এমন ছেলের সাক্ষাৎ পেয়েছে যে তাদের মাষ্টারকেও দু'কথা শিখাতে পারে। তাদের শৃঙ্খলা ভেঙ্গে গেল। যে যার আগে পারে বাড়ীর ভিতর দৌড়ালে। কলরব শোনা গেল ঃ ও দাদী, দেখ কে এসেছে। আমাদের মাষ্টারকেও সব পড়া বলে দিচ্ছে।

ঐ বৎসর মৌলবী বাড়ীর মাহ্‌বুব মধ্য ইংরেজী বৃত্তি পাবে। দাদী নাতিদের পরিবৃত হয়ে দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে মাহ্‌বুবকে দেখলেন। এক নযরেই তাঁর সব জানা হয়ে গেল। "তুই কার বুকের ধনরে, আমার এখানে পালিয়ে এসেছিস !" বলতে বলতে তিনি এগিয়ে আসলেন।

আমি দেখলাম, এমন অপূর্ব সুন্দর মাতৃমূর্তি। সব চুল সাদা। তবুও গায়ের কি রং। শরীরের কি নাদুস-নুদুস গঠন। আর কী সুখী চেহারা ! সেজেছেনও রাজমাতার ন্যায়।

আমি বল্লুম ঃ আমি আপনার এখানে কাজ কর্ব।

তিনি হাসলেন। বল্লেন ঃ আমার অনেকগুলো মোষ, অনেকগুলো গরু। মোষের জন্য পুকুর থেকে দল-ঘাস উঠাতে পার্বে ? গরুর জাবনা দিতে পার্বে ?

আমি বল্লুম ঃ ওসব পার্বো না। এদের পড়াতে পার্বো।

ততক্ষণে এক নাতি এসে বল্লে ঃ দাদী, মেহ্‌মানের জন্য মধু-ভাত বাড়া হয়েছে।

"চিকন পাটি বিছিয়ে দিয়েছ ?"

" দিয়েছি।"

"নিমক আর পানি দিয়েছ ?"

"দিয়েছি।"

"চিলম্‌চি বদ্‌না দিয়েছ ?"

"দিয়েছি।"

দাদী হাত ধরে আমাকে খাবার বিছানায় নিয়ে বসিয়ে দিলেন। নাতি তাযীমের সাথে আমার হাত সাফ্ করিয়ে দিলে। আমার ক্ষুধার অগ্নি নির্বাপণ হলো মধুরেন—মধু ভাত দিয়ে।

খাওয়ার পর আমিও যেন তাঁর নাতি হয়ে গেলুম। তিনি খপ্ করে হাত ধরে আমাকে কোলে বসিয়ে নিলেন। আমার ভারী লজ্জা কর্তে লাগল। কিন্তু তিনি যেন আমার সব শক্তি হরণ করে নিয়েছেন। তিনি আমার গায়ে হাত বুলোতে লাগলেন। নাতিরা চোখ ছানাবড়া করে দেখতে লাগলো।

www.pathagar.com

তিনি আমার কানে কানে খুব মৃদু আওয়াজে বল্লেন ঃ দাদু, বাড়ী যাও। কাপড়-চোপড় সব নিয়ে এসো। তবেই তোমাকে রাখব। কেমন রাজী ?

আমি মাথা দুলিয়ে বল্লুম ঃ রাজী। তিনি এবার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন—জননীর রাজ্যের যত শুভাশিস্।

মৌলবী বাড়ীর মাহ্বুব ফিরে চলেছে। জল্পনা-কল্পনা ঃ অলক্ষ্যে কাপড়-চোপড় নিয়ে আবার মীর বাড়ীর উদ্দেশ্যে যাত্রা কর্বে।

কোত্থেকে দুই ভাবী এসে দুই বাহু আঁকড়ে বল্লে ঃ সোনার চাঁদ, এবার আর হাত ছাড়াতে পার্বেনা। আমারও যেন শক্তি নেই। সব শক্তি কেড়ে নিয়েছেন মীর-বাড়ীর দাদী।

মা আসলেন। তাঁর চোখে আনন্দাশ্রু। বল্লেন ঃ আমি ভেবে সারা, জঙ্গলে গিয়ে বসে থাকিস নিতো। বড় ভাই গিয়েছে তোকে জঙ্গলে খুঁজতে।

রাত্রে মাকে বলছিলাম এবারের অভিজ্ঞতার সব কথা। মীর-বাড়ীর দাদী মোষের দল তুলবার এবং গরুর জাবনা দেবার চাকুরি দেবার প্রস্তাব দিয়েছিলেন শুনে মা খুব এক চোট হাসলেন।

মা বল্লেন ঃ খুব বুদ্ধিমতী তিনি।

আমি এক কথাতে তাঁকে আঁকতে পার্লুম না। কোন মাকেই কোন কোন দিন পারি নি।

বন্ধুকে বলছি ঃ ঘাবড়াবেন না। ছেলের নিজস্ব একটা জগৎ আছে কি-না অলক্ষ্যে থেকে তা-ই আমাদের আবিষ্কার কর্তে হবে।

www.pathagar.com

কেন লেখা ?

একই আধারে বহু আধেয়—একই সঙ্গে বহু জগতের বিদ্যমানতা—সৃষ্টির ওটাই পরম বৈচিত্র।

দিনে যা' বৃক্ষ-জগত, জড়—রাত্রির নিশীথে সেটাই আমার নিকট চলমান হয়ে ওঠে।

পশুর ভাষা বোঝা খুবই সহজ। কারণ, তার নিঃস্বরণ পদ্ধতি মানুষেরই ন্যায়। মানুষ আর পশু একই প্রাণী-জগতে বাস করে।

কিন্তু, গাছের কথা আলাদা। তার জগতই স্বতন্ত্র। তারও গতি আছে, কিন্তু সে গতি জৈবিক পরিক্রমণ বা পরিভ্রমণ জাতীয় নয়। সে গতি মাটিতে দাগ কেটে লেখা হয় না। সে গতি কালের বুকে বাজে—বাঁশীর ন্যায় বাজে, বিষাণের ন্যায় ধ্বনিত হয়ে ওঠে।

আমার জীবনের গুপ্ত কথা হলো—গাছের সঙ্গে আমার পরিচয়। ষাট বৎসরের জীবনে একমাত্র বন্ধু আমাকে কখনও হতাশ করেনি—সে হলো গাছ। গাছের বন্ধুত্ব যদি আমি না পেতুম, আমার পক্ষে লেখক হওয়া অসম্ভব হতো, লেখক হিসেবে টিকে থাকা আমি কল্পনাতেই আনতে পার্তুম না।

গাছের সঙ্গে পরিচয় শুরু হলো এভাবে। আমার যখন বছর নয়ের মত বয়স তখন বাবা এক পড়ো ভিটা কিনলেন। আমাদের তখনকার বাড়ী থেকে মাইল দেড়েক দূরে এক ভিটে। বাবা স্থির করলেন, শরীকদারী বাড়ী ছেড়ে দিয়ে এখানে একা একখানি বাড়ী করে চলে আসবেন। তারই আয়োজন হিসেবে এই পড়ো ভিটে আবাদ করবার কাজে এসে তিনি বহু রাত এখানে কাটাতেন। সঙ্গে থাকতো এক খাটিয়া, সঙ্গে থাকতাম আমি। খাটিয়াখানি শোয়ার জন্যে, আর আমি কিছুতেই তাঁর 'লগ' ছাড়তুম না বলে।

পড়ো ভিটেয় ঠাসাঠাসি করে দাঁড়ান ছিল বহু গাছ—অনেক রকমের। তারই মাঝে কিছু জায়গা করে নিয়েছিলেন বাবা, তাঁর খাটিয়াখানি ফেলার মতো। একখানি পাতলা কম্বল মুড়ি দিয়ে তিনি শুয়ে থাকতেন, আমি গুটিশুটি মেরে তাঁর বুকে আশ্রয় নিতুম।

শেষ রাত্রে—আমি তখনো ঘুমিয়ে—বাবা কম্বল সরিয়ে আস্তে উঠে মসজিদে চলে যেতেন। মসজিদ ছিল এমন দূরে যেখান থেকে তাঁর আজান আমি শুনতে পেতুম, কিন্তু

www.pathagar.com

আমার চিৎকার তাঁর কানে পৌঁছার কোন সম্ভাবনা ছিল না।

কি ভেবে যে তিনি আমাকে একা ফেলে যেতেন বলা শক্ত। হয়ত ঃ ভাবতেন তাঁর ক্ষুদে ছেলেটিরও তাঁর মত অসম সাহসী হয়ে ওঠার এতে সুযোগ হবে।

জেগে উঠে প্রথম রাত্রি আমি ভয়ে অবশ হয়ে গিয়েছিলুম। তখনও আমার জগত জীবময়—বাড়িতে মা-বাবা, ভাই-বোনরা ছাড়াও আমার একান্ত একেলার মোরগ ও ছাগল নিয়ে আমার জগত।

অনেকক্ষণ চোখ মুদে পড়ে থেকেও আমি ভয়ে ভয়ে চোখ খুল্লাম। ক্রমে গাছগুলি এলো আমার জীবনে। মানুষের ন্যায়, পশুর ন্যায় তারা কখনও হুটোপুটি করে আসে না। তারা আসে নীরবে এক একটি করে। তারা আসে মর্যাদার সাথে, বিনয়ে উন্নত শিরে, আজীবনের বন্ধুত্বের নীরব প্রতিশ্রুতি নিয়ে। তাদের আসার বিশেষত্ব এখানে যে তারা মনের কোন কোণ দখল করে থাকে না, কাউকেও আড়াল করে দাঁড়ায় না, শুধু নিথর শান্তিতে চোখের উপর ভাসতে থাকে। 'চাও তো আছি, না চাও তো নেই'—এই তাদের মনোভাব।

ক্রমে গাছদের শান্তিময় জীবনে আমি অভ্যস্ত হয়ে গেলুম। তাদের কান্না, তাদের হাসি, তাদের 'হা-হুতাশ', তাদের হর্ষ আমি বুঝতে পার্লুম। তাদের সব অবস্থাতেই একটা জিনিস আমাকে অবাক করে দিত। কোন অবস্থাতেই তারা মর্যাদা হারাতো না। একমাত্র গরুর সহনশীলতাই এর সঙ্গে তুলিত হতে পারে।

আমার মনে হয়, যে সব গাছ 'মাংস-ভুক'—মানে মাছি ধরে খায়—তারাও হিংস্রতার শেষ মুহূর্তে পর্যন্ত এই মর্যাদা হারায় না। এদিক দিয়ে মানুষের চেয়ে অনেক উচ্চতর সভ্যতার স্তরে এরা পৌঁছে গেছে।

কিন্তু বাবা এক ধার্‌সে গাছ কাটতে লাগলেন। নতুবা, তাঁর বাড়ী করা হয় না। আমার মন থেকে নীরবে তাদের জন্য রক্ত ঝরতে লাগল। আমি অবশিষ্ট গাছগুলির সঙ্গে আমার সখ্য আরও নিবিড় করে তুল্লুম। কিন্তু, গাছ গেল অনেক কমে, আমিও উঠলুম গিয়ে অনেক বেড়ে। যে গোলাপ-জাম গাছটায় আমি বিহার কর্তুম সব চেয়ে বেশী সেটা আমার ভারে নুয়ে পড়তে লাগল, তবুও মর্যাদার সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগল দাঁড়িয়ে থাকার জন্য। ওদিকে বাড়ি হয়ে যাওয়ার পর কোন গাছই আমার একা থাকলো না, সব শরীকদের দেখা যেতে লাগলো এর ওর পিঠে।

তখন, দৈবাৎ পাহাড়ে বেড়াতে গিয়ে আমি গাছের সমারোহ দেখে অবাক হয়ে গেলুম এবং শীঘ্রই একটা স্থান আবিষ্কার করলুম যেখানে একটা খুব উঁচু গাছকে কেন্দ্র করে রয়েছে গাছ আর গাছ। আমি মনে মনে ঐ স্থানের একটা চৌহদ্দী ছক কেটে দিলুম এবং সংকল্প আঁটলুম এখন থেকে এই রাজ্য আমারই, উচুঁ গাছটা হলো রাজধানী।

উঁচু গাছটির মাঝামাঝি উঠলে একটা শাখা সঙ্গম পাওয়া যেতো যেখানে জুৎসই হয়ে বসা যেতো। এই হলো আমার রাজ-পাট।

এই রাজত্বের বৈশিষ্ট্য হলো এখানে কোনও বৈরী ভাব নেই। 'উঠে বসতে চাও ?'

www.pathagar.com

তথাস্তু', 'ফল খেতে চাও ? ভাল কথা।' 'রস খেতে চাও ? বহুৎ আচ্ছা'। 'প্রাণে মরতে চাও ? বহুত খুব।' এ হলো গাছেদের কথা। কোন বিদ্রোহ নেই, বিচার নেই, বিচারের প্রয়োজন পর্যন্ত নেই। শান্তি! শান্তি!! শুধু শান্তিরই স্তব উঠছে সব খান থেকে।

এই সময় বড় ভাইয়ের চড়-চাপড় আমার উপর পড়তে লাগলো কারণে অকারণে, বিচারে অবিচারে। আমি তখন নেউল হয়ে গেছি। নেউলের প্রবাদ আছে, জঙ্গলের কোন্ শিকড় তার ঔষধ জানা আছে, সাপে ছোবল মার্লেই নেউল এক মুহূর্তে গিয়ে ওটা ছুঁয়ে নিরাময় হয়ে আসে। আমার দেহ মনেও যত ক্ষত হতে লাগলো কোনটিরই রক্ত ঝরার অবকাশ হতো না। আমার রাজ-পাটে গিয়ে একবার বসতে পার্লেই ব্যস্।

কিন্তু, শীঘ্রই আমি অশান্তি ভোগ কর্তে লাগলুম। গাছগুলি আমার জীবনে এসে গিয়েছিল। এখন পথে যে মেয়েকেই দেখি, মনে হয় আমার অতি কালের চেনা। ভীষণ বিপদ হলো এখানে যে গাছ-বন্ধুরা এ ব্যাপারে আমাকে কোন সাহায্যই কর্তে পার্লো না। তারা মাথা দুলিয়ে বল্লো, 'তোমরা সভ্যতার এখনও অনেক নীচু স্তরে রয়ে গেছ। গাছ হতে এখনও তোমাদের কয়েক কোটি বৎসর লাগবে। ওসব ব্যাধি আমরা চিকিৎসে করবো কি, ধরতেই পারিনে, তুমি অন্য উপায় দেখ।'

একবার বৈশাখের খর-দুপুর। আমি ব্রহ্মদৈত্যের মত আমার গাছের ঘাড়ে চড়ে বসে আছি। এমন সময় উঠলো প্রচণ্ড ঝড়। গাছের মর্যাদা আর ঝড়ের দাপট এই দুয়ের মধ্যে লণ্ড-ভণ্ড লড়াই শুরু হয়ে গেল। আমি তখন দিবাস্বপ্নে বিভোর ছিলাম জানা না-জানা যত রাজ্যের মেয়ের মুখ নিয়ে। ঝড়ের সম্বিৎ হতেই আমি ত্রস্তে গাছ থেকে নেমে পড়লুম এবং বাড়ীর পানে ভোঁ দৌড় দিলুম।

সেই বয়সে হাঁটার চেয়ে দৌড়াই ছিল আমার পছন্দ। আর, আমার হাতে থাকতো একটা কঞ্চি। এমনিতে দৌড়ে বেগ ধরতো না। কঞ্চিকে শূন্যে আস্ফালন করে কাল্পনিক পক্ষীরাজের পিঠে প্রয়োগ কর্তে কর্তে দৌড়ে বেগ যেমন ধর্তো তা'তে কেমন একটা ছন্দের সঞ্চার হতো তেমনই।

ক্রমে আমার অবস্থা হলো রাজ্য-হারা রাজার মতো। রাজ-পাটে আর শান্তি নেই, এখন দৌড়াতেও লজ্জা করে, ঘর ভরে উঠেছে বইতে—হাতের কঞ্চিকে রাখাও যায় না, ফেলাও যায় না। তখন কঞ্চির প্রায় সবটুকু কেটে ফেলে দিয়ে অল্পটুকু মাত্র হাতে রাখলুম। এর নাম হলো কলম।

সেই কলম চালিয়ে যাচ্ছি—নিজের জগত সৃষ্টি করে চলেছি—যেখানে আমি শাহেনশাহ্।

কেন লেখা ? উত্তর ঃ নিজের জগত সৃষ্টির জন্য।

www.pathagar.com

বাঘ-মানুষ

একটা ছেলেকে নিয়ে আমি গল্প লিখেছিলুম। গল্পের নাম দিয়েছিলুম 'বাঘ-মানুষ'। ফণা-ধরা কেউটেকে দেখে আমি মোহিত হয়ে যাই। কী স্থির, অচঞ্চল তার চোখ, কী দুর্জয় রাগে আরক্ত। লক্ষ্যে চোখ রেখে কী তার ঘাড়-দুলুনী ডানে-বামে সাক্ষাৎ মৃত্যুর নৃত্য-ছন্দে।

এই চেহারা দেখেছিলাম ছেলেটির। একটা গুণ্ডার মুকাবিলা করতে গিয়ে। গুণ্ডা অবাক হয়ে গিয়েছিল। তবে, ন্যায় ছিল ছেলেটির পক্ষে।

যে কোন বাঙালী ছেলে এরূপ কেউটে হয়ে উঠতে পারে। তাদের সে মূর্তি দেখেছি মুক্তিযুদ্ধের সময়ে। পাঞ্জাবীরাও তেমন অবাক হয়ে গিয়েছিল।

তোমার এলাকায় তুমি থাকো, বাঙালী কথা বলতে যাবে না। কিন্তু, নিজের এলাকা পেরিয়ে বাংলায় তুমি জারি-জুরি দেখাতে এসেছো তো অমনি ক্রুদ্ধ কেউটের পাল্লায় পড়ে গেলে।

বাঘের এলাকা হলো সুন্দরবন—চার ধারে সমুদ্র যার পা ধুয়ে দিচ্ছে। কিন্তু এত আলস্য তার ভাল লাগে না। সৌন্দর্য শক্তি ও গতি নিয়ে বাংলার বাঘ। তাই কোন কোন বাঘ হরিণঘাটা ও শিবসার মত খরাস্রোতা সামুদ্রিক নদী সাঁতরে এ পাড়ে এসে উপস্থিত হয়। লোকে দেখুক তার সৌন্দর্য—বস্তুতঃ বাঘ বেশী সুন্দর, না মানুষ বেশী সুন্দর কোন শিল্পীর পক্ষেও বলা শক্ত। লোকে বুঝুক তার শক্তি, একটা আস্ত মোষ মেরে কাঁধে তুলে বয়ে নিয়ে যাওয়া তার জন্য কিছুই নয়। লোকে জানুক তার গতি—এই আছে তো এই নেই—পরম বিস্ময়।

তেমনি এক বিরাট বাঘ উঠে এসেছিল চট্টগ্রামের পাহাড়ে ১৯২০ সালের শেষ দিকে।

পাহাড়ের পুবদিকে লাগোয়া পাহাড়তলী গ্রাম। তার পুবদিকে আমাদের পাড়ার ছড়ার কূল—তবে মাঝখান দিয়ে উত্তর-দক্ষিণে চলে গিয়েছে রাজপথ।

পাহাড়ে শুধু সুন্দরবনের বাঘই আসতো না। মৌসুম বিশেষে—শীতের প্রথম ভাগে—চিতা, রামকুত্তা—এদেরও আবির্ভাব হতো। রামকুত্তা ছিল সবচেয়ে সাংঘাতিক, তাদের

www.pathagar.com

পালের মধ্যে পড়লে হাতী, ঘোড়া, মানুষ কারও বাঁচবার সম্ভাবনা ছিল না—এত হিংস্র, দলবদ্ধ ও ক্ষিপ্র ছিল এই বন্যকুকুর।

আমাদের ছোটবেলায় চাষীরা পাহাড়ে মাচান বেঁধে ক্ষেত পাহারা দিত। তবুও মাচানের মই বেয়ে উপরে উঠে যেতো চিতাবাঘ। কিন্তু, চাষীরাও প্রস্তুত থাকতো গন্‌গনে আগুনের পাত্র নিয়ে। বাঘ শেষ ধাপ ছোঁয়া মাত্রই তার মাথায় ঢেলে দিত সে পাত্র। বাঘ পালাবার পথ পেতো না—আর যতদূর পালাতো লোম পোড়া গন্ধে আকাশ-বাতাস ভরে উঠতো।

একবার গভীর রাতে বাঘ এসে পড়েছিল আমাদের বাড়ীতে। পুকুর-ঘাট আঁচড়াতে আঁচড়াতে তার কী গভীর গর্জন। সে নাকি খড়ি পেতে দেখছিল কোথায় কী আছে, শিকারের সম্ভাবনা কী রকম। বাবা শোয়া থেকে উঠলেন না, ঘুমের ঘোরে আশ্বাস দিলেন ঃ আপনি চলে যাবে। আমরা ভয়ে বিছানার সঙ্গে লেগে রইলুম—নিঃশ্বাস পর্যন্ত পড়ে না। মা আগুনের পাত্র নিয়ে দরজায় পাহারা দিতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত বাবার কথাই সত্যি হলো। বাঘটা আপনিই চলে গিয়েছিল।

১৯২০ সালের মাঝামাঝি আমি মেসোপটেমিয়ায় যুদ্ধরত বাঙালী পল্টন থেকে ছাড়া পেয়ে বাড়ী আসছিলাম। পথে করাচীর চিড়িয়াখানায়—বিশেষ করে জয়পুরের মহারাজার চিড়িয়াখানায় কতগুলি বাঘ দেখেছিলাম। মহারাজার বাঘগুলি সদ্য ধরা, যেমন তাজা, তেমন বুনো—দাঁত বিকশিত করে খাঁচার এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত লাফালাফি করছিল। মহারাজার প্রতি আমি ভক্তিতে গদগদ, এমন সময় পাহাড়তলীর আমির আলী 'পল্লান' (পালোয়ান-শিকারী, চট্টগ্রামী ভাষায়) ঐ নবাগত বাঘটি শিকার করে এনে আমার ভুল ভাঙ্গিয়ে দিলে—সুন্দরবনের বাঘ কত বড়, কত মহারাজ চক্রবর্তী হতে পারে !

আমির আলী ছিল বিপত্নীক। নেশা ছিল শিকার। বন্য বরাহদের সে মনে কর্তো চট্টগ্রাম পাহাড়ের জাত বাসিন্দা। বড় বড় ষাঁড়গুলোকে মেরে সে পাহাড় ও পাহাড়রতলীর পথ মানুষের আনাগোনার পক্ষে উন্মুক্ত রাখতো। কিন্তু বাঘকে বরদাশত কর্তে সে এক মুহূর্ত প্রস্তুত ছিল না। বলতো ঃ তোদের জায়গা হলো সুন্দরবন। হরিণ ধরে খাবি আর জঙ্গলে শুয়ে ঘুমোবি। তোদের আবার লোকালয়ে হানার দুর্বুদ্ধি কেন। চাষাদের মোষ আর গরুগুলি মেরে খাওয়া সহজ। কিন্তু তারপর যাবি কোথায় ? জান দিয়ে আমির আলীর ট্যাক্স আদায় করে দিতে হবে যে।

আমির আলীরা বংশানুক্রমে পল্লান। বাঘের থাবার চিহ্ন দেখে আমির আলী বুঝতে পারে বাঘটা কি পরিমাণ উঁচু, কিরূপ তার গতি-প্রকৃতি, তারপর 'আধার' (খাবার, জ্যান্ত ছাগল প্রভৃতি) দিয়ে এমন মেপে-জুকে বন্দুক বসায় খেতে বসলেই গুলি ছুটে বাঘের নির্ঘাৎ মৃত্যু।

তবে গুলি যে কোথায় লাগে সেটাতো বলা যায় না। আমির আলী আওয়াজ শুনে অনেকটা বলে দিতে পারে বটে, কিন্তু তবুও বন্দুক বসানোর পর তিন দিন সে নিষেধাজ্ঞা দিয়ে রাখে ঃ কেউ যেন পাহাড়ে না যায়। জখমী বাঘ বড় ভীষণ। সে বছর বোকা চাষী সোলেমানের মাথার খুলিটা থাবা বসিয়ে একদম চূর্ণ করে দিয়েছিল।

এই বাঘটা বড়ই সেয়ানা। আধার খেতেও আসলো না ধরাও পড়লো না। অথচ,

www.pathagar.com

এমন দিন নেই যে দিন এর মোষ ওর বলদ ধরে গোটা অঞ্চলটাকে সচকিত করে রাখলে না।

আমির আলী অস্ফুটে উচ্চারণ কর্লে ঃ বেটা দিনে আহার করে, রাত্রে ঘুমায়—একেবারে নির্ভয়, নির্ভর। এ তল্লাটে যে আমির আলী আছে তা' বোধ হয় শোনেনি। অথবা গেরাহ্যের মধ্যেই আনেনি। এবার সম্মুখ যুদ্ধ পূর্ণিমার রাতে।

আমির আলী বিপত্নীক হলেও তার একটি মেয়ে আছে নয় বছরের—পিতৃগত প্রাণ। পূর্ণিমার রাত সম্মুখে—সারা দিনের আয়োজন দেখে পল্লানের মেয়ের বুঝতে বাকী রইল না যে বাপ আজ রাত্রে সেই ভীষণ বাঘটি শিকার কর্তে বেরুবে।

আমির আলী রান্না-বান্না কর্লে, নিজে খেলে, মেয়েকে খাওয়ালে। মেয়েকে শুইয়ে দিতেই সে চোখ বুজে নাক ডাকাতে লাগল। আমির আলী খুশী হল। লক্ষ্মী মা আমার আচ্ছা করে ঘুমাও।

আমির আলী যখন বন্দুক নিয়ে বেরুল তখন জোছনার খৈ ফুটছে। আমির আলীর সন্দেহ ছিল পথটা যেখানে পাহাড়ী স্রোতস্বতী পার হয়ে ঐ কূলে উঠেছে তার এদিকেই রাস্তার উপর বাঘটা লুকিয়ে থাকে। সুন্দরবনের বাঘ পানি ছাড়া থাকতে পার্বে না। আর এখানেই পানি খাওয়ার সব চেয়ে সুবিধে। আমির আলী মনে মনে হাসলে। বাছাধনের জানা নেই, কত ধানে কত চাল। ঐখানে যে পানি কত গভীর—লোকে বলে তলাহীন কুয়ো।

আমির আলী অতি সন্তর্পণে অগ্রসর হচ্ছিল। এক জায়গায় এসে সে থামল। কারণ, বাঘটাকে রাস্তার উপর দেখা যাচ্ছিল, রাজাসনে বসে যেন একটু তন্দ্রা দিয়ে নিচ্ছিল।

বাঘের দিকে তার একাগ্র দৃষ্টি। পেছনেই সেই কুয়োটা। এমন সময় পিঠে স্পর্শ পেয়ে চকিতে ফিরে দেখলে। ঘুমের ভান থেকে উঠে এসে মেয়েটি তাকে অনুসরণ করেছে নীরবে—এখনও মুখে আঙ্গুল দিয়ে আছে—অর্থ কোন আওয়াজ কর্বে না।

এরকম বিপদে আমির আলী কখনো পড়েনি। একবার শহর আলী শা'কে স্মরণ কর্লো—যিনি বাঘের পিঠে চড়ে রাত্রে লোকের বাড়ী বাড়ী টহল দিতেন। এর মধ্যে বুদ্ধি ঠিক হয়ে গিয়েছিল। আমির আলী বাঘের নাক তাক করে গুলি ছেড়ে দিলে।

ভীষণ গর্জন করে বাঘটা এক লাফ দিয়ে গিয়ে পড়ল সেই কুয়োয়, তারপর ভীষণ আলোড়নে কুয়োর পানি উপচে পড়তে থাকলো চারিদিকে।

আমির আলীর মুখে হাসি ফুটল। সে যা' অনুমান করেছিল সে ভাবেই কাজ হয়েছে।

মেয়ের হাত ধরে সে বাড়ি ফিরল। ভোরেই খবর পাওয়া গেল ঃ মরা বাঘ ভেসে উঠেছে কুয়োর উপরে। তারপর প্রদর্শনী। বাঘটাকে লোকের বাড়ী বাড়ী নিয়ে দেখিয়ে বেশ কিছু ইনাম মিলল।

এই উপলক্ষে আমাদের বাড়ীও নিয়ে এসেছিল। আমি দেখে অবাক হলুম এত বড় বাঘ মারা পড়েছে। আমার বাড়ীর নিকটেই।

ধন্যবাদ আমির আলী পল্লান।

www.pathagar.com

বিচ্ছিন্নবাদিতাই পতন ঘটিয়েছিল

ইসলামের দেহ হলো খানে কা'বাকে কেন্দ্র করে। রসুলে আকরাম যে সমাজ (উম্মৎ) গড়ে গিয়েছিলেন তাতে আঞ্চলিকতা ও বিচ্ছিন্নবাদিতার স্থান ছিল না। কিন্তু শীঘ্রই আমরা তাঁর শিক্ষা ভুলে গেলুম।

ইসলামের যতই সম্প্রসারণ ঘটলো ততই প্রয়োজন হলো আল্লাহ্‌র একই রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে থাকার—যেন স্থানের দূরত্ব, সময়ের দূরত্ব, জাতিতে জাতিতে বিভিন্নতার দূরত্ব এবং উদ্দেশ্যের দুরত্ব উম্মতের মধ্যে অনৈক্যের বীজ না ঢোকাতে পারে। এজন্য প্রয়োজন ছিল বিজ্ঞান চর্চার, প্রয়োজন ছিল জ্ঞান-সাধনার। কিন্তু, এই চর্চা ও সাধনা চালিয়ে যাব কি আমাদের মধ্যে বহু তুচ্ছ বিষয় নিয়ে বিচ্ছিন্নবাদিতা বড় হয়ে উঠলো। মূলদেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার ফলে সাতাশ বৎসরেরও অধিক স্পেনে গৌরবের সাথে রাজত্ব করার পর মুসলমান খৃষ্টান শক্তির আক্রমণে ১৪৯২ খৃষ্টাব্দে তার শেষ আশ্রয় কর্ডোভা ছেড়ে আসতে বাধ্য হলো।

১৬৬৬ খৃষ্টাব্দে মুসলমান শক্তি কর্তৃক আরাকানের হাত থেকে চট্টগ্রাম বিজয় ছিল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ইতিহাসে এক বৃহৎ ঘটনা। কিন্তু, বিচ্ছিন্নবাদিতা এক শ' বছরেরও কম সময়ে আমাদের চরম পতন ঘটালে।

এই বিজয়ের পর প্রাচীন আরাকানী সামন্ত রাজ্য চক্রশালার অস্তিত্ব লোপ পায়। এর অন্তঃপাতি হুলাইনের মুসা খাঁকে অর্পণ করা হয় এই অঞ্চলের জমিদারী ও আভিজাত্য।

১৬৮১ খৃষ্টাব্দে মুসা খাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র ত্রিংশ বর্ষীয় যুবক আবদুর রহীম খাঁ অশ্বারোহণে রওয়ানা হয়েছিলেন ঢাকায়। তৎকালে প্রচলিত ব্যবস্থায় তিনি যাবতীয় এলেম হাসিল করে এই বয়সেই একজন বিচক্ষণ আলেম হয়েছিলেন। রাজধানী জাহাঙ্গীর নগরে তিনি এক আমীরের বাড়ীতে গৃহ-শিক্ষকের কাজ জুটিয়ে নিয়েছিলেন। এখন বাড়ীতে ছুটি ভোগ করার পর ফিরে চলেছিলেন কর্মস্থানে। তখন বর্তমানের ন্যায় এত পথ-ঘাট হয়নি। অশ্বারোহণে ঢাকা গমন ছিল এক দুরূহ ব্যাপার।

মীরসরাই পৌঁছে তিনি ঘোড়া থেকে নামলেন। আছরের সময় হয়েছিল। পাশেই দেখা যাচ্ছিল চৌধুরী কাদের ইয়ার খাঁর মসজিদ। তিনি ঘোড়া বেঁধে নামাজ আদায়ের

www.pathagar.com

জন্যে মসজিদে ঢুকলেন। তাঁর গৌর-কান্তি, জ্ঞান-বুদ্ধি-দীপ্ত চেহারা ইমামের নজর আকর্ষণ কর্লে। তিনি যেরূপ বাকায়দায় নামাজ আদায় কর্লেন তাও তাঁর দৃষ্টি এড়ালোনা।

একটা বিষয় ইমামের মনে ঘুর-পাক খাচ্ছিল। চৌধুরী কাদের ইয়ার খাঁ তো বেঁচে নেই ! এই জমানায় এত বড় সর্দার কি আর হবেন। তাঁকে বলা হতো শাহী সর্দার ! মাতৃভূমি আফগানিস্থান থেকে মোগল বাহিনীর সাথে তিতি দাঁদাঁরাম এসে আস্তানা গেড়েছিলেন। চট্টগ্রাম বিজয়ের পর মীরসরাইতে সরে এসেছেন। বাড়ী বেঁধেছেন, দীঘি দিয়েছেন, মসজিদ স্থাপন করেছেন। এই অঞ্চলের জমিদারী তাঁকে অর্পণ করা হয়েছে। এই তল্লাটে অত বড় জমিদার আর নেই। নেজামপুরের প্রধান জমিদার শেখ মোহম্মদ শফী এখন চৌধুরীদের তহসিলের ভার নিয়েছেন।

হ্যাঁ, চৌধুরী বেঁচে থাকতে একটা কাজের মত কাজ করেছিলেন বটে। সেটা হলো দোহাজারীর কিল্লাদার আধু খাঁর পুত্র শের জামাল খাঁর সাথে নিজের কন্যার বিয়ে দান। হাঃ, ওরকম জাঁক-জমক কেউ কি কখনো দেখেছে ? না, কখনো দেখবে ? আর, কত যৌতুক ! মালসামানা তো দেদার ছিলই, বাঁদী-গোলামের তো কথাই নেই, কয়েক ঘর কাজী, মোল্লা এবং ক্বারীই দেওয়া হয়েছিল। তাঁরা এখানকার আবাস তুলে কন্যার সাথে চলে গিয়েছিলেন।

চৌধুরীর দুই ছেলে ঃ চৌধুরী আমানৎ খাঁ ও চৌধুরী দেয়ানৎ খাঁ। বড় ছেলে সমান ঘর পেলেন না বলে আর বিয়েই কর্তে পার্লেন না। ছোট জনের একটি মাত্র মেয়ে—হারী বিবি। তখন হারী বিবির পড়বার সময় হলো। চার বৎসর চার মাস চার দিন হলেই হাতে-খড়ির সময় হয়। হারী বিবির জন্যে একজন ওস্তাদের প্রয়োজন। তাঁকে গৃহ-শিক্ষক করে রাখা হবে। চৌধুরী আমানৎ খাঁ ইমাম সাহেবকে বলে দিয়েছেন। সেই থেকে তিনি উপযুক্ত লোকের খোঁজে আছেন। এখন আগন্তুকের চেহারা-চরিত্র দেখে তাঁর মনে হলো ঃ ইনিই কি হবেন সেই ব্যক্তি ?

ইমাম সাহেব অল্প আলাপ করেই বুঝতে পার্লেন ঃ হয়তো আগন্তুকই হতে চলেছেন হারী বিবির গৃহ-শিক্ষক। কিন্তু, আরও তজর্বা করা দরকার। তিনি আগন্তুককে বল্লেন ঃ মিঞা, সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। অন্ধকার রাতে ঘোড়া চালাতে অসুবিধে হবে। রাত্তিরটা আমার গরীবখানাতেই আরাম করুন। আল্লাহ্ চাহে তো সকালে আবার রওয়ানা হবেন।

আবদুর রহীম খাঁ তাঁর দাওয়াৎ কবুল কর্লেন। ভেবে দেখলেন ঃ রাত্রে ঘোড়া চালান সত্যি কষ্টকর হবে। আর, ঢাকা যাওয়ার জন্যে তেমন তাড়াহুড়া ছিল না।

রাত্রে খাওয়ার পর মেজবান আর মেহমানে অনেক আলাপ হলো। ইমাম সাহেব দেখলেন আগন্তুক একজন ভাল আলেম। তখন নিজের উদ্দেশ্য আর এক ধাপ এগিয়ে নেয়ার জন্যে বল্লেন ঃ মিঞা, আমার একটা অনুরোধ। কাল জুমা' বার। ভোরেই রওয়ানা না হয়ে আমার ইচ্ছে ঃ আপনি খাওয়া-দাওয়া করে খোদা চাহে তো জুমা'র নামাজ আদায় করে রওয়ানা হয়ে যান।

আবদুর রহীম খাঁ তাঁর প্রতি বৃদ্ধ ইমামের অন্তরের প্রীতি অনুভব কচ্ছিলেন। তিনি

www.pathagar.com

এই অনুরোধও মঞ্জুর কর্লেন।

মসজিদে সকলেই সমবেত হয়েছিলেন। চৌধুরী আমানত খাঁ, চৌধুরী দেয়ানৎ খাঁ, সমাজের ইতর ভদ্র বয়স্ক পুরুষ মাত্রেই। হারী বিবি দেয়ান খাঁর কন্যা হলেও হুকুমের মালিক বড় ভাই চৌধুরী আমানৎ খাঁ। ইমাম সাহেব গোপনে তাঁকে ইশারা কর্লেন ঃ এই আগন্তুকই হারী-বিবির ওস্তাদ এবং গৃহ-শিক্ষক হতে পারেন।

চৌধুরী দেয়ানৎ খাঁ আগন্তুকের চেহারা-সুরৎ দেখে খুশী হয়েছিলেন। এখন ইমাম সাহেব নিজের উদ্দেশ্য আরও এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে তাঁকে ফিসফিসিয়ে বল্লেন ঃ আজ এঁকে দিয়েই ইমামতি করান হোক।

খোৎবার সময় হলে চৌধুরী আমানৎ খাঁ জামা'তকে সম্বোধন করে বল্লেন ঃ আমার ইচ্ছে ইমাম সাহেবেরও ইচ্ছে, আজ এই আগন্তুক জুমা'র খোৎবা দিন এবং জামা'তে ইমামতি করুন। তবে, তার আগে তাঁর বংশ-পরিচয় জানা দরকার। আজকাল দূর প্রবাসে রওয়ানা হলে নিয়ম হলো—লোকে নিজের 'হাসব-নসব' সঙ্গে করে নেন। আমরা আশা করি আগন্তুকের সাথেও তাঁর 'হাসব-নসব' রয়েছে ?

আবদুর রহীম খাঁ মাথা নেড়ে দিয়ে বল্লেন ঃ জী, হ্যাঁ।

চৌধুরী আমানৎ খাঁ এবার আদেশ কর্লেন ঃ আগন্তুক সেটা জামা'তের সামনে পেশ করুন।

বস্তুতঃ তৎকালের রেওয়াজ অনুযায়ী আবদুর রহীম খাঁ সঙ্গে নিজের 'হাসব-নসব' বা বংশ পরিচয়ের কাগজ-পত্র বহন করছিলেন। তিনি সসম্মানে সেগুলো চৌধুরী সাহেবের হস্তে অর্পণ কর্লেন। তিনি সেগুলো এক নজর দেখেই বল্লেন ঃ কী আশ্চর্য! আপনি হুলাইনের মূসা খাঁর ভাতুষ্পুত্র ? এতক্ষণ বলেন নাই কেন ? আপনারা যে আমাদের সমান ঘর!

অতঃপর তিনি আবদুর রহীম খাঁকেই আদেশ কর্লেন খোৎবা দিতে এবং ইমামতি কর্তে। এইবার আবদুর রহীম খাঁর এলহান এবং ক্বেরা'ৎ শুনে তিনি আরেক দফা মুগ্ধ হওয়ার সুযোগ পেলেন।

নামাজের শেষে চৌধুরী আমানৎ খাঁ আবদুর রহীম খাঁর পিঠে হাত বুলিয়ে বল্লেন ঃ মা'শা'ল্লাহ্! আমি বড় খুশী হয়েছি। তবে, আমার অনুরোধ ঃ আপনার আর ঢাকা গিয়ে কাজ নেই। এখানেই আমাদের কন্য হারী বিবিকে পড়াবেন। আমরা বেতনও বেশী দেব, আমাদের সরকারে আপনার একটা বিশিষ্ট পদও থাকবে, সে বাবৎও আপনার পৃথক মাসহারা নির্দ্দিষ্ট থাকবে, আর আপনাকে বাড়ি কর্তে পারেন এরূপ জমীও দেওয়া হবে। ঢাকার সেই আমীর আমার বন্ধু-স্থানীয়। আমি তাঁকে চিঠি দিচ্ছি। তিনি আপনার উপর আর কোন দাবী চালাবেন না।

আবদুর রহীম খাঁ হারী বিবির গৃহ-শিক্ষক হয়ে মীরসরাইতে রয়ে গেলেন। আরও দশ বছরে হারী বিবির যে রূপের আর যৌবনের কলি অনেক খানি ফুটেছিল তা' আমরা সচ্ছন্দে অনুমান করতে পারি।

www.pathagar.com

এক পরিপক্ক যুবক—তাঁর স্ত্রীর প্রয়োজন ছিল। এক উদ্ভিন্ন যৌবনা বালিকা—তাঁরও স্বামীর প্রয়োজন ছিল। সে কালে এগার-বার বৎসর বয়সেই বিয়ে হয়ে যেতো মেয়েদের। দু'জনার মধ্যে যে পূর্বরাগের সঞ্চার হয়েছিল তাও নিঃসন্দেহে বলা যায়।

কিন্তু, বিয়ে হতো পার্লোনা। কারণ, সেকালে বিচ্ছিন্নবাদিতা শরাফতীদের প্রধান লক্ষণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। 'দাঁদাঁরিয়া', 'চট্টগ্রামী' আর 'রোসাঙ্গী'—চট্টগ্রাম অঞ্চলে মুসলমানদের মধ্যে মোটামুটি এই তিনটা 'ছেগা' দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। চট্টগ্রামীদের মধ্যে আদৌ কিছু আরব রক্ত ছিল। কিন্তু তিন ছেগাই পুষ্ট করেছিল ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দে হিজরতের পর গৌড়াগত সমাজ। হয়তঃ একই পরিবারের এক ভাই গিয়েছিল দাঁদাঁরা (আধুনিক নোয়াখালীর বোসের হাট প্রভৃতি অঞ্চল), এক ভাই এসেছিল চট্টগ্রাম, এক ভাই আশ্রয় নিয়েছিল রোসাঙ্গ বা আরাকানে—এখানে রাজা ছিল বৌদ্ধ মগ, দরবার ছিল গৌড়ীয় মুসলমান। এখন এই তিন ছেগার মধ্যে এমন বিদ্বেষ জন্মে গিয়েছিল যে একে অপরের সাথে বিয়েতে আবদ্ধ হতো না। এই বিষ থেকে সে কালের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী-গুণী হামিদুল্লা খাঁ পর্যন্ত নিজেকে মুক্ত রাখতে পারেননি। তিনি নিজেকে দাঁদাঁরিয়া গণ্য করে তাঁর "আহাদিসুল খাওয়ানিন আওর তারিখে চাট্‌গাম" গ্রন্থে দাঁদাঁরিয়ার প্রশস্তি গেয়েছেন, চট্টগ্রামীদের অজস্র নিন্দা করেছেন।

অথচ, তাঁর পীর সুফী নুর মোহম্মদ (মৃত্যু ১৮৬১) এবং তস্য সমকর্মী মাওলানা এমামুদ্দীন (১৭৮৮-১৮৫৯) এই কোন্দল দূর করে সকল মুসলমানদের মধ্যে বিয়ে-শাদী চালু করার জন্যে প্রাণপাত করেছিলেন।

আবদুর রহীম খাঁ চল্লিশ বৎসর বয়সে হুলাইন গিয়ে বিয়ে করে বৌ নিয়ে এলেন। হারী বিবি আর স্বামী গ্রহণই কর্লেন না। অথচ, একশ বছরেরও বেশী কিছু বেঁচেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর চৌধুরী কাদের ইয়ার খাঁর সম্মানিত বংশ একেবারে নির্বংশ হয়ে গেল। বাকী খাজনার দায়ে চট্টগ্রামের বৃহত্তম তরফ 'আমানৎ দেয়ানৎ' নীলামে উঠলো। চট্টগ্রামে ও ঢাকায় যাচাই করে এর খরিদ্দার পাওয়া গেলনা। অবশেষে কলিকাতার ঘোষালেরা এটা কিনে আনলে, বিচ্ছিন্নবাদিতার ফল হলো এই।

www.pathagar.com

সাপ সংগী

আষাঢ় মাস চলছে। অনবরত বর্ষণ হচ্ছে। এই বর্ষণে সাপ-খোপের বড়ই কষ্ট হয়। তাদের গর্ত পানিতে ডুবে যায়। আশ্রয়ের সন্ধানে বেরিয়ে তাদের যে কোথাও মাথা গুঁজে পড়ে থাকতে হয়।

একবার এক কেউটে এভাবে আশ্রয় নিয়েছিল এক গেরস্থের লাকড়ি ঘরে। একটা মাচা, তার উপর রয়েছে চাল। মাচায় জ্বালানী কাঠের সঞ্চয় থাকে। এরই নাম 'লাকড়ি ঘর'।

ঘটনাটা ঘটেছিল নোয়াখালীর ফুলগাজীর সন্নিকট কোন গ্রামে ১৯২৪ সালে। আমি তখন ফুলগাজীর সাব-রেজিষ্ট্রার। বৌ এসেছিল জ্বালানী টানতে। তখন সন্ধ্যে। সে টানে কেউটের গায়ে চোট্ লাগে। সে ফোঁস করে উঠে। মানে—খবরদার! বৌ কিন্তু খেয়াল করেনি। কেউটের রাগ থেকে যায়।

রাত্রে খাওয়া দাওয়া করে শুয়েছিল তিনটি প্রাণী একই বিছানায়। বৌ মাঝখানে, এক পাশে স্বামী, অপর পাশে তার শিশু-কন্যা।

নিশীথ রাতে তারা অঘোরে ঘুমাচ্ছিল। বৌয়ের শাড়ী এক পায়ে হাঁটুর উপরে উঠে গিয়েছিল। কেউটে ঢুকে এ পাশের স্বামীকেও রেহাই দেয়, ও পাশের শিশু কন্যাকেও রেহাই দেয়, মাঝখানে বৌয়ের অনাবৃত উরুতে ছোবল দিয়ে সরে যায়। সরে যায় সেই লাকড়ি ঘরে নয়, অন্য কোথাও অন্য আশ্রয়ে। তার গর্ত হারানোর প্রতিহিংসার বিষ সে ঢেলে দিয়েছিল বৌ-এর উরুতে।

তাকে বাঁচান আর সম্ভব হয়নি।

... ...

আমার চট্টগ্রাম। 'এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি।' ৭০ বৎসর পূর্বে যখন আমি শিশু তখন আমরা একই সঙ্গে বাস করছিলুম—মানুষ, সাপ, বাঘ, হাতী। এরা সব মহীয়ান প্রাণী। শেয়াল প্রভৃতি ইতর প্রাণীর কথা না-ই বল্লুম।

সাপ সম্বন্ধে আমার তখনো ধারণা হয়নি। এমন সময় রোমাঞ্চকর এক কাহিনী লোক

www.pathagar.com

মুখে ভেসে আসল পাশের ফতেয়াবাদ থেকে। আমাদের পারিবারিক আসন ছিল ফতেপুর গ্রামে।

বেগমজানের মার ছিল একটা ছাগী। তিনি 'ছড়ার কূলে' একটা খোলা-জায়গায় চরতে দিয়েছিলেন তাঁর ছাগীকে। চট্টগ্রাম পাহাড়ী স্রোতস্বিনীকে বলে 'ছড়া'।

তিনি ছাগীর গলায় রসি দিয়ে, সে রসি আটকে দিয়েছিলেন মাটিতে পোঁতা খুঁটির সাথে—যেন ছাগীটি খুঁটির চার দিকে ঘুরে ঘুরে চরতে পারে। অথচ হারিয়েও না যায়।

কিন্তু কিছুক্ষণ পরে এসেই দেখেন ঃ ছাগীটা কোথাও নেই। নেই ? গেল কোথায় ? খুঁটি আছে, খুঁটিতে বাঁধা রসিও আছে। কিন্তু ছাগীটাকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না।

রসিকে অনুসরণ করে তাঁর দৃষ্টি নেমে গেল ছড়ায়। যা দেখলেন তাতে তাঁর গায়ের রক্ত ভয়ে জমে গিয়ে হিম হয়ে যাওয়ার উপক্রম।

রসির মাথায় ছাগী নেই। কিন্তু রসি গিলে শুয়ে আছে প্রকাণ্ড এক সাপ। এত প্রকাণ্ড—ছাগীটা সে বেমালুম আস্ত গিলে বসে আছে আর শায়িত দেহ তার বাঁধ হয়ে গিয়ে স্রোতের পানিকে প্রায় হাত খানিক ফুলিয়ে রেখেছে।

তাঁর আর্ত চিৎকারে পাড়ার লোক জমে গেল—তার মধ্যে সাহসী মানিক চৌকিদারও।

মানিক চৌকিদার বল্লে ঃ চন্দ্রপোড়া দেখছি। (সাপটির সারা গায়ে পোড়া চাঁদের ছাপ। এগুলি এক শ্রেণীর অজগর। ঢলের পানিতে পাহাড় থেকে নেমে আসে।)

মানিক চৌকিদার ঝাড় থেকে একটা বাঁশ কাটালে। সে বাঁশের সাহায্যে কায়দা করে সাপটার গলায় একটা ফাঁস পরিয়ে দিয়ে সেটাকে খিঁচে শক্ত রসির সাহায্যে সে অজগরকে বেঁধে ফেল্লো।

সূচনাতেই সাপটা ছাগীটাকে উগ্‌রে দিলো। তবে, ততক্ষণে ছাগীটা তার মুখের ভিতর 'কাই'তে পরিণত হয়ে গিয়েছিল।

সাপটা গা ফুলিয়ে ফাঁসটাকে ফাঁসিয়ে দেওয়ার চেষ্টা কর্লে। কিন্তু রসির দুই মাথা থেকে দুই দল জোয়ান তাকে এত জোরে আকর্ষণ করলে যে সে বরং আরও শক্ত করে আটকে গেল।

তারপর সাপটাকে বাড়ী বাড়ী নিয়ে গিয়ে দেখান ও পয়সা তোলা।

মুখ বন্ধ করে ফেল্লে অজগর আর কিছুই কর্তে পারে না। অজগরটা যখন মরণাপন্ন তখন মানিক চৌকিদার তাকে কেটে তার পিত্ত নিয়ে নিলো। পিত্ত শুকিয়ে চূর্ণ করে মানুষের নানা রোগে ঔষধ স্বরূপ ব্যাবহার করা হয়।

লোকে বলাবলি কচ্ছিল ঃ এত বড় সাপ, একটা লোক অনায়াসে তার পিঠের উপর শুয়ে থাকতে পার্বে। সাপটা দেখার আমার খুব সাধ ছিল। কিন্তু তখন আমি খুব ছোট।

www.pathagar.com

নজরুল প্রেক্ষা

আমি বাঙ্গালী পল্টনে নাম লিখিয়েছিলাম। ১৯১৬ সালে আমি ম্যাট্রিক পাস করি। কলেজে নাম লেখাই, আমার বিয়ে হয়, আমি কলেজ ছেড়ে দেই।

আমি অগ্রণী ছাত্রদের একজন ছিলুম।

প্রমোশন হয়ে গিয়েছিল। কিছু অগ্রণী ছাত্র-বন্ধু আমাদের বাড়ীতে আমাকে দেখতে এলো। তাদের সঙ্গ পেয়ে আমার ক্ষোভ জাগল 'হায়, হায়, জীবনে আর এদের নাগাল পাওয়া যাবে না!' আমি বুদ্ধি কর্তে লাগলুম ঃ কিরূপে পড়ায় কম হয়েও আমি এদের সমকক্ষতা কর্তে পারি। তার উপায় মনে হয়েছিল পল্টনে নাম লিখান।

বৈদিক, সনাতনী আর হিন্দু একার্থক হয়ে গিয়েছিল। এদের কিছু ব্রাহ্মণ, কিছু বৈদ্য ও 'আলাছ' কায়স্থ মিলে লেখা-পড়ার পেশার একটা মনোপলী সৃষ্টি করেছিল। কালক্রমে এরা একটা 'কেরানী সভ্যতা' সৃষ্টি করে বসে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এদের প্রতিষ্ঠা খুব বাড়িয়ে দেয়।

এরা দেশকে 'ভদ্র' ও 'ইতর'-এ ভাগ করে ফেলে। 'ভদ্র লোক' মানে তারাই। আর সব 'ইতর লোক'। কালক্রমে এরা বাঙ্গালী ও ভদ্রলোককে একার্থক করে ফেলে। এদের একজন বলেছেন 'অর্থাৎ আর্যীভূত হিন্দু'। সুতরাং, নিকৃষ্ট হিন্দুরা, বৌদ্ধরা এবং মুসলমানরা বাঙ্গালী নয়।

প্রশাসন 'বাঙ্গালী'কে অসামরিক রূপে চিহ্নিত করায় এরা ক্ষুব্ধ ছিল। সুতরাং, বাঙ্গালীকে 'সামরিকতা'র অধিকার দেয়ার জন্যে এরা আন্দোলন জুড়ে দেয়।

কিন্তু, বঙ্গদেশের অধিবাসী মাত্রেই নিজেকে মনে কর্তো বাঙ্গালী। সুতরাং সামরিকতার অধিকার দেয়া হোক এই দাবীর পেছনে এদের সকলেরই সায় ছিল। আর, প্রশাসনও মনে কর্তো যে বঙ্গদেশের অধিবাসী মাত্রই বাঙ্গালী।

১৯১৭ সালের প্রথমেই মেসোপটেমিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে বৃটেনের এক দারুণ বিপর্যয় ঘটে।

বৃটেনের প্রতিভা ছিল ঃ অধীন জাতিদের লোকদের দিয়ে নিজের সাম্রাজ্যিক যুদ্ধ

www.pathagar.com

করাতে পার্তো। অর্থাৎ কলোনিয়েল আর্মী। এই রকম একটা মিশ্র বাহিনীকে কমাণ্ড করছিলেন বৃটেনের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় এক জেনারেল ঃ টাউনসেণ্ড্। এই যুদ্ধের রসদ ও সাজ-সরঞ্জাম যোগাচ্ছিলেন ভারত সরকার। কিন্তু, টাউনসেণ্ড্ বস্রায় অবতরণ করে তুর্কীদের সব বাধা অগ্রাহ্য করে (তখন মেসোপটেমিয়া বা ইরাক ছিল তুর্কীর সাম্রাজ্যভুক্ত) এমন জোরে মার্চ করে এগিয়ে যান যে বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জের সরকার উহার সহিত রসদ সরবরাহের পাল্লা রাখতে অসমর্থ হন। ফলে কূট-আল-আমারায় পৌঁছে টাউনসেণ্ড্ খাদ্যাভাবে তাঁর বিপুল বাহিনী সহ তুর্কীর হাতে আত্মসমর্পণ কর্তে বাধ্য হন।

এর প্রতিক্রিয়া হয় দারুণ। পাঞ্জাবে সৈন্য-বাহিনীতে আরও লোক ঢোকানোর জন্য জবরদস্তি চালান হয়। নূতন পরিস্থিতিতে বাঙ্গালীদেরও একটা পল্টন গঠন কর্তে দেওয়া হয়।

আমি পল্টনে নাম লিখিয়ে এপ্রিল মাসেই উহার হেড্ কোয়ার্টার করাচী পৌঁছে যাই এবং মাসেকের মধ্যেই মেসোপটেমিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরিত হই।

করাচী হেড্ কোয়ার্টারে আমি কুমার অধিক্রম মজুমদারকে দেখি। তিনি যশোরের রায় বাহাদুর যদুনাথ মজুমদার সি-আই-ই'র পুত্র। নিজে এম্-এ, বি-এল্ এবং কলিকাতা হাই-কোর্টের য়্যাড্ভোকেটের কাজ ছেড়ে পল্টনে যোগ দিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন কেরানী সভ্যতার মানুষ যার কাছে বাঙ্গালী মানেই ভদ্রলোক।

এখন তিনি আঙ্গুল আস্ফালন করে আমাদের বলতে লাগলেন 'বাবা, তোমরা মুসলমানেরা কেন এলে ?'

অবস্থা এই ছিল যে বাঙ্গালীর প্রথম উচ্ছ্বাসেই শোনা গিয়েছিল ঃ অনেকের বড় বড় নাম। শেষ পর্যন্ত এঁরা প্রায় সকলেই কেটে পড়েছিলেন। কিন্তু, মুসলমানদের যেই কথা সেই কাজ। আমি করাচী পৌঁছে দেখি যে জমাদার (অর্থাৎ, একটা পদবী পেয়ে গেছেন) নওয়াব কে (খাজে) হাবিবুল্লাহ্ মাটিতে লুটিয়ে পড়ে একদল সৈন্যকে মাস্কেট্রি ড্রিল শেখাচ্ছেন।

আমি যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরিত হওয়ার পর পরই সিয়ারসোল রাজ স্কুলের পড়া ছেড়ে পল্টনে নাম লিখিয়ে নজরুল করাচী ডিপোতে পৌঁছেছিলেন।

পল্টন মোটামুটি যুদ্ধে চলে যাওয়ায় করাচী এষ্টাবলিশমেন্টকে বলা হতো ডিপো।

১৯১৯ সালের মাঝামাঝি যুদ্ধ-বিরতি হয়ে যায়। তখন লটারী করে আমাদের কতক লোককে বাড়ী ঘুরে আসার ছুটি দেওয়া হয় মাস তিনেকে।

আমাদের তাঁবুর এই ছুটি পেয়ে যায় মনোরঞ্জন দাস—হবিগঞ্জের এক স্কুল মাষ্টার রাজকুমার দাসের ছেলে।

কুমার অধিক্রম মজুমদারের 'বাবা, তোমরা মুসলমানেরা কেন এলে ?' আক্ষেপের পর কুমার অধিক্রম মজুমদার ক্রমে ক্রমে আমার লেখা-পড়ার অত্যন্ত ভক্ত হয়ে উঠেন এবং আমি সব মহলে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠি।

www.pathagar.com

মনোরঞ্জন ছিল অত্যন্ত অসাধারণ ছেলে। আমি ছিলাম তার ফ্রেণ্ড, ফিলজফার য়্যাণ্ড গাইড্। অথচ, কিরূপে আমাকে হারাবে সেটাই ছিল তার একান্ত সাধনা। এজন্যে পকেট ডিক্শনারী মুখস্থ করে ফেলে এবং সকলের সামনে আমাকে অতপ্রস্তুত কর্তে পার্লে তার আনন্দের সীমা থাকতোনা।

পল্টন থেকে আসা যাওয়া কর্তে হতো করাচী ডিপোর মাধ্যমে।

মনোরঞ্জন পল্টনে ফিরে এসে বলে ঃ করাচীতে দেখে এলাম হাবিলদার কাজী সাহেবকে ঃ আকাশের সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছে তাঁর গলা, সামনে হার্মোনিয়াম বাজিয়ে গেয়ে চলেছেন গানের পর গান, আর খাচ্ছেন কাপের পর কাপ চা, খিলির পর খিলি পান।

সিয়ারসোল স্কুলে পড়ার সময়ই নজরুলের অসামান্য প্রতিভা ছড়িয়ে পড়তে থাকে। তিনি সব রকম গণ্ডি ভেঙ্গে বেরিয়ে আসেন। শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ছিলেন তাঁর সহপাঠী।

বাঙ্গালী গান-প্রিয় জাতি। করাচী থেকে বান্দ্রা জাহাজে আমরা যখন বম্বা আসছিলাম তখন গানের পর গান আমাদের মাতিয়ে রেখেছিল।

করাচীতে নজরুল-প্রতিভা এক দিগ্বিজয়ের আকার নিয়েছিল। তাঁকে খাটাবে কি, শাসন কর্বে কি—সে সব কথা কারু মনে হয়নি। তাঁকে কোয়ার্টার মাষ্টারের বিভাগে আসীন করে দিয়ে তাঁরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেল্লেন।

এই বিভাগের কাজ হলো থাকার, খাওয়া-পরার, স্বাস্থ্য রক্ষার, চিকিৎসার বন্দোবস্ত। এদের প্যারেড কর্তে হয়না—যদিও সাজ-পোশাক, গুলি-বন্দুক ঠিকই আছে। শুধু কালে ভদ্রে যদি কখনও 'জেনারেল ফল ইন' হয় ধরা-চূড়া পরে এদেরও তার শামিল হতে হয় আর তখন তাদের পা মেলেনা, কাঁধ মেলেনা—সারা পল্টনে হাসাহাসি হয়। নজরুল ল্যান্স্ নায়ক হন। নায়ক হন, যথাকালে হাবিলদার হন।

কিন্তু, ইতিমধ্যেই সর্বজয়ী কবির অঞ্জন লেগে গেছে তাঁর চোখে। করাচী ডিপো হয়ে উঠলো তাঁর পীঠ। তাঁর দেহ করাচীতে থাকলে কি হবে, তাঁর অলোক-সামান্য প্রতিভার এক বিস্ময়কর মহাজাগরণ ঘটলো বীর-রসে। মানসচক্ষে তিনি ঘুরে বেড়ালেন শাতিল আরবের যুদ্ধক্ষেত্রে (অর্থাৎ মেসোপটেমিয়ায় যেখানে আমি যুদ্ধরত ছিলুম), তুর্কীর রণ-ক্ষেত্রে আনওয়ার পাশা ও কমালে পাশার সাথে এবং ভার্দুন-ট্রেঞ্চে মিত্র-বাহিনীর সাথে।

তিনি আমার পরে পল্টনে ঢুকে করাচী যান। আমি এক নাগাড়ে তিন বৎসর মেসোপটেমিয়ার যুদ্ধ-ক্ষেত্রে থাকি। ১৯২০ সালের পূর্বে আমাদের প্রত্যাবর্তন সম্ভব হয় নি। এদিকে যুদ্ধ-বিরতির পর পল্টন ভেঙ্গে দিলে হাবিলদার কাজী নজরুল ইসলাম ১৯১৯ সালে কলিকাতায় ফিরে এসে উঠলেন 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি'র অফিসে। সুতরাং, পল্টন-জীবনে তাঁর সঙ্গে আমার চাক্ষুষ পরিচয়ের কোন সুযোগ হয় নি।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন বলেছিলেন ঃ নজরুল বাঙ্গলার তারুণ্যের প্রতীক।

নজরুল বাঙ্গালীর মুসলিম মানসকে রফ্ত করেছেন। তার কথা, তার গান, তার ভাব ও প্রতিম তাঁর লেখায় অবলীলায় খেলে যায়।

www.pathagar.com

তিনি বাংলার সাকারবাদী মানসকে রফ্‌ত করেছেন। কালী (শ্যামা) তাঁর কবিতায় ও গানে মূর্ত হয়ে উঠতে পারে।

এখন 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি'র অফিসই হয়ে উঠলো তাঁর পীঠ-স্থান। তিনি নিজেকে প্রকাশ কর্তে লাগলেন অজস্র ধারায়—গানে, কবিতায়, সাহিত্যে, কর্মে এবং তাঁর প্রাণ-বন্যার অপরূপ স্পর্শে। তিনি সব রকম সংকীর্ণতা ও বন্ধনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা কর্লেন।

আমরা ভাইদের মধ্যে আমার সাত বছরের ছোট দিদারুল আলম ছিল কবি ও সাহিত্যিক হিসেবে সব চেয়ে প্রতিশ্রুতিশীল। কিন্তু, সে গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনে সত্যকার ভাবে সাড়া দিয়ে সরকারী চট্টগ্রাম মাদ্রাসা থেকে বেরিয়ে আসে চট্টগ্রামে বিচিত্র অভিজ্ঞতার পর সে গিয়ে উঠে কলিকাতায় নজরুল পরিবেশে। নজরুল তার প্রতি অত্যন্ত স্নেহশীল হয়ে উঠেন এবং ঐ পরিবেশের আবদুল কাদির, খান মোহম্মদ মঈনুদ্দীন, তাঁর স্ত্রী রহিমা বেগম এবং অপরাপরের সাথে সে গভীর অন্তরঙ্গ ভাবে পরিচিত হয়।

চট্টগ্রামে মাদ্রাসায় অধ্যয়ন-কালে আবুল ফজল ছিল দিদারের সহপাঠী ও বন্ধু। তখন থেকে আমাদের বাড়িতে আবুল ফজলের আগমন একটা সচরাচর ব্যাপার হয়ে উঠে।

এদের সমবয়সী হাবিবুল্লাহ বাহার তখন চট্টগ্রাম মিউনিসিপ্যাল হাইস্কুল থেকে খ্যাতির পথে। দিদারের সাথে তারও বিশেষ অন্তরঙ্গতা জমে উঠে। দিদারের মেজদা বলে বাহারও সেই থেকে আমাকে মেজদা ডাকতো।

জসীমুদ্দীনের চিঠি আসতো দিদারের কাছে তাদের গ্রামের বাড়ি থেকে। আমার মনে হয় জসীম তখনও গ্রাম ছেড়ে শহরে চলে আসেনি। জসীমের সঙ্গে ১৯৪৬-এর পূর্বে আমার চাক্ষুষ দেখা হয় নি। জসীম আমাকে বরাবরই বড় ভাই বলে ডাকতো।

যাই হোক, ১৯২৮ সালের শেষ ভাগে বাহার ও দিদারের উদ্যোগে নজরুল চট্টগ্রাম আসেন এবং চট্টগ্রাম শহরে বাহারদের তামাকু মুণ্ডীর বাড়ীতে উঠেন।

হাবিলদার বেশে নজরুলের ছবি এবং তাঁর অজস্র কবিতা ও গান তখন বাংলার ঘরে ঘরে সুপরিচিত। সেই সঙ্গে এই ধারণাও জন্মে উঠেছিল যে নজরুল তো বাঙ্গালী পল্টনে ছিলেনই, অধিকন্তু শাতিল আরব, তুর্কীর রণক্ষেত্র, ভার্দুন-ট্রেঞ্চ সব দেখে এসেছেন।

আমি তখন চট্টগ্রামে কালিপুরের সাব-রেজিষ্ট্রার। নজরুলকে দেখতে যাই। মাহ্‌বুব দেখা কর্তে এসেছে জেনে নজরুল উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেন। কিন্তু, আমাদের যখন চোখাচোখি হলো এটা কারো দৃষ্টি এড়ালোনা যে নজরুল একটুখানি অবাক হয়ে গেছেন। কারণ যে মাহ্‌বুবকে দেখবেন বলে তিনি মনে করেছিলেন এ সে মাহ্‌বুব নয়।

আমার মনে হয়, ইরাকের যুদ্ধ-ক্ষেত্রে যাদের প্রায় তিন বছর কেটেছিল তাদের প্রতিনিধি স্থানীয় কারো সাথে নজরুলের তখনো সংযোগ ঘটেনি। কুমার অধিক্রম মজুমদার ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হয়ে কর্মরত ছিলেন। কলিকাতার আর কাউকে আমি দেখছিনা যিনি নজরুল পরিবেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন।

www.pathagar.com

এই সময় নজরুলের লেখা অনুযায়ী অনেকেই তাঁর বাস্তব জীবন ধরে নিয়েছিলেন। এরূপ যাঁরা লেখা-পড়া করেছিলেন তাঁদের মধ্যে মীজানুর রহমানও ছিলেন (ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও সরকারী উচ্চ কর্মকর্তা)। তিনিই সর্ব প্রথম প্রকৃত অবস্থা আমার থেকে জেনে নেন এবং এটাকে প্রতিষ্ঠিত কর্তে বেশ কিছু সময় লেগেছে।

তামাকুমুণ্ডী থেকে দিদার নজরুলকে ২৫শে জানুয়ারী ১৯২৯ আমাদের ফতেয়াবাদ বাড়ীতে নিয়ে উঠায়। খাগরিয়া ছড়ার পাশে আমাদের বাড়ী। এই অঞ্চল সুপারী বাগানের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল।

আমাদের বাড়ীর সম্মুখের অংশই ছিল একটা সুপারী বাগান। আমাদের দেউড়ি ছিল ছোট্ট বাঁশের ঘর। নজরুলকে এইখানে রাখি। আমরাও থাকি।

জ্যোৎস্না রাতে সুপারী বাগানে এক আশ্চর্য দৃশ্য দেখা যায়। প্রত্যেক সুপারী গাছে লেপ্টে থাকে রূপার প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সাপ—সুপারী গাছ যখন ধীরে ধীরে মাথা দোলায় এই প্রকাণ্ড সাপগুলি যেন সজীব হয়ে খেলা কর্তে থাকে।

রাত্রে খিড়কি খুলে নজরুল এই খেলা দেখতে পান এবং একেবারে তন্ময় হয়ে যান। অস্ফুটে শুধু উচ্চারণ কর্তে থাকেন 'আ-হা-হা, কি দেখলাম!' 'আ-হা-হা, কী দেখলাম!'

নজরুল কথা-বার্তায় পরিবেশ জমিয়ে রেখেছিলেন। 'সওগাত'-এর নাসিরুদ্দীনকে বার বারই উল্লেখ করছিলেন 'কবন্ধ উড্ডীন' বলে! আর, অনবরত কাগজে আঁচড় কেটে পূর্ণ করে তুলছেন কবিতায় ও গানে। পরে সেখান থেকে কবিতা 'বাতায়ন পাশে গুবাক তরুর সারি' বের করে আমাদের মাতামহীকে (নানীকে) নজরুল একদম মুগ্ধ করে ফেলেন। গাঁয়ের মানুষ হলেও রূপসী, রাঁধুনী এবং মোক্তবের তিন পুরুষের শিক্ষয়িত্রী রূপে তাঁর প্রতিষ্ঠা অসাধারণ। বয়স হলেও তাঁর সত্তা ছিল কৌতূহল বিস্ময়-রস রঞ্জিত।

পুকুর থেকে মাছ তোলা হয়েছিল। তাজা মাছ খেয়ে নজরুল অত্যন্ত খুশী হন। পাশে বসে আমাদের বিড়ালটি ম্যাও ম্যাও করছিল। নজরুল মন্তব্য ছুঁড়ল 'দেখ, আমরা পঞ্চপাণ্ডব খেতে বসেছি আর এ যেন এক মডারেট। বলছে, কিছু উচ্ছিষ্ট কাঁটা-কুটা দাও, খুশী হয়ে চলে যাই।'

গুণে দেখি, আমরা পাঁচজনই বটে ! আর, তখনকার রাজনীতি আবর্তিত হচ্ছিল মডারেট আর এক্সট্রিমকে কেন্দ্র করে।

নজরুল আসার পরের দিন স্কুল-কলেজের শিক্ষক-অধ্যাপক ও সমমনা ব্যক্তিদের দলে দলে আগমনে আমাদের বাড়ী সরগরম হয়ে উঠে। সম্ভবতঃ পরের দিনই আলম পরিবারের পক্ষ থেকে নজরুলকে দেওয়া হয় অভিনন্দন।

কবি নজরুল ইসলাম
কর কমলেষু

হে সৈনিক কবি,

তোমার অগ্নিবীণায় যেদিন বিদ্রোহের সুর ঝংকার দিয়ে উঠেছিল সেদিন এই সুদূরে

www.pathagar.com

আমরা কটি ভাই তোমায় আমাদের অন্তর-স্থলে বরণ করেছিলাম। সেদিন তোমার বহ্নি -ক্রীড়ার মধ্যে তোমায় আমরা চিনেছিলাম। আজ তোমার 'বুলবুল'-এর গানেও আমরা তোমায় চিনেছি—তুমি আমাদের অতিকালের চেনা, আমাদের চির-চপল সহযাত্রী। অভিনন্দন জানাবো না বন্ধু। শুধু তোমায় বুকে ধরে অন্তরের গোপন কথাটি শুনিয়ে যাবো।

হে ব্যথার কবি,

মানব মনের শাশ্বত বেদনা তোমার নিপুণ তুলিকায় যে অনুপন রূপ পেয়েছে, বাঙলা সাহিত্যে এর তুলনা নেই। ব্যথা বিষে নীলকণ্ঠ কবি তুমি। ব্যাথার উদ্বোধন করতে যেয়ে তোমাকে যে বিষ গলাধঃকরণ করতে হয়েছে তাই ললাটে জয়টিকা হয়ে ফুটে উঠেছে। ভয় নেই বন্ধু, বাঙলায় তুমি যে তরুণদলের সৃষ্টি করেছ তাদের ললাট তোমার জয়টিকার জ্যোতিতে ভাস্বর হয়ে উঠেছে। কারবালা প্রান্তরে বীর হোসেনের আত্মা তোমার হায়দরী হাঁকে আবার জেগেছে যেনো—এরা শির দেয় তবু আমামা দেয় না। বন্ধু, ভোঁতা হয়ে গেছে সীমারের খঞ্জর, তরুণের অরুণ আভায় তার প্রায়ান্ধ আঁখি ঝলসিয়ে গেছে।

হে সর্বহারার কবি,

মানুষের বেদনার আহ্বানে তুমি ঘর ছাড়া হয়ে বেরিয়ে এসেছ। তোমার সর্বহারার গানে যে তীব্র বিষের ফেনা উপছে উঠেছে সে বিষ আমাদেরই অন্তর ছেঁচা ধন বন্ধু। তোমার অনুপম ভঙ্গীতে তাকে তুমি আমাদের কাছে ফিরিয়ে দিয়েছ নতুন রূপে নতুন ছন্দে নতুন গানে।

শ্মশান আমাদের জন্মভূমি। হতমান আমাদের জাতি, ভীরু আমাদের সমাজ। তাদের সেই শক্তি নেই, সেই মন নেই যে তোমার সর্বহারাকে তার উপযুক্ত সম্মান দেয়। কিন্তু যে দেশে মানবতার জয়, যে দেশে স্বাধীনতার জয় সে দেশ তোমার সর্বহারাকে বুঝেছে। তাকে উচ্চে স্থান দিয়েছে। আজ বিজয়-গর্বে আমাদের বুক ফুলে উঠেছে। সারা বিশ্বে আজ তরুণের যে বিজয় অভিযান চলেছে বাঙলার তরুণ তাতে মোটেই পিছিয়ে পড়েনি।

হে প্রেমিক কবি,

তোমার প্রেম জীবন্মৃত বাঙলার পরতে পরতে যে শিহরণ তুলে দিয়েছে তার উপর ভিত্তি করেই এ জাতির উন্নয়নের বুনিয়াদ গড়ে উঠেছে। তোমার প্রেম বাঙলার সাহিত্যকে জগতের সম্মুখে মহীয়ান করে তুলেছে। এতো যে-সে প্রেম নয়। এই প্রেমের অবমাননা করলে তুমি স্রষ্টা ভগবানের বুকেও পদচিহ্ন এঁকে দিতে পশ্চাৎপদ নও। হে তেজস্বী তোমার প্রেম ভগবানের আসন ছাড়িয়ে আরো ঊর্ধ্বে উঠেছে—সে কোথায় কোন্ রহস্য-লোকে, হে ধেয়ানী সে তুমিই জান। আমরা শুধু নিরালা রাতে তারাখচিত আকাশে তাকাই। আর দেখি মহাশূন্যের বক্ষ ভেদ করে ছুটে আসে সে এক জ্যোতিষ্ক—বুকে যেন সুর-সুন্দরীর গজোমতির হারের উজ্জ্বল মণিটি, না কোন নিঘুম প্রিয়ার বিনিদ্র চোখের অশ্রুবিন্দু। জানি বন্ধু জানি, তোমার প্রেম পূজারিণীর সৃষ্টি করেছে। যে প্রেম তোমার সর্বহারাদের জন্য আঁখির জল ঝরায়। যে প্রেমের আহ্বানে তুমি নরক কবুল করতেও দ্বিধা করো না।

www.pathagar.com

তারি আকর্ষণে নভোস্থল দিয়ে ছুটে এই উল্কা, ফোটে ফুল, বহে নদী। বন্ধু, অতৃপ্ত তোমার পিয়াসা, তৃপ্তির অবসানে যেনো অভিশপ্ত না হয়।

হে প্রাণের কবি,

সোনার কাঠি রূপোর কাঠি ছুঁইয়ে ঘুমন্ত পুরীকে তুমি প্রাণ দিয়েছ। অসত্যের বিরুদ্ধে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে, অত্যাচারের বিরুদ্ধে তোমার যে অভিযান, তা সার্থক হোক, সুন্দর হোক, সফল হোক।

ফতেয়াবাদ
২৬শে জানুয়ারী, ১৯২৯ ইং

ইতি তোমারই
আলম পরিবার

নজরুল পরের দিনই চলে যান।

এরপর নজরুলের সঙ্গে আমার দেখা চট্টগ্রাম জেলার রাউজানে অনুষ্ঠিত এক সাহিত্য সম্মেলনে ১৯৩৩ সালে। এর মধ্যে দিদার মারা গিয়েছে ১৯২৯ সালের ২৮শে ডিসেম্বর এবং মাসিক মোহাম্মদীতে আমার 'পল্টন জীবনের স্মৃতি' ধারাবাহিকভাবে বের হওয়া শুরু করেছে।

দিদারের কবর ফতেয়াবাদে বড় রাস্তার পাশেই মসজিদ নিয়ে এক পুকুরের দক্ষিণ পাড়ে। নজরুল রাউজান যাওয়ার পথে সেটা জেনে নিয়ে গাড়ি থামিয়ে নেমে পড়ে দিদারের কবর 'জেয়ারৎ' করেন।

সম্মেলনে আমি, আবুল ফজল, কমালুদ্দীন আহ্‌মদ খাঁ এবং ওহীদ পৌঁছে নজরুলের দল পূর্ণ করি।

'পল্টন জীবনের স্মৃতি' নজরুল পড়ছিলেন। ওটার পথম অংশে করাচীর কিছু ঘটনা ছিল—যেটা আমার মেসোপটেমিয়ার যুদ্ধ-ক্ষেত্রে চলে আসার পর ঘটেছিল। নজরুল ওটার উল্লেখ করে আমার কিছু ভুল সংশোধন করে দেন।

আমরা সকলে নজরুলকে ঘিরে মঞ্চের উপর বসা ছিলাম। প্যাণ্ডেলে বহু লোক সমাগম হয়েছিল। হঠাৎ না বলা, না কওয়া এক ব্যক্তি উঠে দু কানে আঙ্গুল দিয়ে আছরের আযান ফুকারতে শুরু কর্লেন।

আমরা এর জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না। ওদিকে দেখতে দেখতে জামা'ত শুরু হয়ে গেল। অগত্যা আমরাও জামা'তে শামিল হয়ে দাঁড়ালুম।

আমি ও নজরুল পাশাপাশি। নজরুল প্রচুর পান খেতেন রসিয়ে রসিয়ে। নজরুল মুখ থেকে পান ফেলে মুখ ধোয়ারও সময় পাননি। তিনি নামাজে দাঁড়িয়েও মাঝে মাঝে পানের উপর দাঁতের চাপ দিচ্ছিলেন।

নজরুল তাঁর ভাষণে আমারও উল্লেখ করেন। বল্লেন ঃ বেচারী যুদ্ধের স্মৃতিটাকে

www.pathagar.com

কিছুতেই ভুলতে পারছেন না। স্মৃতিটা তার মানসে সব সময়ই টুং টুং কচ্ছে।

এটা সত্য। জীবনের সবচেয়ে 'মনে দাগ কাটে সময়' আমার কেটেছে যুদ্ধ-ক্ষেত্রে—উনিশ থেকে বাইশ যখন বয়স।

এর পরে সংসারের ফাঁস আমাকে চেপে ধরে। বাবা মারা গিয়েছিলেন ১৯২৮ সালে মোটর দুর্ঘটনায়। তারপর ১৯২৯ সালে গেল দিদার, বড় ভাই শামসুল আলম লেখা-পড়ার ব্যাপারে আমাদের সকলেরই চোখ ফুটিয়েছিলেন। কিন্তু সাংসারিক ব্যাপারে ছিলেন একদম অপটু। ১৯৩০-এর দিকে বার্মায় গিয়ে একরূপ নিরুদ্দেশের মত জীবন যাপন কর্তে থাকেন। তাঁর স্ত্রী ও ৫ সন্তানের সম্পূর্ণ ভারও আমার উপর চাপে। ১৯৩৪ সালে আমার প্রথমা বিবি এন্তেকাল করেন। ১৯৩৭ সালে আমাদের মা চলে যান, তবে তার আগেই ওহীদকে লেখাপড়া করিয়ে তার বউ আনতে পেরেছিলাম। ১৯৩৮ সালে বড় ভাই ভারতীয় মুসলমান বিরোধী দাঙ্গায় বর্মীদের হাতে নিহত হন।

নজরুল সাহিত্য পাঠ করা ছাড়া নজরুলের জীবন কিরূপে মস্তিষ্কের পক্ষাঘাত রোগে ক্রমে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ল দূর থেকে শোনা ছাড়া তার কোন খবরই আমি রাখতাম না।

সাহিত্য-চর্চা অবশ্যই কর্তুম, কিন্তু সংসারের ঘানি আমাকে ভীষণভাবে পেয়ে বসেছিল—ও বয়সে যা হয়।

১৯৫০ সালে আমি জেলা সাব-রেজিষ্ট্রার রূপে খুলনায় বদলী হই। ১৯৫১ সালটাও থাকি। কলিকাতার নিকট হওয়ায় আমার এই অবস্থান উল্লেখযোগ্য হয়ে উঠে। বাগেরহাট এক নজরুল জয়ন্তীতে আমাকে প্রধান অতিথি রূপে যোগ দিতে হয়।

এই অনুষ্ঠানে একজন সুশীল জানার এক প্রবন্ধ পড়েন। জানা বলছেন ঃ আমি রোগে বিপর্যস্ত কবিতে দেখতে গিছলুম। তাঁর কবিতার বই খুলে ধরেছিলুম। সে পাতায় উঠেছিল বাতায়ন পাশে গুবাক তরুর সারি। দেখেই নজরুল চিৎকার করে উঠলেন ঃ চট্টগ্রাম, চট্টগ্রাম।

এই কথা শুনে আমার চোখ দু'টি সজল হয়ে উঠলো। হায়, হায়, আমি তো নজরুলকে দেখতে যাইনি।

সেবার কলিকাতা গিয়ে নজরুলকে দেখতে গেলুম। সঙ্গে আমার বন্ধু কাজী আবদুল ওদুদ এবং কবি আবদুল কাদির।

শিশুকে যেমন স্নান করিয়ে, জামা পরিয়ে, মাথা আঁচড়িয়ে সিঁথি তুলে দিয়ে বসান হয় নজরুলকেও সেভাবে বসিয়ে দেয়া হয়েছিল। আর একরাশ ছুটা ছাপা কাগজ তাঁর সামনে দেওয়া হয়েছিল।

নজরুলের তখনকার জীবন ঃ কি যেন হারিয়ে গিয়েছে, তিনি তাই খুঁজে বেড়াচ্ছেন। খুঁজছেন ঐ ছাপা পাতায়। সেখানে না পেয়ে একটার পর একটা পাতা বাম পাশে জড়ো কচ্ছেন, সব পাতা এভাবে জড়ো হলে আবার বাম দিক থেকে দেখা শুরু করে এক এক খানা পাতা আবার ডান দিকে এনে জড়ো কচ্ছেন।

www.pathagar.com

আমাকে দেখেই তাঁর দু'চোখ প্রফুল্ল হাস্যে যেন উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। যেন চিনতে পেরেছেন। মুখ বিড় বিড় করে যেন কিছু বলবেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে যেন চোখ দু'টি মরে গেল। তিনি আবার পাতা উলটিয়ে খোঁজ কর্তে থাকেন। তাঁর হচ্ছে মস্তিষ্কের পক্ষাঘাত। প্রমীলা শুয়ে আছেন ইজি চেয়ারে। তাঁর নীচের অর্ধাঙ্গের পক্ষাঘাত। মুখখানি বিকশিত পদ্মের ন্যায় ফুটে আছে।

আমরা আম নিয়ে গিয়েছিলুম। প্রমীলা বল্লেন ঃ আজ আম দেবোনা, পেট খারাপ করেছে।

ছেলে (বোধ হয়, কাজী অনিরুদ্ধ) হাজির ছিল। কথায় কথা বল্লো ঃ খুব যখন রাগ হয় কবি 'চলে যাও' বলতে পারেন।

ওদুদ সাহেবের চেষ্টা হলো ঃ দেখা যাক, তাঁকে দিয়ে নাম লেখান যায় কি না।

ছেলে সামনে কাগজ ও কলম দিয়ে সাধতে লাগল ঃ বাবা, নাম লিখ। বাবা, নাম লিখ।

কবি যেন শুনেও শুনছেন না। হঠাৎ, কলম তুলে নিয়ে লিখলেন 'কাজী নজরুল ইসলাম' কাগজে কালি লাগল কি লাগলনা সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই।

ওদুদ সাহেব ধর্লেন ঃ ইংরেজীতে লেখাও।

ছেলে আবার কাগজ কলম সামনে রেখে সাধতে লাগল ঃ বাবা ইংরেজীতে লেখ। বাবা, ইংরেজীতে লেখ।

নজরুল যেন শুনেও শুনছেন না। হঠাৎ কলম তুলে নিয়ে লিখলেন ঃ Kazi Nazrul Islam। কাগজে কালি লাগল কি না লাগল এবারেও ভ্রূক্ষেপ নেই।

তাছাড়া, একটা দাঁত কিড়মিড় ভাব—যেন লিখলেন একান্ত অনিচ্ছায়।

ট্র্যাজেডী এখানেই। যাঁর কাগজ-কলম ছাড়া একটা ক্ষণও কাটতনা, সেই কাগজ-কলম তুলে নিতেই তাঁর একান্ত অনীহা।

বাহার মিঞা বহুদিন থেকেই বলে আসছিলেন, অসুস্থ কবিকে একবার সুইজারল্যাণ্ড দেখিয়ে আনবেন।

আমি বল্লুম ঃ সুইজারল্যাণ্ড না কোথায় সেটা আমরা বলার কে ? উপযুক্ত 'ডায়োগনোসিস' করে সেটা স্থির হতে হবে।

আমি ঢাকার 'আজাদ'-এ ক্রমান্বয়ে কয়েক সংখ্যায় আমার অভিজ্ঞতা ও বক্তব্য প্রকাশ করি।

কাজী আবদুল ওদুদকে সম্পাদক করে উভয় বঙ্গকে নিয়ে 'নজরুল নিরাময় সমিতি' গঠিত হয়। তখন পশ্চিম বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার বিধান চন্দ্র রায়। তিনি কবিকে পরীক্ষা করে দেখেন। মানসিক হাসপাতালেও তাঁকে পর্যবেক্ষণ করা হয়, অবশেষে য়ুরোপের কয়েকটে বিখ্যাত কেন্দ্রে দেখিয়ে আনা হয়। কিন্তু, রাহুর গ্রাস বাড়া ছাড়া মুক্তির কোন

www.pathagar.com

সন্ধান মিলেনি।

রাউজানের সম্মেলনে দিদারের মৃত্যু প্রসঙ্গে কবি বলেছিলেন, 'অল্প শোকে কাতর, অধিক শোকে পাথর, আমি পাথর হয়ে গেছি।'

২৬শে জানুয়ারী রাত্রে আমাদের ক্ষুদ্র দেউড়ি-ঘরের বাতায়ন খুলে 'আ-হা-হয়, কি দেখলাম! আ-হা-হা, কি দেখলাম!' কবির অস্ফুট আবেগ এখনও আমার কানে বাজছে। 'বাতায়ন পাশে গুবাক তরুর সারিতে' এক অপূর্ব ব্যঞ্জনায় তাঁর কবি-মানস সেই দেখাকে এমন করে এঁকে রেখেছেন যা' তাঁর এক বিস্ময়কর সৃষ্টি।

এই কবিতাটিই হয়ে আছে তাঁর সাথে আমার এক চিরন্তনী সেতু।

www.pathagar.com

বরাবর দু'বছর আগে

আমাকে নিয়ে মুশকিল এই যে, আমি হাল সনের বরাবর দু' বছর আগে। এখন ইংরেজী ১৯৭৪ চলছে তো ? কিন্তু আমি পার হচ্ছি ৭৬। ইংরেজী সনের সাধ্য নেই যে, এ দু'বছর গিলে খেয়ে আমাকে ধরে ফেলবে। দু'বছর আগে থেকে আমি সবকিছু দেখি—কত জায়গা, কত মানুষ, কত অবস্থা!

তবে, এটা কতদিন চলবে ঠিক বলা যায় না। কারণ, আমরা সকলেই মহাপ্রস্থানের পথে। পাণ্ডবেরা কুরুক্ষেত্র জয় করেছিলেন। কিন্তু মহাপ্রস্থানের পথে তাঁদের কাদার পা বেরিয়ে গেল। তাঁরা নেহাৎ অপোগণ্ডের মত রাস্তার দু'ধারে বসে পড়ে চিরকালের মত চোখ বুজলেন। এমন যে মহাবীর অর্জুন, দেখা গেল, তাঁরও একই রকম কাদার পা।

মানুষ মাত্রেই নিঃসঙ্গ। তবে, নিঃসঙ্গের মধ্যেও একরূপ সঙ্গ আছে। সেটা যত বয়স বাড়ে তত বোঝা যায়। এই সঙ্গীরা আসলে দেহী নহে, কতকগুলো আত্মা মাত্র। যেমন, আমার বেলায়, আগে দেখি চলেছেন জর্জ বার্নার্ড শ, আর পেছনে বন্ধু তফাজ্জল হোসেন (মানিক মিয়া)। বার্নার্ড শ বিদ্রূপ করে বলেন ঃ আমি বলিনি, চিরকাল বেঁচে থাকতে চেয়ো না! ও কাজ কেউ পারেনি, তুমিও পার্বে না।

হঠাৎ অভ্যুদয় হলো কোয়ামে এনক্রুমার আত্মার। বল্লে ঃ ঠিক বলেছেন। আমি উপাধি নিয়েছিলুম 'ওসাইগেফু' (মুক্তিদাতা)। ভেবেছিলাম ঃ দেশের ইতিহাসে আমি স্থায়ী হয়ে গেলুম। কিন্তু দেশের মাটিতেই আমি মরতে পার্লুম না।

এমন সময় মানিক মিয়া বল্লেন ঃ সুর্যোদয় হয়েছে।

তাঁরা সামঞ্জস্যতার কোন বিধান মেনে চলেন না। তাঁর একটা কথা হৃদয়ঙ্গম করার জন্যে আমাকে তার তাৎপর্য সরবে ভাবতে হলো।

আমি বল্লুম ঃ সূর্য অন্ধকার দূর করে, দুর্গন্ধ নাশ করে।

বার্নার্ড শ বল্লেন ঃ স্বাধীনতা সূর্যোদয়ের ন্যায়। অতঃপর কোন অজ্ঞানতা থাকতে পার্বে না, চরিত্রের কোন দোষ থাকতে পার্বে না, আর সকলে কাজ কর্তে হবে।

মানিক মিয়া বল্লেন ঃ সূর্য নিজেই এক মহাশক্তি। এই শক্তির কেউ পরিমাপ কর্তে

www.pathagar.com

পারেনি। যতই আমরা স্বাধীন হব ততই আমাদের শক্তি বাড়বে।

এমন সময় ফোড়ন দিয়ে প্রসন্ন গোঁসাইর আত্মা বলে উঠল ঃ বিনা প্রেম সে নাহি মিলে নন্দ-লালা। গোড়ায় প্রেম চাই, জাতীয় ঐক্য চাই।

হঠাৎ দেখি পাশে দাঁড়িয়ে আছে সুকুমার সিদ্ধান্তের আর সুধীর ভট্টাচার্যের আত্মা—১৯১৮ সালে কুট-আল-আমারায় যাদের ফাঁসী হয়। সুকুমার দ্বিতীয় অর্জুনের মত বীর ছেলে, ভারী ছেলে—এত ভারী যে ফাঁসীর রজ্জু ঝুলে পড়েই স্থির হয়ে যায়। কিন্তু সুধীরকে বলা যেতো এক জোড়া ভীষণ উজ্জ্বল চোখ—তার শরীর এত হাল্কা ছিল যে, আর কিছুই নজরে পড়তো না। তার রশি অনেকক্ষণ ঝুলাঝুলি করছিল।

আমাকে—আমাদের সামনে দাঁড় করিয়ে মিলিটারী পুলিশ বুকে রিভলবার ধরে রেখেছে। কিন্তু আমার চোখ ছিল রশি দু'খানির উপরে।

দেখি, চোখ-জোড়া সব খবরই রাখে। বল্লে ঃ তোমার চোখের সামনে সেই রশি এখনও ঝুলাঝুলি কচ্ছে; কারণ, আমি মরতে রাজী ছিলুম না।

আমি বল্লুম ঃ তুমি ছিলে শহীদ।

চোখ-জোড়া হঠাৎ জ্বলে উঠলো। বল্ল ঃ তোমরা শহীদের মৃত্যুটাকেই বড় করে দেখো। কিন্তু শহীদ তো মরে না। তারা রেখে যায় Cause; মৃত্যুর কারণটা।

বার্নার্ড শ বল্লেন ঃ বাঙ্গালী হুজুকে জাত। হুজুকেদের রীতি হলো ঃ তারা আভ্যন্তরিক স্ববিরোধিতাগুলো দেখতে পায় না। পরিণামে ঐ Inner contradiction-এর উপরই তাদের পা পিছলায়।

মানিক মিয়া বল্লেন ঃ সূর্যোদয়ের পর স্ব-বিরোধিতার উপর স্ব-বিরোধিতা শুধু পুঞ্জীভূতই হচ্ছে। এমন কেউ নেই যে, তার একটা ফিরিস্তি প্রকাশ করে।

এনক্রুমা বল্লেন ঃ বাংলাদেশে এখনও 'ওসাইগেফু' পর্যায় চলছে। তবে, এই বুদবুদ একদিন ফাটবেই।

বার্নার্ড শ বল্লেন ঃ কিন্তু ফাটাবে কে ? বাংলাদেশে বুদ্ধিজীবিতার পথ-ভ্রান্তি হয়েছে অনেকদিন। দৃশ্যটা বড় চমৎকার। কে কত ভাল কথা বলতে পারে, সুন্দর কথা বলতে পারে, নূতন কথা বলতে পারে—তার পাল্লা। কিন্তু, কাজের দায়িত্ব কারু নেই।

মানিক মিয়া বল্লেন ঃ এই উপমহাদেশে এক নম্বরের স্ব-বিরোধিতা হলো এটা ভুলে যাওয়া যে, জাতির পিতা আর পালের গোদা এক সঙ্গে হওয়া যায় না।

এনক্রুমা বল্লেন ঃ এক সঙ্গে থাকা যায় না।

মানিক মিয়া বলে বল্লেন ঃ স্বাধীনতা অর্জনের পর গান্ধী বলেছিলেন, এবার কংগ্রেস ভেঙ্গে দেওয়া হোক। যে জন্যে কংগ্রেসের সৃষ্টি সে কাজ সমাধা হয়ে গেছে। অধীন দেশের স্বাধীনতা অর্জন আর স্বাধীন দেশকে নেতৃত্ব দান এক কাজ নয়।

চোখ-জোড়া বল্লে ঃ ততদিনে কংগ্রেসের পেছনে কায়েমী স্বার্থ দাঁড়িয়ে গেছে, সুতরাং

www.pathagar.com

জয়ের মুহূর্তে কে শোনে গান্ধীর কথা!

মানিক মিয়া বল্লেন ঃ সেই ভুল জিন্নাহ্ও করেছিলেন। এত বড় বিচক্ষণ লোক—অথচ স্ব-বিরোধিতার বীজ বুনে গেলেন তিনিই।

চোখ-জোড়া বল্লে ঃ আমরা কায়েমী স্বার্থের শত্রু। আমাদের নিজের কোন কায়েমী স্বার্থী নেই—প্রাণ দেওয়া ছাড়া!

প্রসন্ন গোঁসাই খোঁচা মেরে বল্লেন ঃ প্রাণ দেওয়া আর প্রাণ নেওয়া!

চোখ-জোড়া বল্লে ঃ তা' অবশ্য ঠিক, দুটোই আমাদের নিকট সমান।

এবার অবাক হলুম। মানিক মিয়ার পেছনে আরও এক জোড়া চোখ হাসি হাসি মুখে আমার দিকে চেয়ে আছে। সিরাজুদ্দীন হোসেন! একেবারে হরিহর আত্মা। কিছু যেন বলেবেন। আমি মুখের কাছে কান নিতেই চুপি চুপি বল্লেন ঃ আমার এডিটর সাহেব কোন দলের সভ্য ছিলেন না। বলতেন এডিটরির সাথে সভ্যগিরি জুটলে স্ব-বিরোধিতা জন্মায়—বিশেষতঃ রাজনীতি যখন থাকে অত্যন্ত তরল অবস্থায়।

আমি বল্লুম ঃ ঠিক, ঠিক।

এনক্রুমা বল্লেন ঃ হারিয়ে মারিয়ে আমি একথা বুঝেছি যে, If you keep the law, the law will keep you (যদি তুমি আইনকে রক্ষা করো, আইন তোমাকে রক্ষা করবে) অত্যন্ত সত্য কথা।

প্রসন্ন গোঁসাই টিটকারি দিয়ে বল্লেন ঃ আপনি তো মশাই চীফ জাষ্টিসকেও থাবা মারতে কসুর করেন নি।

ওসাইগেফু বল্লেন ঃ তাই তো পরিণামটা খারাপ হয়ে গেল।

মানিক মিয়া বল্লেন ঃ আপনি আচরি ধর্ম পরকে শিখায়। আর এখানে বলা হলো ঃ গঠনতন্ত্র সংশোধনের প্রয়োজন নেই। আইনকে অঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে প্রধানমন্ত্রী পালেরও গোদা থেকে যাবেন। অধিকন্তু তিনি সংগঠনী সংস্থা এবং জেলা সংস্থার একেশ্বর কর্তা থাকবেন। দু'বছর ধরে এই হারিকিরি করে কায়েমী স্বার্থকে—তেলা মাথায় তেল দেওয়া ছাড়া—কার কি লাভ হয়েছে।

প্রসন্ন গোঁসাই বল্লেন ঃ আইনের সংশোধন করে যে বলা হলো প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে পাবলিক প্রসিকিউটারের পদ কোনটাই office of profit (লাভজনক পদ) নয়—সেটা কি ?

মানিক মিয়া বল্লেন ঃ ওটাকেই বলে চোখকে কান ঠারা। কিন্তু, ওটা করতে গিয়ে নির্বাচনকে প্রহসনে পরিণত করা হয়েছে !

বার্নার্ড শ বল্লেন ঃ মোটের উপর দেশে কর্ম আসেনি, আত্মশুদ্ধির কোন কাজ তো নয়ই।

মানিক মিয়া বল্লেন ঃ অথচ, ভারী ভারী ক্ষমতা হাতে নেওয়া হয়েছে। যে-কোন

www.pathagar.com

পুরানো কর্মচারীকে ফিল হাল বরখাস্ত করা যাবে, তিনি আদালতে কোন প্রতিকার চাইতে পারবেন না।

এবার সিরাজুদ্দীন হোসেন সোচ্চার হলেন। বল্লেন ঃ বৃথাই আমরা প্রাণ দিলুম। কারণ, নিয়ম করা হয়েছে যারা মুজিবনগর পৌঁছতে পারেনি তাদের তীর্থদর্শন ঘটেনি।

আবার প্রসন্ন গোঁসাইর টিটকারির গলা সোনা গেল ঃ 'ফকিরী কি সহজ কথা, ঢেঁকি যদি স্বর্গে যাইতো ভবের ধান ভানতো কেটা!' যারা মুজিবনগর পৌঁছতে পারে নি তারা সব ঢেঁকি হয়ে গেছে।

সিরাজুদ্দীন হোসেন জিগ্যেস করলেন ঃ মুজিবনগরে বসে কিছু জোট পাকান আছে নাকি ?

মানিক মিয়া বল্লেন ঃ সেটা অপ্রকাশ।

সিরাজুদ্দীন হোসেন স্বগতঃ উক্তি করলেন ঃ তবে, টাকার মান কমে গেছে, পাট তার আসন হারিয়েছে আর ভারতীয় য়ুনিফর্ম পরে রক্ষীবাহিনী কাদের রক্ষা করছে ? এমন সময় দেখা গেল, সকলের আগে যুধিষ্ঠির দাঁড়িয়ে আছেন। বল্লেন ঃ আমি ধর্মকে ধরে আছি, ধৃ ধাতু যন, তাই আমার পতন হচ্ছে না।

সুধীরের চোখ-জোড়া বল্লে ঃ তবুও তো আপনি যুদ্ধ করেছেন!

যুধিষ্ঠির বল্লেন ঃ হ্যাঁ ধর্মযুদ্ধ।

যুধিষ্ঠিরের হাতে ধরা একটা কুকুর—ভাল নাম সারমেয়।

যুধিষ্ঠির বল্লেন ঃ সারমেয়ই ধর্ম।

হঠাৎ রাবেয়া বসরীর গলা শোনা গেল ঃ খাবার পেলে লেজ নাড়ে, না পেলে মুখ গোমরা করে থাকে, এরকম কুকুর নাকি ?

মানিক মিয়া এবার উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়লেন। বল্লেন ঃ স্ব-বিরোধিতার শুরু হয়েছে একজন মাও সে-তুংএর অভাবে। মাও সে-তুং নিজে যুদ্ধ করেছিলেন। তাই কোন সমস্যাই তাঁর অজানা ছিল না।

প্রসন্ন গোঁসাই বল্লেন , এখন প্রেমকে বড় করেই এই অভাব মিটাতে হবে। বিনা প্রেম সে নাহি মিলে নন্দ লালা।

বার্নার্ড শ বল্লেন ঃ হ্যাঁ প্রেম, কর্ম ও জ্ঞান।

www.pathagar.com

নাথানের যুদ্ধের একটা গোড়ার রহস্য

আমি 'বাঙ্গালীর মুক্তিযুদ্ধের ইতিবৃত্ত' লিখছি।

এই ইতিবৃত্তে সব চেয়ে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়েছিল নাথানে।

বাঙ্গালীরা আত্ম-রক্ষার্থে যুদ্ধ করছিল। কিন্তু, নাথানে মেজর কমালুদ্দীন এমন আক্রমণাত্মক যুদ্ধ করেন যে তার প্রচণ্ডতা দেখে আমি অবাক হয়ে যাই।

যুদ্ধের কতকগুলি আইন-কানুন আছে। বার্নার্ড শ তাঁর 'ম্যান য়্যাণ্ড দি আর্মস্' নাটকে দুই সেনাপতির তর্ক তুলে দিয়েছেন। একজন ক্ষুদে রাষ্ট্রের সেনাপতি। অন্যজন বৃহৎ রাষ্ট্রের। এই সেনাপতি যুদ্ধে হেরেছেন। কিন্তু, ক্ষুদে রাষ্ট্রের সেনাপতি যুদ্ধে জিতেছেন। তর্ক এই নিয়ে যে বৃহৎ সেনাপতি গৌরবের সাথে বলছেন ঃ আমি তো আইন মাফিক হেরেছি। ক্ষুদে সেনাপতি বলছেন ঃ রেখে দাও তোমার আইন। 'মারি অরি পারি যে কৌশলে' জেতাটাই আসল কথা।

মেজর কমালুদ্দীনও আইন-কানুন অগ্রাহ্য করে গাক্কার বাহিনীটাকে আক্রমণ করেছিলেন। গাক্কাররা ছিল ফ্রন্টিয়ারের খুব যুদ্ধবাজ একটা উপজাতি। পাকিস্তানী সেনাপতি ওদের উপর ভার দিয়েছিলেন নাথান রক্ষা কর্বার। আর, ওরাও ট্রেঞ্চ্ সেল বানিয়ে নাথানকে এরূপ দুর্ভেদ্য করে ফেলেছিল যে নাথানই পাকিস্তানী রক্ষা ব্যবস্থার একেবারে প্রাণ-কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল।

কমালুদ্দীন বাছাই-করা সৈন্যদল নিয়ে ট্রেঞ্চে ঢুকে পড়েন, সেলের মুখে মুখে বন্দুক বসান ছিল, পাগলের ন্যায় সে সব বন্দুক টেনে এনে গাক্কারদের একেবারে বিভ্রান্ত করে দেন।

এটা ছিল সাক্ষাৎ মৃত্যুর বিবরে ঢুকে যাওয়ার ন্যায়। আক্রমণকারীর বেরিয়ে আসতে পারার কোন সম্ভাবনা ছিল না। আর, সেটা জেনেশুনেই যেন তিনি 'মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা' ধরেন। অবশ্য তিনি গাক্কার গুলিতে আহত হয়ে ঠিক প্রাণ-ত্যাগই করেন। এখানেই রয়েছে চরম রহস্য। কেন তিনি প্রাণ বিসর্জনের জন্য এত ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন !

শুধু এই সন্দেহই হয়। সঙ্গীরা যখন তাঁর জন্য পানি নিয়ে এসেছিল আহত কমালুদ্দীন

www.pathagar.com

সে পানি ঠেলে ফেলে দেন, পান করেন নি। যখন অনুচরেরা বলে ঃ স্যার, কলেমা পড়ুন, তিনি উত্তর দেন ঃ আমার কলেমা পড়ার প্রয়োজন নেই। কিন্তু, খোদার কসম, তোমাদের কেউ যদি পিছু হটে আসে আমি মুমূর্ষু থেকেও তাকে পেছন থেকে গুলি কর্বো। সুতরাং তিনি যে প্রাণ দিতেই দৃঢ়-সংকল্প ছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু, কেন ?

এই সময় একটা দৈব-সংযোগ হয়। গাক্কাররা তাঁর অনুচরদের প্রতি যে এক ঝাঁক গুলি ছুঁড়ে কোন কারণে সেগুলি লক্ষ্য-ভ্রষ্ট হয়ে যায়। গাক্কাররা বড় কুসংস্কারাপন্ন উপজাতি। তাই দেখে ওদের ধারণা হয় যে ফেরেশতা অলক্ষ্যে বাঙ্গালীদের সাহায্য করছেন, সুতরাং জেতা অসম্ভব। অতঃপর তারা পালিয়ে যায়। এতে সমগ্র যুদ্ধের মোড় ফিরে যায়। পাকিস্তানীদের পরাজয় অনিবার্য হয়ে উঠে।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মেজর কমালুদ্দীন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

আমিআমার 'মৃত্যুর সাথে ধরি পাঞ্জা' বইয়ে মেজর কমালুদ্দীনের একটা আলেখ্য দেব ঠিক করেছিলাম। কিন্তু, তাঁর কোন ছবি পাচ্ছিলাম না। অবশেষে আমার এক বন্ধু জেনারেল জিন্নৎকে লিখলুম ঃ তোমাদের সৈন্য বিভাগ থেকে যদি কোন সাহায্য কর্তে পার।

জিন্নৎ জবাব দিলে আমার কাজের প্রশংসা করে। তবে দুঃখ করে যে ঃ আমাদের নিকট তো কোন ছবি নেই। যা হোক তাঁর বাবার ঠিকানা দিচ্ছি, তিনি যদি দিতে পারেন।

ঠিকানাটা আমাদের চট্টগ্রামের নিকটই একটা কলোনীর। আমি সেখানে গিয়ে হাজির হলুম। কিন্তু, দেখে অবাক হলুম যে এই কলোনীতে প্রায় ক্ষেত্রে মিশ্র-দম্পতির বাস। স্বামী পশ্চিমা স্ত্রী বাঙ্গালী, অথবা স্বামী বাঙ্গালী স্ত্রী পশ্চিমা। এরূপ এত অসংখ্য দম্পতি দেখে আমার তাক লেগে গেল।

ঠিক দরজায় ধাক্কা দিতেই এক মহিলা বেরিয়ে এলেন। চোখে-মুখে বুদ্ধির ও আভিজাত্যের ছাপ। দেহে পোশাকে যৌবনের জেল্লা যাই যাই করেও এখনও লট্‌কে আছে।

বল্লেন ঃ উনিতো বাড়ি নেই, কাজে বেরিয়ে গেছেন। আপনি বাঙ্গালী আছেন ?

বুঝলাম মহিলা পশ্চিমা। খবরের কাগজে পড়েছিলাম যখন কুমিল্লার কোন গ্রামে গিয়ে কমালুদ্দীনের মা'কে তাঁর মৃত্যু সংবাদ দেওয়া হয় বাঘিনীর মত তাঁর চোখ ধ্বক্ ধ্বক্ করে উঠে। তিনি শুধু জিগ্যেস করেছিলেন ঃ মৃত্যুর পূর্বে তাকে পানি পিলাইছিলা ? অনুচর মিথ্যা করে বলেছিল ঃ পিলাইছিলাম।

আমি বল্লুম ঃ আপনি তো কম পাত্রী নন্। ছেলের মৃত্যুতে একটুও মুষড়ে পড়েন নি!

তিনি আমার মুখের দিকে চেয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন। পরে বল্লেন ঃ মা আমি নই, আমার বড় জন, আমার সতীন।

তিনি আমাকে চা খাওয়ালেন। আমি এই বলে বিদায় নিলাম যে কাল সকালে আটটার আগে আসব, (স্বামী) শহীদুল্লা সাহেব যেন বাড়ী থাকেন।

www.pathagar.com

পরদিন তাঁর সাথে দেখা। অক্সফোর্ডের বি-এ। কিন্তু, আমি যেন শরৎ চন্দ্রের 'গৃহদাহ'-এর নায়ক সুরেশকে দেখছি সামনে। সামনের দিকটা বহু গুণে গুণী, কিন্তু পেছনের দিকটা 'আখের ফানা'।

কোন কাজই গুছিয়ে কর্তে পারেন না। তাছাড়া তিনি ভীষণ ব্যর্থতা-বোধে ভুগছেন।

কমালুদ্দীনের ছবি একটা দেখালেন। কিন্তু আমাকে দিতে রাজী হলেন না। তার আগে আমার লেখবার ধরন বদলান দাবী কর্লেন। মোদ্দা কথা হলো ঃ লিখতে হবে যে কমালুদ্দীন শহীদুল্লা সাহেবের ছেলে এবং তাঁর সবিশেষ পরিচয় দিতে হবে।

আমি আমার ধরন পাল্টাতে রাজী হলাম না। তবে, কৌশলে তাঁর কুমিল্লা বাড়ীর ঠিকানা জেনে নিলুম।

একদিন কমালুদ্দীনের মায়ের নিকট উপস্থিত হলুম। চেহারায় ও মনে যেন গৈরিক-ধারিণী সন্ন্যাসিনী বনে গেছেন।

বল্লেন ঃ পঁচিশ বৎসর আগে—আমি তখন সদ্য পরিণীতা, কমাল আমার পেটে এসেছে—স্বামী গিয়েছিলেন করাচী সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের পদস্থ অফিসারের চাকরি পেয়ে। কথা ছিল, বাসা ঠিক করে আমাকে নিয়ে যাবেন। বাসা ঠিক হলো। কিন্তু, বাসায় নিয়ে উঠালেন আমাকে নয়, পাঞ্জাবী এক মহিলাকে যিনিও সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টে চাকুরি কর্তেন। আমাদের বাড়ীর অবস্থা ভাল ছিল, কোন অভাব ছিল না। অভাব ছিল কেবল স্বামীর। স্বামী পাঞ্জাবীর মোহে পড়ে গিয়েছিলেন। আর পাঞ্জাবিনী তাঁকে কুহক করেছিল। আমি স্বামী ও পাঞ্জাবিনী উভয়ের প্রতি জাত-ক্রোধ হয়ে উঠলুম।

আমি ছেলেকে ভালরূপ লেখাপড়া করালুম। ক্যাডেট কলেজে দিলুম। সেখান থেকে পাশ করার পর রিসালপুরে এয়ার-ফোর্স ট্রেনিং-এ পাঠালুম। আমার কাছে পাঞ্জাবী মানেই যুদ্ধ-বিদ্যা। পাঞ্জাবীকে হারাতে হলে যুদ্ধ-বিদ্যায় এগিয়ে যেতে হবে। এয়ারফোর্সের উচ্চতম ট্রেনিং নিয়ে সে ভর্তি হলো কাকুল মিলিটারী একাডেমীতে।

কিছুদিন পরেই লাগল যুদ্ধ ঃ পাঞ্জাবী আর বাঙ্গালীতে। এ যেন জাতীয় পর্যায়ে নহে, আমার নিজেরই পর্যায়ে। আমি ছেলেকে একদিন সব কথা খুলে বল্লুম। তার কাছে আমার দাবী হলো ঃ পাঞ্জাবীকে হারিয়ে দিতে হবে, তোমার বাবা ও সৎমাকে আমার নিকট বন্দী করে এনে দিতে হবে। ছেলে আমার পা ছুঁয়ে সে প্রতিজ্ঞা কর্ল। তারপর যুদ্ধের মোড় ফিরিয়ে দিয়ে সে প্রচণ্ডতম আক্রমণাত্মক যুদ্ধে শহীদ হলো।

আমি জিগ্যেস কর্লুম ঃ এবার আপনার জিঘাংসা পূর্ণ হয়েছে ?

তিনি বিষণ্ন হাসি হাসলেন। বল্লেন ঃ কোন জিঘাংসা কি পূর্ণ হয় ? ছেলে যখন পশ্চিম-পাকিস্তানে তখন আমাকে না জানিয়ে অনেকবারই তার বাবার সাথে দেখা করেছে। সৎমার সঙ্গে শুধু দেখাই করেনি, তাঁকে তার ভালও লেগেছে। তার ডায়েরীটি উদ্ধার করে আনা হয়েছে। তাতে লিখে গিয়েছে—পাঞ্জাবী মেয়েরা বহু দিক দিয়ে বাঙ্গালী মেয়ে থেকে অগ্রসর।

www.pathagar.com

আমি জিগ্যেস কর্লুম ঃ এখন আপনি কি কর্বেন ?

তাঁর চোখ ততক্ষণে চিক্‌চিক্ করে উঠেছে। বল্লেন ঃ ছেলে লিখে গিয়েছে ঃ মা, আমি শহীদ হবো, কিন্তু তার আগেই দেখে যাব যে পাঞ্জাবীরা হেরে গিয়েছে। আমার নাম পাঞ্জাবীদের ত্রাস। নাথানের যুদ্ধের পরই প্রকাশ পেয়ে যাবে যে মেজর কমালুদ্দীন শহীদুল্লা সাহেবের ছেলে। সঙ্গে সঙ্গেই পাকিস্তানের চাকুরি থেকে তিনি জবাব হয়ে যাবেন আর তাঁদের বাংলাদেশে ফিরে আসতে হবে। তুমি আমার কথা স্মরণ করে বাবাকে মাফ করে দিও, ছোট-মাকে আদর করে ঘরে তুলবে। আর, তাঁদের সঙ্গে যোগ-সৃষ্টি করে যতটুকু তোমার অবাধ্য হয়েছি সেটা মাফ করে দিও।

www.pathagar.com

শেষ আশ্রয়

১৯৩০ সালের ২২শে এপ্রিল জালালাবাদ যুদ্ধের পর মাষ্টার-দা চট্টগ্রামের গ্রাম অঞ্চলে আত্মগোপন করে 'গেরিলা' যুদ্ধ চালিয়ে যাবার সঙ্কল্প করেন।

অনন্ত সিংহ লিখেছেন ঃ তিন বৎসর ধরে পুলিসের বিভিন্ন চক্রান্ত ব্যর্থ করে চট্টগ্রাম জেলার ফেরারী জীবন অতিবাহিত করেন তিনি। তাঁর জন্য নানা ভাবে পুলিসের ফাঁদ পাতা ছিল এবং নানা রকমের টোপ ফেলা হতো। গ্রামান্তরে দিনের পর দিন তাঁকে ঘুরে বেড়াতে হয়েছে এবং বহু বারই প্রায় ধরা পড়তে পড়তে বেঁচে গেছেন। কখনও মুসলমানের পোশাকে কখনও বা নগ্ন-গ্রাত্র দীন-দরিদ্র পুরোহিতের বেশে পুলিস-বাহিনীকে বিভ্রান্ত ও নিষ্ক্রিয় করে রাখতে সমর্থ হয়েছিলেন তিনি। পুলিসকে ধাপ্পা দিয়ে গোয়ালার বেশে কখনও তাঁকে গোয়াল হতে গরু নিয়ে বেরিয়ে যেতে হয়েছে, কখনও বা কাপড়ের বোচ্‌কা মাথায় ধোপার মত পুলিসের পাশ কাটিয়ে চলে গেছেন তিনি.....। ক্রম-বর্ধমান হারে মাষ্টার-দা'র মাথার মূল্য বেড়েই চলেছে। সরকার পুরস্কারের পর পুরস্কার ঘোষণা করেছেন। ট্রেন, ষ্টেশন, বাজার, স্কুল, কলেজ, আদালত-প্রাঙ্গণ সর্বত্র মাষ্টার-দা'র পুরস্কারের বিজ্ঞপ্তিতে ছেয়ে গেছে।.....মাষ্টার-দা'কে সরকার গ্রেফতার করতে পারবে—একথা চট্টগ্রামবাসীরা চিন্তাতেও স্থান দিতে চাইতেন না।

আনন্দ প্রসাদ গুপ্ত লিখেছেন ঃ তাঁকে ধরবার জন্য সরকার পক্ষের উদ্যোগ আয়োজনের অন্ত ছিলনা। কলকাতা ও অন্যান্য স্থান হতে পুলিস ও গোয়েন্দা বিভাগের বাছা বাছা পুরুষের আমদানী করা হয়েছিল চট্টগ্রামে তাঁরই জন্য। .....পিউনিটিভ চ্যান্স, কারফিউ, আইডেন্টিটি কার্ড, মারপিট, ধর-পাকড় প্রভৃতি সর্বপ্রকার দমন ও ভীতি উৎপাদন ব্যবস্থার সুপ্রচুর সমাবেশ হয়েছিল এই একটি লোককে লক্ষ্য করে। সুদীর্ঘ তিন বছর ধরে এইসব বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও মাষ্টার-দা যে শুধু আত্মগোপন করেছিলেন তা' নয়—একের পর এক সশস্ত্র প্রতি আক্রমণ পরিচালনা করে শেষ পর্যন্ত চট্টগ্রাম বিদ্রোহের গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্য অক্ষুণ্ন রেখে গেছেন।

মাষ্টার-দা ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত বিপ্লবী সাথীদের নিয়ে পাহাড় জঙ্গল ছেড়ে ১৯৩০ সালের সেই ২৩শে এপ্রিল রাতে এতটুকু ইতস্ততঃ না করে তাঁর নিজের গ্রাম নয়াপাড়ার নিজ

www.pathagar.com

বাড়িতেই তাঁর দাদা ও বৌদির সহযোগিতায় তাদের আহার ও বেশ পরিবর্তনের ব্যবস্থা করেন লিখেছেন বিধু সেন।

কালীপদ চক্রবর্তী লিখেছেন ঃ বোয়ালখালীর এক মুসলিম বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছি। মাষ্টার-দা ও আমি গৃহস্থটির ধানের গোলার ভেতর শুয়ে আছি। গ্রীষ্মের দুপুরের রোদ, টিনের ছাউনীর গরমে যেন আমরা প্রায় সিদ্ধ হয়ে যাচ্ছি, প্রাণ যেন ওষ্ঠাগত।

শচী সেন উল্লেখ করেছেন ঃ মাষ্টার-দাদের আশ্রয় কেন্দ্রগুলির মধ্যে পোপাদিয়ার মুসলমান কৃষক চাষীর বাড়ী এবং সতীর্থ মীর আহ্মদের গৃহ।

অর্ধেন্দু গুহ লিখেছেন ঃ অনেক সময় মুসলমান পরিবারের গৃহে মহিলাদের অন্তঃপুরে মাষ্টার-দা নিরাপদ আশ্রয় পেয়েছেন!.....একদিনের কথা আমার আজও খুব স্পষ্ট মনে আছে। মাষ্টার-দা তখন হাওলা গ্রামে এক মুসলমান পরিবারের বাড়িতে ছিলেন। ঐ বাড়ির কর্ত্রী বৃদ্ধা মহিলা। তিনি ছিলেন খুব স্নেহশীলা। আমি যেদিন ঐ বাড়িতে গেলাম, অন্যান্য দিনের ন্যায় সেদিনও ঐ মহিলা খুব যত্ন করে নিজ হাতে সব রান্না করে আমাদের সবাইকে এক সাথে বসিয়ে খাওয়ালেন। একদিন তিনি খুব দুঃখের সাথে মাষ্টার-দার কাছে অনুযোগ করলেন, "তোমরা, বাবা অনেকেই আমার বাড়িতে এলে, কিন্তু সূর্য সেনকে একদিনও এখানে নিয়ে এলেনা। আমার খুব ইচ্ছা তাঁকে একবার দেখি। বুড়ো হয়ে গেছি, কত দিনই বা আর বাঁচব। কবরে যাওয়ার আগে একবার সূর্য সেনকে দেখতে না পেলে আমার মনের একান্ত বাসনা অপূর্ণ থেকে যাবে। তার সম্বন্ধে এত কথা শুনেছি। তাই তাকে একবার দেখার ইচ্ছা। তোমরা তাকে অন্ততঃ একবার আমার বাড়িতে নিয়ে এস।" এই কথা শুনে মাষ্টার-দা চোখ বেশ বড় বড় করে গম্ভীর চোখে বল্লেন, 'খালা, সূর্য সেনের দেখা পাওয়া মুস্কিল। কখন কোথায় থাকে কেউ জানেনা এবং সকলের বাড়িতে সে যায়ওনা। এখন শুনেছি সূর্য সেন অনেক দূরে রয়েছে। তবে, খালা, আপনি যদি আমাদের বেশী করে খাওয়ান এবং বিশেষ করে তালবড়া পেট ভরে খাওয়ান, তাহলে এবার যখন সূর্য সেনের সাথে আমার দেখা হবে তখন তাকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে আপনার বাড়িতে নিয়ে আসবার চেষ্টা করব। তিনি খুব মনোযোগ দিয়ে একথা শুনে বল্লেন, 'হ্যাঁ, বাবা, তোমরা একবার তাকে নিয়ে এসো। আমি মরবার আগে তাকে একবার দেখে যেতে চাই।' মাষ্টার-দার এই রসিকতা দেখে সেদিন খেতে খেতে আমার হাসি সম্বরণ করা খুব কঠিন হয়ে পড়েছিল। তবুও না দেখা সূর্য সেনের প্রতি স্নেহ পরায়ণা এ মুসলমান বুড়ি মায়ের কথা শুনে অপরিসীম শ্রদ্ধায় সেদিন আমার মাথা আপনা থেকে নীচু হয়ে পড়েছিল। .....প্রায় ১৬ বছর পর ১৯৪৬ সালে অম্বিকা-দা, গণেশ-দা, অনন্ত-দা প্রভৃতি সকলে মুক্তি পাওয়ার পর বিভিন্ন গ্রাম ঘুরতে ঘুরতে একদিন সব দাদাদের নিয়ে আমিও ঐ বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হলাম। দেখলাম, অশীতি বর্ষীয়া অপরিসীম স্নেহপরায়ণা সে বুড়ি-মা তখন বেঁচে আছেন। আমাদের সকলকে তিনি আগের মতই অত্যন্ত যত্ন করে খাওয়ালেন এবং বেশী করে খাওয়ালেন সদ্যভাজা গরম গরম তালবড়া। বল্লেন, 'সূর্য সেনের জিনিস আজ তোমাদের খাওয়ালাম। সূর্য সেনকে তো আর কোনদিনই খাওয়াতে পারবনা, তাই তোমাদের খাইয়েই আমার আনন্দ।' বৃদ্ধা মায়ের কথা শুনতে শুনতে

www.pathagar.com

সেদিন আমাদের সকলের চোখ জলে ভরে গিয়েছিল। তিনি ছিলেন বিপ্লবী দলের সক্রিয় কর্মী এবং মাষ্টার-দা'র বিশেষ প্রিয় বন্ধুবর মীর আহমদের মা। মীর আহমদ ঐ যুগে বহু বৎসর জেলে বন্দী ছিলেন।

হরিপদ ভট্টাচার্যের উক্তি ঃ প্রত্যেক আশ্রয়দাতা মাষ্টার-দা ও আত্মগোপনকারী বিপ্লবীদের দেবতার মত মনে করত। হিন্দু, মুসলমান, মধ্যবিত্ত ও চাষী পরিবার—প্রত্যেক আশ্রয়দাতা আশ্রয় দিতে পেরে যেন নিজেকে ধন্য মনে করেছেন। কী অদ্ভুত ব্যাপার! এঁরা সকলেই জানেন, যদি এই বিপ্লবীদের সরকারের হাতে তুলে দেওয়া যায়, তাহলে বহু টাকা পুরস্কার পাবেন। আর যদি সরকার ঘুণাক্ষরেও এঁদের অবস্থানের কথা জানতে পারে, তাহলে সেই বাড়িঘর জ্বালিয়ে এবং লোকজন পিটিয়ে আধমরা করে জেলে পাঠাতেও কুণ্ঠিত হবেনা। কিন্তু, চট্টগ্রামের প্রায় প্রতিটি বাড়িই সরকারের প্রলোভনকে পায়ে ঠেলে দিয়ে বিপদের ঝুঁকি নিয়ে আশ্রয় দিয়েছে। আত্মগোপনকারী বিপ্লবী-রা বিপদের সম্মুখীন হয়ে সামনে যে বাড়ি পেয়েছেন আশ্রয়ের জন্য সে বাড়ীতে ঢুকেছেন। কোন দিন কেউ ভীত হয়ে প্রত্যাখ্যান করেছেন এমন খবর আমাদের জানা নেই। চট্টগ্রাম যুব-বিদ্রোহের খবর গ্রামের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ার ফলেই স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে জনসাধারণের বাড়ির দরজা বিপ্লবীদের জন্য অবারিত রাখার মনোভাব গড়ে উঠেছিল। জনসাধারণের এই মনোভাবের ফলে পুলিসের কোন বাধা মাষ্টার-দা'র কাজে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়নি।

মাষ্টার-দা আশ্রয় নিয়েছিলেন চট্টগ্রাম শহর থেকে ১০/১২ মাইল দূরে কর্ণফুলী নদীর অপর পাড়ে জঙ্গলাকীর্ণ পর্বত শ্রেণীর সন্নিকটে ঘন বসতিপূর্ণ গ্রামসমূহে ঃ ধলঘাট, জৈষ্ঠপুরা, উত্তরভূমি, পোপাদিয়া, কধুরখিল (হাওলা), শ্রীপুর, সারোয়াতলী, কেলীশহর, পরৈকোড়া, গৈড়লা—কখনও চট্টগ্রাম শহর থেকে ২০ মাইলের বেশী দূরে যান নি।

তিনি যেখানেই গিয়েছেন, সেখানেই সকলের কাছ থেকে পেয়েছেন শ্রদ্ধা, বিশ্বাস ও ভালবাসা।

১৯৩৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে তাঁরা যখন গৈড়লা গ্রামে ক্ষীরোধ প্রভা বিশ্বাসের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলেন তখন ১৬ই তারিখে অকস্মাৎ তাঁরা ধরা পড়ে যান।

ঐদিন সন্ধ্যাবেলাতেই মাষ্টার-দা'র ঘোর সন্দেহ জাগে যে ঐ গৃহ আর আদৌ নিরাপদ নয়। তিনি নিজে প্রস্তুত হয়ে বন্দী যুবকদের নির্দেশ দেন অবিলম্বে ঐ গৃহ পরিত্যাগ করবার জন্য। কিন্ত ফৌজ ইতিমধেই ঐ গৃহ ঘিরে ফেলেছিল। গাঢ় অন্ধকারে চতুর্দিক আচ্ছন্ন, একে একে সকলেই ফৌজের অবরোধ অতিক্রম করে চলে যায়।

কিন্তু, মাষ্টার-দা ও তাঁর সাথী ব্রজেন সেন যাওয়ার সময় অতর্কিতে একজন সেপাইকে স্পর্শ করে ফেলেন। গুর্খা সৈন্যটি সঙ্গে সঙ্গে মাষ্টার-দা'কে জড়িয়ে ধরে মাটিতে ফেলে দেয় এবং সান্নিধ্যের অপর একজন গুর্খা সেপাই ব্রজেন সেনকে ধরে ফেলে।

মাষ্টার-দা'র গ্রেফতারের পরেই সঠিক ভাবে জানা যায়, ক্ষীরোদ প্রভার নিকটতম প্রতিবেশী নেত্র সেন মাষ্টার-দা'র কথা জানতে পারে এবং পুরস্কারের লোভে পুলিসকে

www.pathagar.com

সংবাদ দেয়।

১৯৪০ সালের ১১ই জানুয়ারী দিবাগত রাত্রে মাষ্টার-দা'কে ফাঁসী দেওয়া হয়।

এর তিন দিন পূর্বের ঘটনা। পুরস্কারের সরকারী প্রতিশ্রুতি পেয়েছে বিশ্বাসঘাতক নেত্র সেন। সন্ধ্যার পর উৎফুল্ল মনে খেতে বসেছে, নিজের বাড়ির রান্নাঘরের বারান্দায়। তার স্ত্রী তাকে পরিবেশন করছে। এমন সময় রান্না ঘরের ভিতরে কি একটা আনতে গিয়ে পর মুহূর্তেই ফিরে এসে মহিলা দেখেন নেত্র সেনের মস্তক তার থালার উপর এবং দেহ এক পাশে, কোথাও কেউ নেই। বাইরের গভীর অন্ধকারে কেবল ঝিল্লীর অবিশ্রান্ত গুঞ্জন।

এইভাবে মাষ্টার-দা'কে ধরিয়ে দেওয়া প্রতিশোধ নেয়া হয়। সবাই জানত, পুলিসের লোকও জানত হত্যাকারী কে; কিন্তু ধরবার জন্য সাক্ষী সাবুদ মিলে নি।

এই সময়ের বেশীর ভাগই আমি কাটিরহাটে সাব-রেজিষ্ট্রার ছিলাম। এক বৌদ্ধ ভদ্রলোক আমার অফিসের কেরানী ছিলেন। একদিন তিনি তাঁর ঢাকা খালার বাড়ি থেকে এসে কথাচ্ছলে জানালেন ঃ তাঁর এক ছেলের সাথে বন্ধুত্বসূত্রে একপাল ছেলে এসে তাঁদের দোতলায় লুকিয়ে আছে। এরা বোধ হয় ফেরারী বিপ্লবী। সঙ্গে টাকা-পয়সা, কিছু গয়না-গাঁঠিও আছে। তাঁর স্ত্রীকে একখানা সোনার চিকও দিতে চেয়েছেন।

শুনলাম দু'দিন পরেই তারা অন্যত্র সরে গিয়েছে।

অফিস সংলগ্ন বাসায় আমি একাকী থাকতাম। এই ঘটনার পর একটা কল্পনা আমাকে পেয়ে বসে। হঠাৎ যদি রাত্রে কেউ এসে দরজা ঠেলে বলে—'আমি সূর্য সেন, আমাকে আশ্রয় দাও'—আমি কি কর্বো ?

ভাবতাম ঃ আশ্রয় তো দেবই, তারপর যা' থাকে কপালে।

একবার ছোঁক ছোঁক করে আসানুল্লাহও আমার অফিস ঘুরে গেলেন। আমি যখন ২০ বৎসর পূর্বে ক্লাস সেভেনে পড়তুম তখন শিরাজীর নিষিদ্ধ কবিতা 'অনল প্রবাহ' আমার বিছানার তলায় লুকান ছিল। আসানুল্লাহ তখন ছিলেন দারোগা। আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলেন। কিন্তু, 'অনল প্রবাহ' ধর্তে পারেন নি।

মাষ্টার-দা'র গ্রেফ্তারের খবর পেয়ে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিলাম—যাক্, কোন মুসলমান তাঁকে ধরিয়ে দেয় নি।

www.pathagar.com

৩৪ বৎসর!

১৯২১ সালের ২৩শে মার্চ আমি বেসামরিক সরকারী চাকুরিতে ঢুকি সব-রেজিষ্ট্রার রূপে, ১৯৫৪ সালের ৮ই আগষ্ট অবসর গ্রহণ করি—মাঝখানে ডিষ্ট্রিক্ট সাব-রেজিষ্ট্রার ও ডিষ্ট্রিক্ট রেজিষ্ট্রারে প্রমোশন পেয়ে—অবশেষে ইন্‌স্‌পেক্টর অব রেজিষ্ট্রেশন অফিসেস্ রূপে।

৩৪ বৎসর ৪ মাস ১৭ দিন !

চাকুরির এই একটা মন্দ দিক দেখেছি যে কোন না কোন সময়ে (বস্তুতঃ সব সময়েই) আপনি এমন লোককে উপরালা রূপে পাবেন যিনি আপনার থেকে যোগ্যতায় কম, সাধুতায় কম। অথচ, আপনাকে সেই উপরালার আজ্ঞাবহ, তাঁর প্রতি বিশ্বস্ত থাকতে হবে। ফলে, কারু কারু সাথে আমার বন্ধুত্ব হয়েছে, কিন্তু আমার গোটা চাকুরিয়া সমাজের সাথে কখনও 'এস্পিরিট দ্য কোর' (একাত্মতা) গড়ে উঠেনি।

একবার এক জেলা সদরে আমাদের সমাজের এক পার্টি হয়। আমি মফঃস্বলে কোথাও কাজ করি। আমি লক্ষ্য কর্লুম যে আমার থেকে চাঁদাও চাওয়া হয় নি, আমাকে পার্টিতে দওয়াৎও দেওয়া হয়নি। হেড ক্লার্ক ছিলেন আমার বন্ধু। তাঁকে কারণ জিগ্যেস কর্লুম। তিনি হাসলেন। বল্লেন, আলোচনা হয়েছিল। সকলের মত হলো ঃ আমরা আবার কোন ফ্যাসাদে পড়ে যাই, ওঁকে না জানানই ভালো।

গোড়াতে এক ব্যাপারে আমার চোখ খুলে গিয়েছিল। আমাদের ব্যাচে যারা সাব-রেজিষ্ট্রার নিযুক্ত হয়েছিল তার মধ্যে কেহ কেহ এম-এ ছিলেন, কেহ কেহ বি-এল, কেহ হাই কোর্টের জজের ছেলে, কেউ কোন বিখ্যাত ব্যক্তির নন্দন। এঁদের প্রতি আমার একটা সম্ভ্রম ও ভীতির ভাব ছিল। কারণ, আমি তো ম্যাট্রিক পাস করে কলেজের মুখ দেখা মাত্র। আর সাজ-পোশাক সম্বন্ধেও আমার কোন সুষ্ঠু ধারণা ছিল না।

একটা ডিপার্টমেন্টাল পরীক্ষা পাশ করার উপর আমাদের চাকুরিতে পাকা হওয়া নির্ভর কর্তো। দু'বছরের মধ্যে এটা কর্তে হবে, সরকার দু'বার পরীক্ষার জন্য কলিকাতায় যাওয়া-আসার খরচ দেবেন।

ফলে, এটা রেওয়াজ দাঁড়িয়ে গিয়েছিল যে প্রথম বার পরীক্ষায় ফেল করা হবে,

www.pathagar.com

দ্বিতীয় বার পাস করা হবে—তা' হলে দু'বারের খরচই হাত-ধরা হয়ে থাকল।

কিন্তু, আমি এই রেওয়াজ মানলুম না। বল্লুম ঃ দু'বারের খরচ নিয়ে কাজ নেই, আমি একবারেই পাস কর্তে চাই।

পরীক্ষার দিন আমি ইন্‌স্‌পেক্টর জেনারেলের চেম্বারের সামনে ঠিক সময়ে দেখা দিলুম। দৌড়ে আসলেন পার্সোন্যাল এসিস্ট্যান্ট রায় বাহাদুর জ্ঞানেন্দ্র নাথ রায়। জিগ্যেস কর্লেন ঃ আপনি কে? বল্লুমঃ চাটগাঁ থেকে এসেছি, পরীক্ষা দিতে। হাসলেন। বল্লেন ঃ পরীক্ষা তো প্রায় শুরু হয়ে যাচ্ছে। আমাকে নিয়ে গিয়ে হলে বসিয়ে দিলেন।

চারিদিকে তাকিয়ে নিজেকে মনে হলো ঃ এক দুঃস্থ বালক ডেভিড কপারফীল্ড। এঁরা একেক বার পরীক্ষা ফেল করেছেন এটা বিশ্বাস হতে চাচ্ছিল না।

আমি আইনগুলো প্রথম একবার পড়ে গিয়েছিলুম। আইনের ভাষাই অন্য রকম। দ্বিতীয় বার পড়ার পর ভাষা ও অর্থ দুইই আমার নিকট পরিষ্কার হয়ে উঠলো। তখন আমি ইনডেক্স দেখে দেখে আমার ধারণাগুলো চোখা করে নিলুম।

কিন্তু, ষ্টীমারে ও কলিকাতার বাসায় আমার কোন কোন সহ-পরীক্ষার্থী ভয়ানক হাঁসফাঁস কচ্ছিলেন। একজন শুধুই স্বপ্ন দেখছিলেন ঃ এই এই প্রশ্ন এসেছে—এবং সেগুলো সবই বেয়াড়া।

পরীক্ষার পর খুব কড়া করে আমি নম্বর দিয়ে দেখলুম ঃ নিশ্চিন্ত হলুম ঃ আমাকে ফেল করানো সম্ভব হবে না।

কিন্তু, যখন ফল বেরুল ঃ আমি অবাক হয়ে গেলুম। আমি প্রথম হয়েছি, "স্টার" পেয়েছি এবং উইথ ক্রেডিট মন্তব্য পেয়েছি আমিই একমাত্র। আমার সহ-পরীক্ষার্থীগণ সম্বন্ধে আমার ধারণা অত্যন্ত 'দরিদ্র' হয়ে গেল।

আইনের নীতি না ধরতে পার্লে তার উদ্দেশ্য বোঝা যায় না এবং প্রয়োগেও ভুল হতে পারে। সারা চাকুরি-জীবনে এটাই দেখে আসলুম।

আমার সেই বেয়াড়া বন্ধু নির্দিষ্ট মেয়াদের মধ্যে পরীক্ষা পাশ কর্তে পার্লেন না। টিকে থাকবার জন্যে তাঁকে বিশেষ অনুমতি নিতে হলো। তবে, পরীক্ষা পাশ কর্তেই হবে। অবশেষে আমাকে ধরে পড়লেন ঃ তুমি যদি কোচিং কর।

কোচিং কর্তে গিয়ে আমি দেখি যে তাঁর মাথাই অন্য রকম। কারণ, আমি যখন বল্লুম ঃ এই এই পরিস্থিতিতে আপনি রেজিষ্ট্রী কর্তে অস্বীকার কর্বেন। তিনি ফস করে প্রশ্ন কর্লেন ঃ পার্টি যদি না মানে! আমি অবাক হয়ে গেলুম। আইনের বিধান—পার্টির মানার না-মানার প্রশ্ন আসে কি করে!

এ রকম বহু লোকও সরকারের কর্মচারী আছেন। তাঁরা আইনের নীতি বোঝেন না। গৎ শিখেই গতানুগতিকতার পথে তাঁদের কাজ চলে। সরকারের গদীয়ান হতেও তাঁদের বাধে না। আর, এ রকম বহু কর্মচারী বোধ হয় সব দেশেই আছে।

মাহ্‌বুব-উল আলম জাতীয় লোকের সঙ্গে এঁদের সংঘাত না হয়ে পারে না। এ রকম

www.pathagar.com

বহু সংঘাতে আমার চাকুরি জীবন পূর্ণ।

তবুও উচ্চতম মহলে কি করে বিশ্বাস জন্মে গিয়েছিল যে আমি একজন ভাল অফিসার।

আমি সব সময় চাকুরি ছাড়তে প্রস্তুত ছিলুম। অবসর গ্রহণের পূর্বে (তখন পাকিস্তান হয়েছে ঃ দেশ গড়ে তোলার কাজ চলছে) আমি দরখাস্ত করি যে আমাকে ছেড়ে দেওয়া হোক, আমি কোন মৌলিক শিল্পে যোগ দিয়ে দেশ গড়ার কাজে অংশ নেব।

আমি দেশের লবণ শিল্পে যোগ দেব ঠিক করেছিলুম।

উচ্চতম মহল আমাকে ডেকে নিবৃত কর্লেন। বল্লেন ঃ আমাদের ভাল ভাল অফিসার খুব কম, আপনাকে আমরা ছাড়ছিনে।

আর, ইতিমধ্যে প্রাইভেট শিল্পে যে অবস্থা দেখলুম তাতে আমার মনে হলো ঃ সরকারী গদীয়ানদের গতানুগতিকতা তবুও সহ্য করা যায় কিন্তু শিল্পের বহু পরিচালককে মানুষ হিসেবে মেনে নিতে আমার অত্যন্ত বাধবে। তখন উচ্চতম মহলের ইচ্ছানুযায়ী দরখাস্ত তুলে নেই।

এর পাশাপাশি দেখেছি অবসর গ্রহণের বয়স হয়ে গেলেও চাকুরিয়ারা এক্সটেনশনের জন্যে কিরূপ ধর্ণা দেন, কত মিথ্যা অজুহাত খাড়া করেন এবং সুপারিশ নিয়ে এসে কত চাপ সৃষ্টি করেন।

আমি কখনও কোন এক্সটেনশন সুপারিশ করিনি।

প্রথম সংঘাত বেধেছিল সদরের সঙ্গে ২ বৎসরের মধ্যেই।

সদরের রেকর্ড-কীপার তখন অতি মাত্রায় ক্ষমতা চালাতেন। তিনি ছিলেন ভূতপূর্ব এক গদীয়ানের পুত্র। কিন্তু, তাঁর এক চাচা ছিলেন আমার অফিসে অধস্তন কর্মচারী। একবার কাজের জন্যে তাঁকে আমার কড়া শাসন কর্তে হয়। এতে সদরের আমলারা আমাকে শায়েস্তা করার জন্যে কোমর বাঁধেন। আমার অফিস থেকে যে সব রেকর্ড জমা রাখার জন্য সদর রেকর্ড রুমে পাঠান হয় সেগুলো তাঁরা এক জায়গায় ফেলে রাখেন এবং বেশ কিছু দিন পরে আমার প্রতি আদেশ ইস্যু করেন যে ঐ সকল রেকর্ডে অনেক কাটাকুটি রয়ে গেছে, সুতরাং আমি যেন নিজ খরচে গিয়ে ওগুলো ইনিশিয়েল করে দিয়ে আসি।

এরূপ ক্ষেত্রে সদরের আমলাদের আপ্যায়ন করাই নিয়ম। আমি সেটা না করে প্রত্যেক কাটাকুটিতে ঐ তারিখ বসিয়ে ইনিশিয়েল করে আসি।

এতে জেলার কর্তাকে (তখন রায় বাহাদুর সুরেশ চন্দ্র ঘটক) অফিস থেকে রিপোর্ট দেওয়া হয় যে পরবর্তী তারিখ বসানোর ফলে এ সব রেকর্ড আদালতের চোখে অবিশ্বাস্য ও অকার্যকরী হয়ে উঠতে পারে।

ওদিকে আমি জেলার কর্তাকে আঁট ভাষায় চিঠি লিখি যে যেহেতু রেকর্ডগুলো দীর্ঘকাল অরক্ষিত স্থানে পড়ে থাকতে দেওয়া হয় তারিখ-বিহীন ইনিশিয়েল কর্তে গিয়ে অফিসাররা ষড়যন্ত্রের বলি হয়ে যেতে পারেন।

www.pathagar.com

গোলটা বেশ পেকে উঠেছিল। একদিন ঘটক এসে সরেজমীন তদন্ত কর্লেন। অতঃপর একদিন রেকর্ড-কীপারের ও আমার হাতে হাত মিলিয়ে দিয়ে বলা হলো ঃ আপনারা বন্ধু হয়ে যান।

পরিণামে সরকার থেকে নিয়ম করা হয় যে পরবর্তী ইনিশিয়েলগুলির জন্যে সংশ্লিষ্ট অফিসার রেকর্ডের শেষে সার্টিফিকেট দেবেন যে তিনি ঐ তারিখে ইনিশিয়েলের অভাবগুলো পূরণ করেছেন।

এতে একটা সমস্যার সমাধান হয়ে যায়।

www.pathagar.com

অভিজ্ঞতার আলোকে

আজ আমার ৭৮ বৎসর পূর্ণ হচ্ছে। প্রায় অর্ধেক জীবন আমি সরকারের একজন চাকুরে ছিলুম। আমার বয়সী বহু নাগরিকও বেঁচে আছেন।

নাগরিকদের জন্য কোন্ আমলটি ভাল ছিল ? একটি দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের উত্তর ঃ বৃটিশ আমল। তখন কর্তৃত্ব ছিল বৃটিশ অফিসাররা। অবশ্য আমরা ছিলুম পরাধীন। কিন্তু, এ সকল অফিসারের কোন দুর্নীতি ছিল না। অফিস আদালতেও এদের ভয়ে দুর্নীতি ছড়িয়ে পড়তে পার্তো না।

এখানে এই উপ-মহাদেশে অফিসে আদালতে দুর্নীতির গোড়ার কথা বলি।

দুর্নীতির গোড়ায় ছিল পৌরাণিক যুগ থেকে এ উপ-মহাদেশের প্রশাসনিক লিখিয়ে পড়িয়ের কাজে একচেটিয়া অধিকার ভোগকারী একটা ক্ষুদ্র সমাজ যার মধ্যে ছিল ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য—বেশীর ভাগ কায়স্থ। বঙ্গদেশে এরাই 'ভদ্রলোক' বলে একটা শ্রেণীতে পরিণত হন। এই শ্রেণী হিন্দু, বৌদ্ধ, পাঠান, মোগল ইংরেজ সব আমলেই একচেটিয়া অধিকার ভোগ করেছেন।

অফিসে-আদালতে আমলাগণ কর্তৃক জন-সাধারণ থেকে নানারূপ বে-আইনী আদায় আজ পুঞ্জীভূত হয়েছে। ইহার গোড়ায় আছে এই ভদ্রলোক। কারণ লিখিয়ে পড়িয়ের সঙ্কীর্ণ কাজে তাঁরা কখনও আটকে থাকেন নি। তার সুযোগে নিজেদের প্রতিপত্তি বাড়িয়ে তাঁরা সর্বাপেক্ষা ঐশ্বর্যশালী ও ক্ষমতাশালী শ্রেণীতে পরিণত হন। তাঁরা রাজত্ব ও জমিদারীর অধিকারী হয়ে যান।

অশোক তাঁর অনুশাসনে বলেন ঃ আমার রাজুকগণ (কায়স্থগণ) শাসনকর্তা রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাদের পুরস্কার ও দণ্ড-বিধান কর্তে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছি।

আবুল ফজল তাঁর 'আইন-ই আকবরী'তে বলেন ঃ সুবে বাঙ্গালায় ৭৮৭ খানি জমিদারী ছিল। অধিকাংশ জমিদারই ছিলেন কায়স্থ।

বৃটিশ আমলে কায়স্থরা ক্ষমতার চরম শীর্ষে এসে পৌছেন।

ওদিকে মুসলমানদের অভ্যাসও দুর্নীত-মুক্ত শাসন-যন্ত্র গঠনের পরিপন্থী ছিল।

www.pathagar.com

রসূলে আকরামকে কাফের কোরেশগণ নেতৃত্ব, ধন-দৌলৎ ও সুন্দরী নারী দিতে চেয়েছিল। কিন্তু, তিনি সে সব গ্রহণ না করে দরিদ্র সমাজে মিশে গিয়ে কাজ কর্তে থাকেন। তাঁর মহান চরিত্রের একটা দিক ছিল 'মরুওৎ'—কারও সঙ্গে দেখা কর্তে গেলে একটা হাদিয়া (উপহার) নিয়ে যাওয়া—হউক তা একটা মসৃণ পাথর।

একবার আমি সূফী আবদুল ওদুদ সাহেবকে দাওয়াৎ করেছিলুম। তিনি আমার বাড়ী আসলেন পাঁউরুটি হাতে করে। ওটা ছিল হাদিয়া।

রসূলে আকরামের যুগে আদি মুসলিম সমাজ গঠনে 'মরুওৎ'-এর একটা বিশেষ কার্যকারিতা ছিল। কিন্তু মুসলমান রাজত্বে সম্ভবতঃ 'মরুওৎ'-এর ধারণা থেকে 'নযর' জন্ম লাভ করে। আমরা সম্রাট শাজাহানের ইতিহাসে দেখতে পাই উপরিস্থের সঙ্গে দেখা কর্তে গেলে উপযুক্ত রূপ 'নযর' নিয়ে যাওয়ার জন্যে তিনি উপদেশ দিচ্ছেন। এই 'নযরানা' ক্রমে উচ্চতর মহলে দুর্নীতির ধারক-বাহক হয়ে পড়ে।

ইসলামের আর একটা মানবিক বিধানেরও আমি ব্যাপক অপপ্রয়োগ হতে দেখেছি।

ইসলাম শিক্ষা দেয় ঃ তোমার দান-ধর্মের উপর গরীব আত্মীয়দের অগ্রাধিকার রয়েছে।

আমি এক জেলায় বদলী হয়ে দেখি যে সেখানকার মুসলমানদের মধ্যে রাষ্ট্রীয় কাজে আত্মীয়-প্রীতি অত্যন্ত ব্যাপক। আমি আরও দেখে আশ্চর্য হই যে তাঁরা এটাকে ব্যক্তিগত ধর্মের অঙ্গ বলে ধরে নিয়েছেন। রাষ্ট্রীয় কাজ যে ব্যক্তিগত দান-ধর্মের ব্যাপার নহে এ কথা তাঁদের বোঝাতে আমাকে অনেক বেগ পেতে হয়। তবুও বোঝাতে পেরেছিলাম বলে মনে হয় না।

লোকের ধারণা ঃ পাকিস্তান আমলে অফিসে আদালতে দুর্নীতি আরও বেড়ে যায়। আয়ুবী আমলে অফিসারদের ক্ষমতা এরূপ বাড়িয়ে দেওয়া হয় যে তাঁরা এক এক জন ক্ষুদে আয়ুব খাঁ হয়ে পড়েন। এতে দুর্নীতির ঘাঁটিগুলো আরও শক্ত হয়ে ওঠে। 'ওমবাড্স্ম্যান' বসান হবে বলে বার বার বলা হয়। কিন্তু, কাজের বেলা বসান হয় 'ইন্স্পেকশন টীম'—তাও তাঁদের কাজ কর্তে হবে নির্দিষ্ট বিষয়ে প্রশাসনিক নির্দেশ পাওয়ার পর।

লোকের ধারণা ঃ বাংলাদেশ আমলে অফিসে আদালতে জনসাধারণের কাজ পেতে আরও অসুবিধে হয়ে গেছে। আমলাদের কাজের তালীম নেই।

এক কালে আমি ও আমার কয়েকজন বন্ধু এরূপ বলাবলি কর্তুম ঃ শত্রু কে ? উত্তর ঃ কাজ। সুতরাং, সংকল্প ঃ তাকে যত তাড়াতাড়ি পারি যত ভাল রূপে পারি খতম করা। তখন আমরা খুব কাজ কর্তুম।

এক সময় আজকের প্রশাসনিক কাঠামোতে খুব উচ্চপদস্থ এক ব্যক্তি আমার সঙ্গে আলাপ কর্তে আসেন। ব্যক্তিগত নীতি নিয়ে কথা উঠলো। আমি বল্লুম ঃ নীতি হবে, যে সময়ের জন্য বরাদ্দ কাজ উহা সে সময়ে করে ফেলা, কোন "এরিয়ার" না রাখা। তিনি এই নীতি নির্ধারণে খুব খুশী হলেন। বল্লেন ঃ আমি এই নীতি আঁকড়ে থাকব।

www.pathagar.com

কিন্ত বাংলাদেশ হওয়ার পর অনেক আমলাকে দেখছি তাঁরা যেন 'শত্রু কে ? কার ?' সেটাই বোঝেন না। আর এই শত্রুকে যে যত সকাল পারা যায়, যত ভাল ভাবে পারা যায়, খতম কর্তে হবে—এরূপ কোন সঙ্কল্পও তাঁদের মধ্যে দানা বাঁধেনি। কাজেই, ভোগান্তি হচ্ছে জনসাধারণের।

তবে, জাতীয় জীবনে যে বিষ ঢুকে গিয়েছে উহা থেকে উদ্ধার পেতে না পার্লে আমাদের আদর্শভাবে দেশ গঠনের কোন আশা নেই।

এই বিষ ঢুকিয়েছিলেন লিখিয়ে পড়িয়ে শ্রেণী—বাংলাদেশের "কায়স্থগণ"। এ বিষ হলো ঃ অফিসে আদালতে তাঁদের বসানো নানাবিধ 'পাওন' বা বেআইনী চার্জ। এই বিষে আমাদের হাকিমগণ আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছেন, উকীলগণ আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছেন, জনসাধারণের একটা বিশেষ অংশ আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছেন।

এই আবহাওয়ায় নিজের মনুষ্যত্ব বজায় রেখে কাজ করা একরূপ অসম্ভব—সে মাহ্বুব-উল আলমই হউক, ধর্ম পুত্র যুধিষ্ঠিরই হউক।

আমি দেখেছি দুই শ্রেণীর লোক। এক শ্রেণী শতকরা পঁচানব্বই জন। অন্য শ্রেণীতে মাহ্বুব-উল আলমরা এবং যুধিষ্ঠিররা শতকরা পাঁচ জন।

রাস্তা দিয়ে চলতে চলতে কেউ যদি হঠাৎ ময়লার নর্দমায় পড়ে যায় সরকারী চাকুরি কর্তে কর্তে হঠাৎ সেই রূপ চাকুরিয়া দেখতে পান যে তিনি দুর্নীতির ময়লা নর্দমায় পড়ে গেছেন। তিনি তার জায়-জোগাড় না কর্লেও—এমনকি তিনি না চাইলেও তাঁর আয় বেড়ে গিয়েছে।

দুর্নীতির নর্দমায় পড়ে গেলে অবস্থা হয় দু'রকম। ঐ শতকরা পাঁচ জন শূকরের মত। ময়লা পানিতেই তাদের আনন্দ। হয়তো বড় ঘরের ছেলে তারা। কিন্তু, তখন আনন্দে মশ্গুল হয়ে ঐ পানিতে বার বার ডুব দিতে থাকে। তাদের আত্মাই বহু পূর্বে মরে গিয়েছে। 'লেখা-পড়া করে যেই গাড়ি ঘোড়া চড়ে সেই' তারা ভাবে ঃ এত দিনে উন্নতির পথ পাওয়া গেল, আর সে পথে অগ্রসর হতে থাকে।

একবার আমি এক বাচ্চা-চাকর রেখেছিলাম। তখনও আমি অফিস-শাসনে পোক্ত হইনি। আইনে যেরূপ লেখা আছে সব কাজ নিজের হাতে কর্তুম। দলীল রেজিষ্ট্রীর ফীস নিজের হাতে নিতুম, নিজেই ক্যাশ মিলাতুম আর সে ক্যাশ লোহার সিন্ধুকে তুলে রাখতুম। তখনও এক টাকার নোটের ব্যাপক চলন হয়নি। চাঁদির মুদ্রা দিয়েই লোকে ফীস্ আদায় কর্তো। সেটা তাক করে আমি সাজাতুম। কাজ শেষ কর্তে সন্ধ্যে হয়ে রাত বাড়তে থাকতো। আমলা পিয়নরা তখন বাড়ি চলে গিয়েছেন। শুধু বাচ্চা চাকরটি এজ্লাসের সামনে রাখা টেবিলে ঘুমিয়ে আছে।

ক্যাশ মিলানোর সময় দেখা গেল দুটো টাকা কম পড়েছে। আশ্চর্য ! তখন আমার আত্ম-বিশ্বাস অগাধ। ভুল করেছি এটা মেনে নেওয়া প্রায় অসম্ভব। অথচ, ব্যাপারটাও বোধগম্য হলো না। তবে দু'টাকা দণ্ড দিয়ে ক্যাশ পূরণ করে রাখতে হলো।

আরও একদিন দু'টাকা কম। তাও দণ্ড দেওয়া ছাড়া উপায় থাকলো না।

www.pathagar.com

পরের সপ্তাহ। লোহার সিন্ধুকের চাবি থাকতো আমার বালিশের তলায়। বাসার অভাবে সেই কামরাতেই আমি শোতুম। কত টাকা ক্যাশ রেখেছিলাম সেটা আমার স্পষ্ট মনে আছে। আশ্চর্য ব্যাপার! কাজের সময় ক্যাশ খুলে দেখি দুই টাকা কম। ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে গেল। বুড়া পিয়নটার অসুখ হয়েছিল। তার ছেলেকে পাঠিয়েছিল বদলী। সে মুহূর্তে সে বাড়ি গিয়েছিল খেয়ে আসতে। আমলারা ঠিক কর্লেন সে-ই অপরাধী। বালিশের তলা থেকে চাবি নিয়ে দু'টাকা মেরে দিয়েছে।

অফিসে দলিল লেখকের কাজ কর্তো, অন্য অনেকের সঙ্গে গোলাম রহমান। জীবনের যৌবন অংশ বহু দেশে ঘোরাঘুরি করে কাটিয়েছেন। হেন পাপ নেই করেননি। হেন গুণ্ডা পাণ্ডা বদমাশ নেই যার দলে মিশেননি। এখন প্রৌঢ়ত্বে বাড়ী ফিরে এসে এই দলীল লেখকের কাজ নিয়ে সংসার গড়ে তোলার কাজে ব্যস্ত আছেন।

গোলাম রহমান বল্লেন ঃ পিয়ন কখনও টাকা চুরি করেনি। যে চুরি করেছে তাকে কিছুক্ষণের মধ্যেই আমি আপনার কাছে নিয়ে আসছি।

গোলাম রহমান আস্তে আস্তে কথা বলেন ঃ সব সময়ে মুখে চোখে একটা হাসি। কিন্তু সেই মুখই হঠাৎ এমন বীভৎস ও ভীষণ হয়ে উঠতে পারে যে অতি বড় দুবৃত্তেরও তাতে হৃদকম্প না হয়ে যায় না।

ক্ষণিক পরেই গোলাম রহমান আমার বাচ্চা চাকরকে সামনে নিয়ে আসলেন। চোখ দিয়ে আগুন ঠিকরাচ্ছে। আমাকে বল্লেন ঃ দেখুন এর বুক কেমন জোরে জোরে ধড়াস্ ধড়াস্ কচ্ছে। চাকরটি আমার পায়ের উপর লুটিয়ে পড়ল। বল্লে ঃ সব টাকা আমি নিয়েছি। আপনি এর হাত থেকে আমাকে বাঁচান।

সে ঘুমের ভান করে শুয়ে থাকত আর হাত বাড়িয়ে আমার অন্যমনস্কতার সুযোগে তাক থেকে টাকা নিয়ে ফেলত। আজ বালিসের তলা থেকে চাবি নিয়ে দুই টাকা লোহার সিন্ধুক থেকে সরিয়ে ফেলেছিল।

সামান্য ঘটনা। কিন্তু, এর শিক্ষা অসামান্য। চাকরটির মাসিক বেতন ঠিক হয়েছিল মাসে চার টাকা। কিন্তু সে তার মাকে সপ্তাহে চার টাকা করে জমা দিতে শুরু করেছিল। মায়ে পোয়ে ঠিক করেছিল তাদের উন্নতির পথ খুলে গিয়েছিল আর কি। তাই মানৎ করেছিল দশ টাকা জমলেই তারা প্রথমে একটা মিলাদ মাহফিল বসাবে।

আমার জীবনের অভিজ্ঞতা এই যে সংসার করার নামে কতক লোক দুধ বেচে মদ কিনছে তার কতক লোক মদ বেচে দুধ কিনছে।

গোড়াতে আমি যে সরকারী তালিকা দেখে বারবরদারী আদায় কর্তুম পথটা তার চেয়ে কম মনে হলে হিসেব করে বাড়তি টাকা পার্টিকে এমনি ফেরৎ দিতুম। সেই আমিই যখন দুর্নীতির ময়লা নর্দমায় পড়ে গেলুম আমার অন্তরাত্মা ব্যথিত হয়ে আল্লাহ্‌র কাছে কাঁদতো ঃ আমাকে এই পতন থেকে উদ্ধার করো।

শতকরা পাঁচজনের আত্মা এ ভাবে কাঁদে। আল্লাহ্ তাদের উদ্ধারও করেন।

www.pathagar.com

লেখা-পড়ার "অভিশাপ"

একবার এক রেল ষ্টেশনে ট্রেন আসার অপেক্ষা কচ্ছিলুম।

একজন এসে আমাকে সালাম কর্লেন—দূর সম্পর্কে আমার ভাগ্নে।

আমার বন্ধুগণ জানেন যে আমার দু'টা বড় দোষ আছে ঃ লোককে জিগ্যেস করা বাড়ি কোথায়, ছেলে মেয়ে ক'টি ? একবার পশ্চিম পাকিস্তানে এক জনকে এটা জিগ্যেস কর্তেই ভয়ানক চটে মটে উঠেছিলেন। প্রশ্ন করেছিলেন ঃ আপনার প্রয়োজন? আমি তাঁকে এই বলে শান্ত কর্তে চেয়েছিলুম ঃ প্রয়োজন কিছুই নয়। চট্টগ্রামে আমার বাড়ি, চৌদ্দটি ছেলে মেয়ে আছে, তাদের নিয়ে আল্লাহ্তালা বড়ই সুখে রেখেছেন। আমি আশা কচ্ছি যে নিজ বাড়ীতে ছেলে মেয়ে নিয়ে আপনি তেমনি সুখে আছেন।

ভাগ্নের বাড়ি কোথায় জানা। জিগ্যেস কর্লুম ঃ কয়টি ছেলে মেয়ে ? ভাগ্নে বল্লে ঃ একটি মাত্র মেয়ে। তারপর দীর্ঘ একটি নিঃশ্বাস ফেল্লে। বল্লে ঃ মেয়েটিকে বেশী লেখা-পড়া করাতে পারিনি।

কোমল হয়ে বল্লুম ঃ এই কথা ? আচ্ছা আমরা যে গ্রামে গেলে আদর-বাসনা পাই আমাদের মা-মাসী, ফুপু-জ্যেঠী থেকে—যাঁরা গ্রামকে সোনার সংসার করে রেখেছেন তাঁরা কি লেখা-পড়া জানা লোক?

ঃ না।

ঃ আর অফিসে আদালতে দেশের সর্বত্র একদল লোক যে কলমের উগায় রামের জিনিস শ্যামকে দিয়ে দিচ্ছে, আলী আর খলিলে যে মামলা মোকদ্দমা জুড়ে দিয়ে উভয় পক্ষকে শুষে খাচ্ছে, নিত্য যে জনসাধারণের যন্ত্রণা বাড়িয়ে দিচ্ছে, এরা?

ঃ এরা লেখা-পড়া জানা লোক।

ঃ তবে ? দ্যাখো, কোরানে লেখা-পড়াকে তেমন মূল্য দেয়া হয়নি। বরং, দেখানো হয়েছে যে সমাজের সঙ্কটের দিনে লেখা-পড়ায় পণ্ডিত লোকেরাই তাকে ভুল পথে নিয়ে যায়। বনি ইস্রায়েলকে চালিয়ে নিচ্ছিলেন পয়গম্বর হারুণ, মুক্তির দেশ মিসরের দিকে। একবার তাঁকে অন্য কাজে যেতে হয়েছিল। এই সুযোগে পণ্ডিত সামেরী বনি-ইস্রায়েল

www.pathagar.com

পরামর্শ দিলেন ঃ চলো, আমরা সোনার বাছুর বানিয়ে তাকে পূজো করি। হারুণ ফিরে এসে দেখেন সামেরীর দৃষ্টান্তে সমাজ পৌত্তলিকতার অজ্ঞান অন্ধকারে ডুবে গেছে।

কোরানে বলা হয়েছে লোকের ভাল হওয়াই আসল কথা।

দার্জিলিং-এ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের মৃত্যু হয়। গান্ধী সেই সময় তাঁর সঙ্গে ছিলেন। দেশবন্ধুর শব নিয়ে কোলকাতা আসেন। বক্তৃতা কর্তে উঠে গান্ধী বল্লেন ঃ আমি তাঁর সঙ্গে থেকে বুঝতে পার্লুম শুধু তিনি কত বড় তাই-না, কিন্তু তিনি কত ভাল ছিলেন তা-ও। অর্থাৎ বড় হওয়ার চেয়েও অনেক উর্ধ্বে হলো ভাল হওয়া। এটা কোরানের শিক্ষার সঙ্গেও মেলে।

কোরানে যাঁকে পূর্ণাঙ্গ মানুষ বলা হয়েছে—সেই রসূলে আকরাম ছিলেন নিরক্ষর। এখন সাক্ষর লোকদের বলা হয় বুদ্ধিজীবী। কিন্তু, কোরানে কোথাও সাক্ষর লোকের প্রশংসা নেই। একদিকে সব চেয়ে ভাল লোক যেমন বলা হয়েছে নিরক্ষর রসূলে আকরামকে অন্যদিকে তেমন ভালত্বের পুরষ্কার ঘোষণা করা হয়েছে ঃ তোমাকে ভাল লোকদের সাথে আসন দেব।

ভাগ্নেকে বল্লুম ঃ তোমার মেয়েকে লেখা-পড়া শেখাওনি সেটা বড় কথা নয়। প্রশ্ন হলো ঃ তুমি তাকে একটা ভাল মেয়ে করেছো কি না ?

আজকাল লেখা-পড়া শিখে মানুষ যে অতিরিক্ত শক্তির অধিকারী হয়েছে সেটাকে কাজে লাগিয়েছে নিজের বৈষয়িক উন্নতিতে, দেশের সার্বিক উন্নতিতে নয়। সামাজিক বোধ ক্রমেই লোপ পাচ্ছে।

অথচ, রসূলে আকরামের জীবন থেকে আমরা যে শিক্ষা পাই, কোরান থেকে আমরা যে দু'টি প্রধান অনুশাসন লাভ করি, সুন্দরতর সমাজ এবং সুন্দরতম রাষ্ট্র গঠনের জন্যে তাই যথেষ্ট।

কোরেশরা তাঁকে নেতৃত্ব, ধন-দৌলৎ এবং দেশের শ্রেষ্ঠা সুন্দরী রমণী দিতে চেয়েছিল। কিন্তু, তিনি তার কোনটাই গ্রহণ না করে গরীবদের দলে মিশে গেলেন। আর, বল্লেন ঃ দারিদ্র্যই আমার গৌরব।

তিনি এমন সমাজে মিশে গেলেন, যে সমাজে লোক সব চেয়ে বেশী—যাকে বলা চলে 'জন-সাধারণ'—আর এই সমাজকে তিনি সুন্দর করে গড়ে তুল্লেন ভ্রাতৃত্ববোধ দ্বারা।

সেই ভ্রাতৃত্বের রকম ছিল ঃ ঘরে দুয়ারে ঐশ্বর্যে কেউ সাধারণকে ছাড়িয়ে অসাধারণ হতে চাইলে সেটাকে দূষণীয় মনে করা হতো। ঐশ্বর্যশালী রাত্রে আল্লার কাছে কাঁদতো ঃ রসূলে আকরামের নেই, হযরত আবু বকরের নেই, আমাকে এত দিলে কেন ? আমি কি করে এর হিসাব দেব?

এখন আমরা প্রত্যেকেই চাই ঃ ভাইয়ের থেকে আমার বেশী হোক, আমার দালানখানা সকলের চেয়ে উঁচু হোক, তারপরও দৌলৎ বাড়তে থাকে আমি পাহাড়ের শীর্ষে গিয়ে বাড়ী কর্বো।

www.pathagar.com

এরূপে সাধারণকে ছাড়িয়ে অসাধারণের তপস্যা কর্তে গিয়ে আমরা রসূলে আকরামের আদর্শকে জবাই করে চলেছি। বর্তমানে বাঙ্গালীদের ন্যায় এত আত্ম-পরায়ণ জাত আর নেই।

কোরানের একটা প্রধান অনুশাসন হলো ঃ আল্লাহ্‌র হকের চেয়েও বান্দার হক বড়। আল্লাহ্‌র হক ক্ষতি কর্লে আল্লাহ্ মাফও কর্তে পারেন—কেননা তিনি গফুরুর রহিম ঃ ক্ষমাশীল দয়ালু। কিন্তু, বান্দার হক ক্ষতি কর্লে আল্লাহ্‌ও তা' মাফ কর্তে পারেন না যতক্ষণ না সেই বান্দা মাফ করেছে। কিন্তু, এই বাংলাদেশে খাদ্য দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধির ফলে লক্ষ লক্ষ লোক না খেয়ে মরেছে—যেহেতু যারা নামাজ পড়ে রোযা রেখে আল্লাহ্‌র হক আদায় করেছে তাদের মধ্যে বহু লোক তার ভাইয়ের হকের ক্ষতি করেছে—ঐ আত্ম-পরায়ণতার দরুণ।

কোরানের আর একটি অনুশাসন হলো ঃ সত্যের জন্য দাঁড়াও—দাঁড়িয়ে নিজের প্রাণ দাও, অপরের প্রাণ নাও। এরই নাম জেহাদ। এখন আত্ম-পরায়ণতার দরুণ জেহাদের ধারণা মুসলমানের মন থেকে একদম ধুয়ে মুছে গিয়েছে।

দেশের অবস্থা পূর্বেও যে অধিকতর ভাল ছিল জাতীয়তার দিক থেকে এরূপ মনে করার কোন কারণ নেই। এই দেশের ইতিহাসে দেখা যায় ঃ ৭৫০ খৃষ্টাব্দের সমসময়ে গোপাল রাজা নির্বাচিত হচ্ছেন। ১৪৯৩ খৃষ্টাব্দে হোসেন শাহ সুলতান নির্বাচিত হচ্ছেন। এই সকল নির্বাচন সম্বন্ধে আমাদের অনেক কথাই জানবার আছে।

গরীবদের অল্পে সন্তুষ্ট থাকার অভ্যেস ও সাধনা আছে। তাই রিক্সাওয়ালা কর্তৃক যাত্রীর ভুলে ফেলে যাওয়া টাকার তোড়া প্রত্যর্পণের ঘটনা খবরের কাগজে আমরা মাঝে মাঝে প্রায়ই দেখতে পাই।

আত্ম-পরায়ণতা সর্বগ্রাসী হয়ে ঢুকেছে লেখা-পড়া জানা লোকদের ভিতর—যাকে আমরা একটা অদ্ভুত নাম দিয়েছি ঃ 'বুদ্ধিজীবী'। বুদ্ধিজীবিতাই হয়েছে আমাদের কাল। বুদ্ধিকে উস্‌কাতে গিয়ে আমরা হৃদয়কে খুন করে ফেলেছি। নিঃস্বার্থ সেবা কাকে বলে তা' আমরা ভুলে গিয়েছি। আত্ম-পরায়ণতা শুধু নয়, আমরা আত্ম-প্রতারকও হয়ে পড়েছি। একবার খুব এক 'ব্যাকওয়ার্ড' এলাকায় আমি বদলী হলুম। রাস্তাঘাট নেই, যান-বাহনের খুব অসুবিধে, এলাকাটা যেন পঞ্চাশ বৎসর পিছনে পড়ে আছে। পাঁচ মাইল গেলে এক মধ্য ইংরেজী স্কুল আছে। সুতরাং স্বাক্ষরতা খুব কম। আশ্চর্য ব্যাপার, শিক্ষক কয়জন প্রাচীন আদর্শে বিশ্বাস করেন।

কয়দিন আগে পুলিস সুপার এসেছিলেন। এই এলাকায় অনেক ঘাগু চোরের বাস। তারা জেলার বহু দূর পর্যন্ত চুরি করে বেড়ায়। প্রত্যেক গ্রামেই এক আধ জন মাতব্বর আছেন, তাঁরা চোরের 'খাতিদার।' কার হাতে কয়জন চোর আছে এবং কে-কে এটা অনুচ্চারিত হলেও সকলেরই জানা-শোনা—এটা এই এলাকার পুরুষানুক্রমে বহু দিনের ঐতিহ্য। এই ঐতিহ্যের উপর নির্ভর করে জায়গাটি যেন নিরুপদ্রবে ঘুমিয়ে আছে। কিন্তু এবার পুলিস সুপার সেই ঘুমে চিড় ধরিয়েছেন। বলেছেন ঃ গ্রাম রক্ষী দল গঠন কর্তে

www.pathagar.com

হবে। শুনে এরা অবাক হয়ে গেছে। এরাতো 'দেশে' চুরি করে না। শুধু খাতিদারে খাতিদারে যখন লাগে তখন চোর লাগিয়ে দিয়ে একজন অপরজনকে একেবারে 'জের বার' করে ফেলে—এমন কি গ্রাম ছেড়ে অধিবাসীরা পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছে তারও নজির আছে। আর গত পঁচিশ বৎসর ধরে কাল-মম এ বিষয়ে অপ্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে রয়েছেন—তাও সকলের জানা-শোনা।

আর, এমন এলাকায়ও 'ঋণ-সালিসী বোর্ড' বসানো হয়েছে—আমি যার চেয়ারম্যান।

মোটে সাড়ে তিন মাস আমাকে থাকতে হবে। পুলিস সুপারের আশা ঃ এর মধ্যে গ্রাম রক্ষী দল গঠন হয়ে যাবে। এস্-ডি-ও'র আশা ঃ ঋণ-সালিসীর নিষ্পত্তি অনেক দূর এগিয়ে যাবে।

ঋণ-সালিসীতে এসেছেন এক বৃদ্ধ—গায়ের লোম পর্যন্ত পেকে গিয়েছে। কিন্তু, মুখের আদল এমন সুন্দর, গায়ের রং এত চমৎকার দেখে থাকতে ইচ্ছে হয়। আমি তাঁকে ডেকে কাছে বসালুম। জিগ্যেস কর্লুম ঃ এই বয়সে এত সুন্দর শরীর কি করে রাখলেন ? বল্লেন ঃ হুজুর, আমার নাম হামিদ আলী তেলী। আমি খাঁটি সরিষার তেল পেষাই করি, নিজে খাই, অপরকেও খাওয়াই।

আশ্চর্য জায়গা, কোন কিছুতে ভেজাল নেই। খাঁটি সরিষা, খাঁটি তিসি, খাঁটি মধু, সব কিছুই খাঁটি। ইস্তক—দুধ, দৈ। ভেজাল বিদ্যাটা যেন এদের জানা নেই। হউক চোর, তবুও যেন ভালবাসতে ইচ্ছে করে। 'চুরি বিদ্যা বড় বিদ্যা যদি না পড়ে ধরা'—এই প্রাচীন সুবচনে এরা বিশ্বাসী।

তবে, মানুষ ভেজাল হওয়া শুরু হয়েছে।

এখানে একজন নূতন নেতার অভ্যুদয় হচ্ছে। তিনি শহরে শিক্ষিত। নাম গোরা চাঁদ মিঞা—তিনি বলেন, লিখেন এবং সরকারী মহলে জানা তাঁর নাম জি.সি. মিঞা। এই নাম আধুনিকতার লক্ষণ, বুদ্ধিজীবিতার নিদর্শন।

নিজে একখানা প্রাথমিক স্কুল করেছেন—জি. সি. মিঞা প্রাইমারী স্কুল। ভাল বক্তৃতা কর্তে পারেন। কর্তৃপক্ষ ঠাওরালেন ঃ আমি থাকব সব কাজে প্রেসিডেন্ট, জি.সি. মিঞা থাকবেন সেক্রেটারী।

কিন্তু, সংগঠন করার পর জি.সি. মিঞা ডুব দিলেন। আমার সঙ্গে দেখাও করেন না, সংগঠনের কাজও এগোয় না।

ব্যাপার কি ? এলাকার সব গ্রামেরই চোরেরা বুঝে নিয়েছে ঃ এবার গ্রামে গ্রামে আর খাতিদার থাকবে না, সব দেশের উপর একজন মাত্র খাতিদার থাকবে—তার নাম জি.সি. মিঞা।

সংবাদদাতা বল্লে ঃ রাত্রে চোরদের আনা সোনা গলায় দিয়ে ঘুমোয়। জি.সি. মিঞা আপনাদের সঙ্গে দেখা করে কখন ? এই কয় দিনে কয়েক লাখ টাকার মানুষ হয়ে গেল।

www.pathagar.com

মওলানা আকরাম খাঁ

মওলানা আকরাম খাঁ আমার মত মুসলমান ছেলেদের নিজেকে জানার এবং নিজের সমাজকে জানার চাহিদা পূর্ণ কর্তেন!

ঢাকায় ১৯৫৩ সালে ৩০শে নভেম্বর, ২৫শে ও ২৬শে ডিসেম্বর তাঁর বাড়ীতে সাক্ষাৎ করি। তখন আমার বয়স ৫৪ বৎসর চলছে।

তিনি বলেছিলেন ঃ ২৪শে জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার ফজরের আজানের সময় তিনি প্রসূত হয়েছিলেন। "আগামী ২৩শে জ্যৈষ্ঠ আমার ৭৭ বৎসর পূর্ণ হবে।"

সুতরাং, আমার থেকে প্রায় ২৩ বৎসরের বড় ছিলেন।

যখন উভয়ের দেখা হলো তার আগেই আমি তাঁর নিকট সুপরিচিত ছিলুম।

তখনকার দিনের জনপ্রিয় লেখা আমার 'পল্টন-জীবনের স্মৃতি' তাঁর 'মাসিক মোহাম্মদী'তে ধারাবাহিকভাবে বের হতো বলে। তিনি ছেলে-মেয়েদের বিয়ে-শাদীতে আমাকে নিমন্ত্রণ-পত্র পাঠাতেন আর আমার প্রথম দিকে প্রকাশিত গ্রন্থ 'বার্মার হাঙ্গামা' বিনা পয়সায় ৫০০ কপি ছেপে দিয়ে আমার নিকট পাঠিয়েছিলেন।

আমি যখন চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুলে শ্রেণী ৭-এ পড়তাম ১৯১২ সালে—থাকতুম আবদুল আজিজ বি-এ'র ভিক্টোরিয়া ইসলাম হষ্টেলে—তখন হষ্টেলের রীডিং রুমে মুসলমান ছাত্রদের খুব সভা-সমিতি হতো আর সারা শহরের জাগ্রতমনা মুসলমান ছাত্ররাই ওতে যোগদান কর্তো।

উঠন্ত লিখিয়ে বলে আমার পরিচয় হয়ে গিয়েছিল এবং আমি যাঁদের সংস্পর্শে এসেছিলাম তার মধ্যে ছিলেন নজির আহ্‌মদ চৌধুরী।

তিনি এসেছিলেন অত্যন্ত পশ্চাদপদ থানা বাঁশখালীর ডোঙ্গরা গ্রাম থেকে। যৌবনের অনেকখানি ব্যয় করেছিলেন মাদ্রাসায় আরবী বিদ্যে শেষ করে আলেম হতে। এখন কাঁচাপাকা চুল নিয়ে তিনি স্কুলে আবার আমার সমান ক্লাসে পড়ছিলেন।

চট্টগ্রামের এই নজির আহ্‌মদ চৌধুরী দীর্ঘকাল মওলানার প্রবর্তিত 'সাপ্তাহিক মোহাম্মদী'র সম্পাদক ছিলেন।

www.pathagar.com

মওলানা আকরাম খাঁরা এক কালে ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরদের সমগোত্র ছিলেন। এঁরা প্রতিমা পূজার বিরোধী ছিলেন এবং 'পীরালি ব্রাহ্মণ' নামে সুপরিচিত ছিলেন।

আলেমদের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন 'এজিটেটর' শ্রেণীর যেটা ছিল রাজনীতির প্রাথমিক অবস্থা। দ্বিতীয় অবস্থা ছিল 'অর্গেনাইজার' বা সংগঠনকারী। বাঙ্গালী মুসলমানকে একখানি সংবাদপত্র দেওয়ার ব্যাপারে মওলানা আকরাম খাঁ যে সংগঠনী প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন উহার কোন তুলনা মিলে না। বাংলার মুসলমানদের জাগরণে 'সাপ্তাহিক মোহাম্মদী' এক গৌরব-জনক পরিপূর্ণ ও অনন্য ভূমিকা পালন করেছে।

মওলানা আকরাম খাঁ হজ্জ করেছিলেন। কিন্তু, হজ্জ সমাধা করে ফিরে এসেই পত্রিকায় অনুরোধ করেন যে কেহ যেন তাঁকে আল্‌হাজ্জ বা হাজী ইত্যাদি সম্বোধন না করেন। তাঁর এই কাজটা আমার বিশেষ ভাল লেগেছিল।

বশিরহাট মহকুমার হাকিমপুরে ছিল তাঁদের নিবাস। বলেন ঃ আমার বাবা মওলানা আবদুল বারী খাঁ ছিলেন মোহাদ্দেস আলেম। মায়ের নাম রাবেয়া খানম। মায়ের নিকট আমি গুলিস্তাঁ পড়েছিলাম।

ঃ যখন আমার বয়স তের/চৌদ্দ তখন কলেরায় দুইদিনে আমার বাবা-মা উভয়েই মারা গেলেন। তখন আমি নানা-নানীর নিকট মানুষ হতে থাকি।

ঃ আমি পড়ছিলাম লায়েক জুবিলী স্কুলে। শ্রেণী ৬ ও ৭ পড়ি। শ্রেণী ৮-এর ষান্মাসিক পরীক্ষা পর্যন্ত ছিলুম। আমার চাচাতো ভাইয়েরা পড়তো সিটিতে।

ঃ ১৯০০ সালে আমি মাদ্রাসা পাস করি। তর্ক-প্রতিযোগিতায় এবং ফুটবলে আমি খুব ভাল ছিলাম। ইরাণী-আমাদের সঙ্গে খেলতো।

ঃ আমাদের একই বংশের আব্দুল আজিজের কন্যার সহিত আমার শাদী হয়। তিনি হতেন সম্পর্কে আমার চাচা। ডাক্তার হবেন বলে মেডিক্যালে ঢুকেছিলেন। কিন্তু, দু'মাস পরেই তাঁর মৃত্যু হয়েছিল।

ঃ আমার মামুরা খুব বঙ্কিম চন্দ্র পড়তেন। তখন আমাদের ভাষায় প্রায় সাড়ে চার হাজার মুসলমানী শব্দ ছিল যা মুসলমান ও হিন্দু উভয়েই ব্যবহার কর্তো। পরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় মুসলিম-বিরোধী তৎপরতা শুরু করে। এখন ঐরূপ শব্দ পূর্বের তুলনায় কমে গিয়ে শতকরা ২৫-এ এসে দাঁড়িয়েছে।

ঃ পকেটে আট টাকা তের পয়সা নিয়ে কলিকাতা রওয়ানা হলাম। কায়কোবাদের 'মহাশ্মশান' কাব্য বেরুলে আমরা পঞ্চাশ কপি বিক্রী করে দি। তখন আমাদের আস্তানায় হিতবাদী ও বঙ্গবাসী আসত। ডাক-পিয়নরা ছিল হিন্দু। তারা কোন মুসলমানের বাড়িতেই ঢুকতো না। পত্রিকার জন্য মুসলমানদের সেকি আকুলি-বিকুলি !

ঃ ১৯১০। তখন আলতাফী প্রেস হয়েছে। মালিক হাজী আবদুল্লা। কেরোসিনের ডীলার এবং বেকারীর মালিক। কিন্তু, লেখা-পড়া জানেন না। ওদিকে ছয় লক্ষ টাকার

www.pathagar.com

এক ওক্‌ফ করে বসেছেন। ম্যানেজার হলেন ঃ মওলানা আব্বাস আলী। আমি আলতাফী প্রেসে চাকুরি নিলুম। বেতন মাসে পোনর টাকা। এই বেতনে দেড় বৎসর কাজ কর্লুম। অতঃপর বেতন হলো চল্লিশ টাকা। কিন্তু, ততদিনে হাজী আবদুল্লার এক ভাগ্নী প্রেসের মালিক হয়ে পড়েছেন। তিনি এবং মওলানা আব্বাস আলী এই বেতন বেশী বলে আপত্তি তুল্লেন। তখন এই চাকুরি ছেড়ে দিলুম।

ঃ কাগজ কর্তে চাই। কিন্তু, টাকার যোগাড় কই ? তখন বটতলার বইয়ের দোকানদারদের মধ্যে আফাজুদ্দীন খুব চালু। আমাকে চিনতেনও। কাগজ করার ইচ্ছে তাঁকে জানালুম। বল্লেন ঃ কাগজ করে কি হবে ? কেতাব লিখুন। কেতাব ঠিক হলো ঃ 'বাঙ্গালা ফরায়েজ'। পিতার নিকট বিষয়টা আমি শিক্ষা শুরু করি, মাদ্রাসায় পড়বার সময় জ্ঞানটা আমি আরও পোক্ত করে নেই। আমি তাঁকে বই লিখে দিলুম। তিনি আমাকে ষাট টাকা দিয়ে দিলেন। কিন্তু, সে বই আর প্রকাশিত হয়নি।

ঃ আমাদের পরিবার ওহাবী আন্দোলনের সঙ্গে প্রথম দিন থেকেই জড়িত। ওর দায়-দায়িত্ব আমরা উত্তরাধিকার সূত্রেই লাভ করেছি। যোদ্ধা ছিল মুসলমানরাই। বঙ্কিম চন্দ্র আমিও খুব পড়তাম। তবে, তাঁর লেখা আমাকে অনুপ্রাণিত করতো অন্যভাবে।

ঃ মায়ের বড় ভাই ছিলেন আব্দুল হামিদ খাঁ, আর ছোট ভাই দাউদ খাঁ। তবে, বড় মামাকে মনে করা হতো 'মাথা খারাপ'।

ঃ তখন 'মিহির ও সুধাকর' চালু হয়েছে। এর পেছনে ছিলেন নওয়াব শমসুল হুদা। পরে এটা কিনে নেন নওয়াব সিরাজুল ইসলাম। তাঁর সাথে জুটেছিলেন নওয়াব আলী চৌধুরী। তাঁদের ব্যক্তিগত কিছু 'মতলব' ছিল। পত্রিকা দ্বারা উহা 'হাসিল' হতো।

ঃ আমি কাগজ কর্বার আশায় তাঁদের পরামর্শ নিতে গেলুম। কিন্তু, তাঁরা আমাকে নিরুৎসাহিত কর্লেন। বল্লেন ঃ 'লোকসান হোতা হ্যায়'।

ঃ তবে আমার এক সহায় জুটে গেলেন ঃ গ্রাম সম্পর্কে আমার এক মামা, নাম ওবেদুল্লা, এক চামড়াওয়ালার ওখানে কাজ কর্তেন। তিনি আমাকে বসুমতির উপেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়ের নিকট নিয়ে গেলেন। উপেন বাবু আমাকে খুব উৎসাহ দিলেন। বল্লেন ঃ পার্বে, তুমি খুব পার্বে। আর, এখুনি তো উপযুক্ত সময়। আমি তোমাকে একখানা ইলেক্‌ট্রিক ম্যাশিন দেব তবে কাগজে আমার একটা শেয়ার থাকবে।

ঃ কিন্তু ওবেদুল্লা এতে রাজী হলেন না। আর আমার মুরুব্বীরাও কাগজ করার প্রস্তাবের বিরোধিতা কর্তে লাগলেন। বল্লেন ঃ তুমি দেখছি একটা গণ্ডগোল না বাধিয়ে ছাড়বে না।

ঃ মোহাম্মদী'র অনুষ্ঠান-পত্র ছাপা হয়েছিল 'জবা কুসুম প্রেস'-এ। তখন রওশন আলী চৌধুরী আমার সাথে খুব খাটছিলেন। শুক্রবার কাগজ বের হবে ঠিক হয়েছিল। কিন্তু দেরী হয়ে গিয়ে বুধবার এসে যায়। তখন, বুধবার বলেই ঘোষণা করা হলো। পরিণামে শুক্রবার দাঁড়িয়ে যায়।

ঃ ১৯১৪। 'মোহাম্মদী'র জন্যে মেশিন কেনার চেষ্টায় শেষ পর্যন্ত আবার হাজী

www.pathagar.com

আবদুল্লার নিকট ধর্ণা দিতে হলো। তিনি কথা দিলেন ঃ মগরেবের পরে থাকবেন। আমরা তখন গেলুম। তিনি লোকজন ডাকালেন। কর্মচারী নলিনী সরকারকে আদেশ কর্লেন ঃ হিসেব করো। সরকার হিসেব করে পেশ কর্লেন। দেখে তিনি বল্লেন ঃ সে হিসেব নয়। মওলানা আব্বাস আলীকে জিগ্যেস কর্লেন ঃ হিতবাদীর সে বুড়ো শেষ বারে কত করে বলেছিল ? মওলানা বল্লেন ঃ দুইশ টাকা করে। আদেশ কর্লেন ঃ তাই হিসেব করো। কিন্তু, আমার কর্মচারীরা আপত্তি তুল্লেন। বল্লেন ঃ অত টাকা আমরা দিতে পার্বো না।

ঃ হাজী সাহেব বল্লেন ঃ একটা মেশিন আমার পকেট থেকে ছয় হাজার টাকায় কেনা। ওটাই আপনাদের দিয়ে দিচ্ছি। মওলানাকে বল্লেন ঃ কালই ওটাকে উঠিয়ে তাঁদের ওখানে নিয়ে যেতে দেন। তখন সেই মামা ওবেদুল্লার সাথে আমার উৎসাহী সাথী জুটেছেন কবি মোজাম্মেল হক এবং এয়াকুব আলী চৌধুরী। তাঁদের চেষ্টায় শিয়ালদার নিকট একখানা ঘর নেওয়া হলো এবং প্রেস সেখানে স্থাপন করা হলো।

ঃ কয়দিন পরেই হাজী সাহেব খবর নিলেন ঃ কেমন চলছে ? মোহাম্মদীর লোক বল্লে ঃ মেশিন বসান হয়েছে। তবে কাগজের খরচ চলছে না। তখন হাজী সাহেব পাঁচ শত টাকার নোট বেঁধে তার হাতে দিলেন। মামা আবদুল্লার চামড়াওয়ালা ছিলেন 'আতা মোল্লা'। পুরো নাম ছিল আতাউল হক মোল্লা। তিনি খুব বড় চামড়াওয়ালা ছিলেন। তাঁর ক্যাশিয়ার ছিলেন আমার আরেক মামা নূরুল হক খাঁ। ক্যাশিয়ারের মুখে মোহাম্মদীর সঙ্কটের খবর পেয়ে মোল্লা পাঁচ শত টাকা পাঠিয়ে দিলেন।

ঃ ত্রিপোলী যুদ্ধে তুর্কীর যোগদান মোহাম্মদীর জন্য নূতন সঙ্কট নিয়ে এলো। কারণ, বৃটিশের সহানুভূতি ছিল ইটালীর পক্ষে, সুতরাং, তুর্কীর বিপক্ষে। তখন কড়া প্রেস য়্যাক্টের যুগ। সরকারের প্রেস অফিসার ছিলেন নওয়াব আবদুল লতিফের ছেলে এ এফ এম আবদুস সোব্হান। তিনি সরকারের পক্ষে জানালেন ঃ যুদ্ধ নিয়ে যেন কোন মন্তব্য করা না হয়। তিনি নিজে এসে মোহাম্মদী' থেকে এ মর্মে একটা অঙ্গীকারও লিখিয়ে নিলেন। পরে মোহাম্মদীর ভাষা নিয়ে বাধল গোল। সরকার বল্লেন ঃ অঙ্গীকার ভঙ্গ করা হয়েছে। তখন প্রেস য়্যাক্টে ফেলে মোহাম্মদীর নিকট তিন শত টাকা জামানৎ চাওয়া হলো। সে জামানৎ দিতে হলো। প্রেস য়্যাক্টে বাংলাদেশে উহাই প্রথম জামানৎ।

ঃ কাগজওয়ালা শম্ভু সিং কাগজ দিত। চালু হওয়ার পর লেন-দেন ঠিকই চলছিল। কিন্তু, শম্ভু বল্ল ঃ কিছু পুরনো বাকী রয়ে গেছে। তবে আমার কোন অর্ডার দেখাতে পার্লে না। বল্লে ঃ আপনার নাম করে নিয়ে গিয়েছে। আমি অবশ্য এই টাকা পরিশোধ কর্তে আইনতঃ বাধ্য ছিলুম না। তবে সদ্ভাব রক্ষার জন্যে এই হিসেবও পরিশোধ করে দিলুম। এর প্রতিদান পেলুম ১৯৪৭ এর রায়টের সময়। আমার মেয়ে ও জামাই (কম্যুনিষ্ট লীডার আবদুর রজ্জাক খাঁ) দুই নাতিকে নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছিল। আটকা পড়ে গেল শম্ভুর দলের নিকট। ওরা তখন কুড়াল দিয়ে কুপিয়ে মুসলমানের হাঁটু ভেঙ্গে দিচ্ছে। ছুরি দিয়ে বাহু চিরে লবণ মাখিয়ে দিয়ে জিগ্যেস করে 'তোমার বাবা কে ? মেয়ে বলে ঃ মওলানা আকরাম খাঁ। শম্ভু বলে ঃ ভারী বিপদ তো। তালাশী চলছে যে ! মেয়ে বলে ঃ আপনি কেন আমাদের জন্যে বিপদ ঘাড়ে কর্বেন! কোন রকমে একখানা গাড়িতে আমাদের তুলে

www.pathagar.com

দেন। শম্ভু তখন নাতিদের ধুতি পরিয়ে দিলে, মুখে 'জয় হিন্দ্' বুলি ধরিয়ে দিলে, মেয়ের সিঁথিতে দিলে সিন্দুর আর পাহারা সঙ্গে দিয়ে তাদের বর্ডার পার করে দিলে।

৩০শে নভেম্বর আরও একজন সাক্ষাৎ করেছিলেন। তিনি নাম বলেছিলেনঃ শমসুল ওলামা আকা মাহমুদ। ইরাণী সুরৎ-মোগল। ফার্সী গযল আবৃত্তি করে শুনিয়েছিলেন। হরিনাথদের কথা উঠেছিল। বাঙ্গালী হয়েও তিনি কিরূপ চমৎকার ফার্সী জানতেন। মওলানা আকা মাহ্মুদকে জিগ্যেস কর্লেন, আপনার খান্দান কখন ইরাণ থেকে এদেশে আসলেন ?

২৫শে ডিসেম্বর মওলানা ঈজি চেয়ারে বসা ছিলেন। চেয়ারের হাতলের উপর কিছু বই রেখেছেন। শিল্পী কাজী আবুল কাসেমের আঁকা তাঁর একখানা পোট্রেটও সেখানে ছিল।

২৬শে ডিসেম্বর প্রকাশ পেলো যৌবনে সঙ্গীদের মহলে তাঁর ডাক নাম ছিল 'রাঙা ভাই'। সত্যই তিনি ছিলেন অসাধারণ সুন্দর এক পুরুষ। নওয়াবজাদা এ. এফ. এম আবদুস সোব্হান শ্বেতাঙ্গ মনোপলির দিনেও চট্টগ্রামে কলেক্টার হয়েছিলেন।

খোদার শোকরিয়া। ১৯৫৩ সালে যে নোট নিয়েছিলুম আজ ১৯৭৬ সালের ১২ই আগষ্ট সেটা লিখে পুরো কর্তে পার্লুম।

www.pathagar.com

বাংলাদেশের সামরিক ঐতিহ্য

বাঙ্গালীদের মধ্যে একটা লিখিয়ে-পড়িয়ে শ্রেণী গড়ে উঠেছিল। এর মধ্যে ছিলেন কিছু ব্রাহ্মণ, কিছু বৈদ্য এবং অধিকাংশই কায়স্থ। বৌদ্ধ, হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান সব রাজত্বেই এই শ্রেণী লিখিয়ে-পড়িয়ের এই এক চেটিয়া অধিকার ভোগ করে।

এদের হাত থাক্‌তো যে যখন রাজা হতো তার পায়ে। এরা রাজশক্তির সঙ্গে বানিয়ে চল্‌তো। এমন কি যবন হোসেন শাকে কৃষ্ণ অবতার বল্‌তেও এরা কুণ্ঠিত হয় নি। আর এদের পা থাক্‌তো জন-সাধারণের কাঁধে। নিজেদের পদের সুযোগে জন-সাধারণের উপর নানা ভাবে জুলুম করে এবং তাদের উপর নানা ভাবে শোষণ চালিয়ে নিজেদের ক্ষমতা এরা উত্তরোত্তর বাড়িয়ে নিয়েছে।

বাংলাদেশের অফিস-আদালতে এই শ্রেণী নানারূপ বে-আইনী ও জবরদস্তিমূলক 'পাওন' (প্রাপ্য) বসায়। জন-সাধারণের উপর এর বোঝা কমেনি, বরং ক্রমাগত আরও বেড়ে গিয়েছে।

এরা 'ভদ্রলোক' বলে নিজেদের আখ্যা দেয়। কিন্তু, বাংলাদেশের বেশীর ভাগ লোককে এর আওতার বাইরে রাখে।

বুদ্ধদেবের 'মহা-নির্বাণ' এর পর বৌদ্ধ তান্ত্রিকেরা বাংলাদেশে প্রাধান্য লাভ করে। এরা বুদ্ধের শিক্ষার বিপরীত প্রতিমাপূজা' প্রচলন করে। যদিও বেদে 'প্রতিমা পূজা'র বিধান নেই এবং 'ভদ্রলোক'রা নিজেদের বৈদিক বা সনাতনী বলে প্রচার কর্তো তান্ত্রিকদের 'প্রতিমা পূজা' এরা এজন্যে গ্রহণ করে নেয় যে পূজার মাধ্যমে এরা সমাজে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব জাহির করবার সুযোগ পেতো।

এদের সব চেয়ে সুদিন আসে ভারতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে। কোম্পানী কেরানীদের বলতো 'রাইটার' বা লেখক। রবার্ট ক্লাইভও একজন 'রাইটার' ছিলেন। কিন্তু সুযোগ পেয়ে লর্ড ক্লাইভ হয়ে যান।

কোম্পানী ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের গোড়া পত্তন করে। তারা দেখতে পায় যে এ দেশে একটা 'রাইটার' শ্রেণী প্রস্তুত হয়ে আছে যারা নিজেদের ক্ষুদ্র স্বার্থের বিনিময়ে

www.pathagar.com

বিদেশী রাজকে সর্বপ্রকার সহযোগিতা দিতে আগ্রহী। কোম্পানী জমিদারী সৃষ্টি করে সমগ্র দেশ এদের মধ্যে ভাগ করে দেয়। এতে কান্ত মুদী হয়ে পড়ে 'মহারাজা'। এরূপ আরও বহু দৃষ্টান্ত। যে 'বাবু' আখ্যা ছিল গোড়ায় কতকটা ব্যঙ্গসূচক কোম্পানী আদর দিয়ে উহাকে বিশেষ অর্থপূর্ণ এবং সম্ভ্রম-সূচক করে তোলে।

১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে কোম্পানী রাজ এ দেশে ফার্সীকে রাষ্ট্রভাষার আসন থেকে চ্যুত করে ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তন করে। মুসলমানরা তখনও এই সন্দেহ দোলায় দুল্‌ছিল যে কোম্পানী-রাজ 'দারুল হরব' বা শত্রু-রাজ এবং উহার বিরোধিতা করা মুসলমানদের পক্ষে ধর্মীয় কর্তব্য। কিন্তু, ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের 'সিপাহী-বিদ্রোহে'র পর তাদের অবস্থা এমন শোচনীয় হয়ে উঠে যে তারা যেন ঘরেও নেই, ঘাটেও নেই। এই অবস্থা থেকে তাদের উদ্ধার করেন নওয়াব আবদুল লতিফ এবং মওলানা কেরামৎ আলী জৌনপুরী। কলিকাতায় ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে মুসলমানদের এক সভায় তাঁরা ঘোষণা করেন যে ভারতে বৃটিশ রাজত্ব "দারুল ইসলাম" যেহেতু তারা কারু ধর্ম-মতে হস্তক্ষেপ করেনা এবং মুসলমানকে অবশ্যই ইংওরজী শিক্ষা গ্রহণ কর্তে হবে। অতঃপর সংশয় কাটিয়ে উঠে মুসলমানরা ইংরেজী শিক্ষা ধরে—তবে, ভদ্র-লোক'দের ১০০ বছর পেছনে থেকে। এখন 'ভদ্রলোক'রাই হলেন তাঁদের শিক্ষক।

ভারতে ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তনের গোড়ায় ছিলেন লর্ড টমাস বেবিংটন মেকলে-রাজ-পুরুষ। বিরোধীরা তাঁকে সাবধান করেছিলেন ঃ ভারতে ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তন কর্লে ভারতবাসীরা একদিন ইংরেজদের ন্যায় পার্লামেন্টারী শাসন-ব্যবস্থা চেয়ে বসতে পারে। মেকলে উত্তর করেন ঃ সে দিনটা হবে আমাদের গৌরবের সময়। ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের ১৪ই আগষ্ট সে দিন এসে যায়। ইংরেজ ভারতবাসীকে স্বাধীনতা দিয়ে সরে পড়ে।

'লিখিয়ে পড়িয়ে'র একচেটিয়া অধিকার ও ক্ষমতা ভোগ করতে করতে 'ভদ্রলোক'রা একরূপ অদ্ভুত চরিত্র ও মানসিকতা অর্জন করেছিলেন। একদিকে তাঁরা হয়ে পড়েছিলেন আত্মপরায়ণ ও ষড়যন্ত্রে ওস্তাদ। অন্যদিকে নিজেদের সংকীর্ণ গণ্ডী থেকে বেরিয়ে তাঁরা সমগ্র দেশকে ভালবেসে আপন বলে গ্রহণ করতে পাচ্ছিলেন না।

অথচ, ইংরেজী শিক্ষার সংস্পর্শে এসে পরাধীনতার জ্বালা তাঁরা বুঝতে পাচ্ছিলেন এবং দেশের রাজনৈতিক স্বাধীনতার জন্যে তাঁরা বুঝতে পাচ্ছিলেন এবং দেশের রাজনৈতিক স্বাধীনতার জন্যে তাঁরা আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন। বিশেষ করে তাঁদের যুবা-শ্রেণী বিশেষ চঞ্চল হয়ে উঠে। এর মধ্যে ১৯ বৎসরের কিশোর ক্ষুদিরাম বসু 'ডাইরেক্ট য়্যাকশান' (প্রত্যক্ষ সংগ্রাম)-এর পথ দেখালেন শ্বেতাঙ্গ প্রশাসকের উপর বোমা মেরে এবং তার পরিণতিতে ১৯০৮ সালের ১১ই আগষ্ট মজঃফরপুর জেলে, বেপরোয়া নির্ভীকতায় ফাঁসী বরণ করে।

এতদিন সরকারের নিকট বাঙ্গালীর প্রতিম ছিলঃ 'রাইটার' কাজের জন্য খুব উপযোগী, কিন্তু একটা বেসামরিক জাতি।

এদিকে ১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বেধে গিয়েছে। বাঙ্গালীর দাবী ছিল সেও সামরিক

www.pathagar.com

জাতি। এ দাবীকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সে প্রশাসনের নিকট আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছিল। এই পরিস্থিতিতে ১৯০৫ সালে সরকার 'দি বেঙ্গল এমুল্যান্স কোর' নাম দিয়ে বাঙ্গালীদের একটা স্বেচ্ছাসেবী আধা সামরিক বাহিনী গঠন করে দিলে। এর পেছন পেছন বাঙ্গালীদের একটা রেগুলার আর্মী-প্রথমে একটা ডবল কোম্পানী, পরে একটা ব্যাটালিয়ান গঠন করে নিলে। ইণ্ডিয়ান আর্মীতে এর স্থান হয়ে 49th Bengalees রূপে। আমি ১৯১৭ সালের ১লা জুলাই করাচী পৌছি-এই বাঙ্গালী পল্টনের রিক্রুট হয়ে।

কিন্তু, 'ভদ্রলোক' শ্রেণী বাঙ্গালীত্বের ধুয়া ধরে মুসলমানদের পল্টনে প্রবেশ বরদাশত কর্তে প্রস্তুত ছিলেন না। তাঁদের মধ্যে অন্যতম সেরা লোক ছিলেন যশোরের রায় বাহাদুর যদুনাথ মজুমদারের পুত্র কুমার অধিক্রম মজুমদার এম-এ, বি-এল। কলিকাতা হাইকোর্টের য়্যাডভোকেট ছিলেন। সে কাজ ফেলে পল্টনে রিক্রুট হয়ে এসেছিলেন। তিনি মুসলমান অনুপ্রবেশ দেখে আঁৎকে উঠলেন। 'তোমরা মুসলমান কেন আসলে ?' বলে দারুণ উষ্মা দেখাতে লাগলেন।

কিন্তু শীঘ্রই-পল্টন তখন কূট-আল আমারায়-ভদ্রলোকদের আসল চরিত্র প্রকাশ হয়ে পড়লো।

প্রথমত ঃ, তাঁরা স্কুল-মাষ্টারের ব্যবহারের উর্ধ্বে উঠতে পার্লেন না। কুমার অধিক্রম মজুমদার খুব ভাল প্যারেড করাতেন। তবে, আর্মীর শিক্ষা হলো ঃ একজন সৈন্যকে কোর্ট মার্শাল করে গুলি করে মারা যায়। কিন্তু আপনি তার গায়ে হাত লাগাতে পার্বেন না। বরং, আদেশ দেওয়ার সময় নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে দাঁড়াতে হবে। মজুমদার এসবের ধার ধার্তেননা, মেজাজ খিচড়ে গেলে সৈন্যদের গায়ে হাত লাগাতে কসূর কর্তেন না।

দ্বিতীয়ত ঃ এক ধরনের স্বজন-প্রীতি তাঁর আর্মী জীবনেও আমদানী করেছিলেন।

ফলে একটা ষড়যন্ত্র পাকিয়ে উঠে। এর নায়ক ছিলেন সুবেদার ধীরেন্দ্র কুমার সেন তিনি ছিলেন উচ্চাকাঙ্খী। তখন য়্যাডজুটেন্ট ছিলেন কাজ খুব ভাল চালাতেন। আমরা তাঁকে ডাকতুম 'কাল মানিক'। তিনি ভাবলেন ঃ যদি তাঁর সিনিয়রদের মেরে শেষ করা যায় তিনিই হবেন পল্টনের সুবেদার মেজর ইণ্ডিয়ান হেড্।

তিনি তাঁর বুদ্ধিতে ভিড়ালেন ঃ

১। সুকুমার সিদ্ধান্তকে। শোল মাছের মত লম্বাটে বলিষ্ঠ চেহারা, যতদূর মনে পড়ে ঢাকার ছেলে-নাম করা ফুটবল ও হকী প্লেয়ার। হাবিলদার হয়েছিল। কিন্তু, তার বিল্লা কেড়ে নিয়ে তাকে পুনরায় মুষিক অর্থাৎ সাধারণ সৈনিকে পরিণত করা হয়েছিল। সুতরাং অত্যন্ত অসন্তুষ্ট।

২। সুধীর ভট্টাচার্য। কলিকাতার ছেলে। কাকা শ্যাম ভট্টাচার্য সহ পল্টনে যোগ দিয়েছিল। শ্যাম হাবিলদার হয়েছিল, সুধীর নায়ক হয়েছিল এবং পল্টনের মেইল-অর্ডালী ছিল। উভয়েই বিল্লা হারিয়ে মূষিক হয়ে গিয়েছিল।

অতঃপর অন্ধকার রাত্রে পল্টনের ভিতর গুলির আওয়াজ ও আর্তনাদ শুনে আমরা ঘুম ভেঙ্গে গিয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠি। কি ব্যাপার ?

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রমাণিত করেছেন। আমরা 'শাতিল আরব' দেখেছি। কিন্তু, তার সামান্য প্রতিক্রিয়াই সাহিত্যে আনতে পেরেছি। কিন্তু নজরুল করাচীর বাইরে যাননি। তবুও মানস দেখায় 'শাতিল আরব' যে কবিতা লিখেছেন তা অনেকাংশে সত্যি। দ্বিতীয়ত ঃ সৈনিক জীবনের ঠিক রসটি তিনি ধর্তে পেরেছেন। তার প্রমাণ ঃ তাঁর 'চল চল চল' মার্চিং সং। পাঞ্জাবীদের সামরিক খ্যাতি প্রায় দু'হাজার বৎসরের। কিন্তু, তাদের নিজস্ব কোন 'মার্চিং সং' গড়ে উঠেনি। বৃটিশ আমলে বৃটিশ 'মার্চিং সং' গেয়ে ওদের কেটেছে। কিন্তু, পাকিস্তানী আমলে নজরুলের গান ওদের এমনভাবে নাড়া দেয় যে ওটার ইংরেজী অনুবাদকে টিউন করে পাকিস্তানের প্রথম নিজস্ব 'মার্চিং সং' রূপে চালু করে। তৃতীয়ত ঃ, প্রমীলার সঙ্গে তাঁর বিয়ে উপলক্ষে নজরুল জাতি গঠনের একটা সুস্পষ্ট নির্দেশ সৃষ্টি করেছেন। তিনি নিজে ইসলাম ত্যাগ করে হিন্দু হয়ে যাননি, প্রমীলাকেও কলেমা পড়িয়ে মুসলমান করার প্রয়োজন বোধ করেন নি। তাঁর নতুন পথ নির্দেশ হলো ঃ যেহেতু কোরান বলেছে, সব স্থানে সব যুগে সব মানুষের নিকট আল্লাহ্ নবী পাঠিয়েছেন, সুতরাং হিন্দুদের নিকটও নবী এবং কেতাব পাঠানো বিচিত্র নয়—যদিও তার খবর আমরা জানিনে। এর পর মুসলমান বর, হিন্দু কন্যা—হিন্দু বর, মুসলমান কন্যা—অবাধে এ রকম কতকগুলি বিয়ে হয়েছে।

কর্তৃপক্ষ 'বাবু'দের সম্বন্ধে হতাশ হলেও বাংলার মুসলমানদের নিয়ে ভাল আর্মী গঠন হতে পারবে বলে আশান্বিত হয়ে থাকেন। ফলে, যুদ্ধের পরে মিশ্র বাঙ্গালী পল্টন ভেঙ্গে দেওয়া হয়, কিন্তু পায়োনিয়ার কোরের একটা য়ুনিটের কমাণ্ডার মেজর আবদুল গণীকে অনুপ্রাণিত করা হলো বাঙ্গালী মুসলমানের একটা রেগুলার আর্মী য়ুনিট গঠন করতে। সেটা কার্যে রূপায়িত হয় পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হলে। ঢাকায় ১৯৪৭ সালের ১৭ই আগষ্ট তার প্রধান সেনাপতি ফ্রাঙ্ক মেসারভী পায়োনিয়ার য়ুনিটগুলিকে উদ্দেশ করে বলেন ঃ আপনাদের নিয়ে গঠন করা হবে প্রথম য়ুনিট। আমি আশা করি, আপনারা দুনিয়াকে দেখিয়ে দেবেন যে বাঙ্গালী মুসলমানেরা আর যে কোন সৈন্যের ন্যায়ই ভাল সৈন্য।

'ভদ্র লোক'রা কখনও কিন্তু তাঁদের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর বাইরে আসতে পারেন নি। 'Direct action' এ কোন মুসলমান যোগ দিতে চাইলে বলা হয় ঃ আমরা কোন মুসলমানকে গ্রহণ করিনা, কোন মুসলমানকে ট্রেনিং দেইনা, প্রার্থীকে মা কালীর নিকট প্রার্থনা কর্তে হয়, ব্রাহ্মণের উপবীত এবং গীতা ছুঁয়ে গোপনীয়তার শপথ নিতে হয়, ইত্যাদি।

'ভদ্র লোক' শ্রেণীর Direct action এ চূড়ান্ত বিস্ফোরণ হয় ঃ ১৯৩০ সালে ২২শে এপ্রিল যখন জালালাবাদ পাহাড়ে মাষ্টার-দা সূর্য সেনের রিপাবলিকান আর্মী ইণ্ডিয়ান আর্মীর সাথে সম্মুখ-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়।

পরের পর্বে মাষ্টার-দা ও তাঁর দল বিভিন্ন আশ্রয়ে আত্মগোপন করে থাকেন। তার মধ্যে কতকগুলি মুসলমান বাড়ী। অনন্ত সিংহ বলেন ঃ সরকার তাঁদের গ্রেফতারের জন্য পুরস্কার ঘোষণা করে বহু প্রচার-পত্র ছাড়েন। কিন্তু কোন মুসলমান পুরস্কারের লোভে তাঁদের ধরিয়ে দেয়নি। বস্তুত ঃ প্রায় তিন বৎসর এভাবে আত্ম-গোপন করার পর এক 'ভদ্র লোক' নেত্র সেনই পুরস্কারের লোভে গৈড়লা গ্রামের ক্ষীরোদ প্রভা বিশ্বাসের বাড়ি থেকে ১৯৩৩ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারী তাঁদের ধরিয়ে দেয়। বিচারের পর ১৯৩৪ সালের ১১ই

www.pathagar.com

১। সুবেদার অনিল কুমার মিত্র গার্ডরুমের ইন-চার্জ হয়ে ক্যাম্প খাটে শুয়ে ঘুমিয়েছিলেন। তাঁকে ক্যাম্প-খাটের তলায় রিভলবার ধরে গুলি করা হয়। তিনি গুলি খেয়ে উল্টে পড়ে সঙ্গে সঙ্গেই মারা যান।

২। সুবেদার মেজর শৈলেন্দ্র নাথ বসুর তাঁবুতে ঢুকে তাঁকে এলো-পাথারি গুলি কর্তে থাকে। ইন্ডিয়া কৌন্সিলের মেম্বার ভূপেন্দ্র নাথ বসুর ভাই পো, মোহন বাগান ক্লাবের গঠনকারী—তাঁর চেহারা চরিত্রে চলনে বলনে একটা আলাদা যোগ্যতা ছিল। যুদ্ধ ক্ষেত্রে গিয়ে মোটর ড্রাইভারের কাজ নেন, আহত জেনারেল বিঙ্গলেকে অসম সাহসের পরিচয় দিয়ে নিরাপদ স্থানে নিয়ে আসেন। ফলে তাঁকে প্রথম চোটেই কমিশন (জমাদার) দিয়ে বাঙ্গালী পল্টনে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তিনি আহত বাঘের মত গর্জন কচ্ছিলেন 'সেন্ট্রি, সেন্ট্রি' আর চশমা হাতড়াচ্ছিলেন-আক্রমণকারীদের দেখে নেয়ার জন্যে ৭ গুলি খেয়েও তিনি কাবু হলেননা। আততায়ীরা ভাবলে তাঁর দফা শেষ করেছি। হাসপাতালে তিনি সেরে উঠেন। সরকার তাঁকে ইণ্ডিয়ান ডিসটিংগুইসড সার্ভিস মেডাল' দিয়ে সম্মানিত করে।

৩। সুবেদার দুর্গাপদ ব্যানার্জীকে গুলি করা হয়—সেটা আস্তিনে দুটো ছেঁদা করে বেরিয়ে যায়। তিনি পালিয়ে যেতে সক্ষম হন।

৪। জমাদার রাজেন্দ্র লাল মুখার্জী জুনিয়ার লোক। পথে পড়েন বলে তাঁকে গুলি করা হয়। একটা চোখে আহত হয়ে—গুরুতর নয়—তিনি পালিয়ে যান।

কিন্তু, সকাল হওয়ার আগেই মিলিটারী পুলিস মামলার কিনারা করে ফেলে। কোর্ট মার্শাল হয়ে সুকুমার ও সুধীরকে আমাদের চোখের সামনেই ফাঁসী দেওয়া হয়। ধীরেন্দ্র কুমার সেনকে আর্মী থেকে লাঞ্ছনা দিয়ে ছাড়িয়ে দেওয়া হয়।

সে রাত্রে মজুমদার ছিলেন নদীর অপর পারে ডিউটীতে। তিনি বড় বাঁচা বেঁচে যান। কারণ, বসুর পরেই তিনি ছিলেন সকলের সিনিয়র। তবে, তিনি এই ঘটনায় এমন ভীত হয়ে পড়েন যে তাঁর কাদার পা বেরিয়ে পড়ে। তাঁকে দেখা যায় উপদ্রুত সেপাইদের জন জনের নিকট করজোড়ে মাপ চাইতে।

কোন পল্টনে এরূপ ঘটনা হওয়া অত্যন্ত সাংঘাতিক ব্যাপার। কর্তৃপক্ষ ঠিক করেন যে 'বাবু'রা আর্মীর যোগ্য নহেন।

ততদিন মুসলমানদের ভূমিকা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। তাদের অধিকাংশই ছিল চাষী-ভূষী শ্রেণীর—মোটামুটি কাজী নজরুল ইসলাম ও মাহ্‌বুব-উল আলমকে বাদ দিয়ে। মাহ্‌বুব-উল আলম বেঁচে রইলেন—এ সব তথ্যের রেকর্ড রাখবার জন্যে। বাঙ্গালী পল্টন আজিকার বাংলাদেশের উদ্ভবে একটা স্মরণীয় পদক্ষেপ এবং যতই অসম্পূর্ণ এবং অকিঞ্চিৎকর হউক 'পল্টন জীবনের স্মৃতি' উহার একমাত্র প্রামাণ্য রেকর্ড।

... ...

বাঙ্গালী পল্টন কাজী নজরুল ইসলামকে কবি সত্ত্বায় জাগিয়ে তোলে। তাঁর তিনটা দান অসাধারণ। প্রথমত ঃ সাহিত্যিক সত্য বাস্তব সত্য অপেক্ষাও অধিকতর সত্য, তিনি

জানুয়ারী তাঁর ফাঁসী হয়ে যায়।

ক্ষুদিরাম বসু যে Direct action এর বাতি জ্বেলেছিলেন এখানেই তা নিভে যায়। বাংলাদেশ এখন সার্বভৌম স্বাধীন। কিন্তু তা' সম্ভব হয়নি 'ভদ্র লোক'দের চেষ্টায়।

www.pathagar.com

আমাদের শক্তির উৎসঃ কোরান ও রসূল

ইতিমধ্যে আমাকে অনুরোধ করা হয়েছে আমার জীবন দর্শন ব্যক্ত কর্তে।

সত্য দৃষ্টি

কোরানে তিন রকমের দৃষ্টির কথা বলা হয়েছে ঃ জড়-দৃষ্টি, বৈজ্ঞানিক-দৃষ্টি ও সত্য-দৃষ্টি (আয়নুল এক্কিন, এলমুল এক্কিন ও হক্কুল এক্কিন)। এর মধ্যে জড়-দৃষ্টি ও বৈজ্ঞানিক-দৃষ্টি বিষয়টিকে অংশতঃ প্রকাশ করে, একমাত্র সত্য দৃষ্টিই উহাকে সর্বতোভাবে প্রকাশ করে।

জড়-দৃষ্টি দেহের জন্ম-কালেই প্রকৃতির দান স্বরূপ উহার সাথে যুক্ত থাকে, বৈজ্ঞানিক-দৃষ্টি দেহী লেখা-পড়া ও গবেষণা দ্বারা লাভ করে। সত্য-দৃষ্টি লাভ হয় আত্মিক সাধনা দ্বারা এবং আল্লাহ্তা'লার রহমতের ফলে। সত্য-দৃষ্টি দ্বারা শুধু যে সত্য দর্শন হয় তাহা নহে, চিত্তও স্থিরতা লাভ করে।

কোরানের ডাইমেনশন ফিলজফি

এই ফিলজফি মতে আল্লাহ্তা'লা মানুষকে সব সময় ডেকে জিগ্যেস কচ্ছেন ঃ ১. কোথায় আছ ? ২. কোন সময়ে আছ ? ৩. কার সাথে আছ ? ৪. কোন উদ্দেশ্য নিয়ে আছ ? আমরা এটাকে সহজে 'স্থান-কাল-পাত্র ও উদ্দেশ্যের ফিলজফি' বলে বর্ণনা করতে পারি। এগুলোকে একটু বিশদ ভাবে আলোচনা কচ্ছি।

স্থানের ডাইমেনশন

কেয়ামতের প্রথমেই স্থান ধ্বংস হবে। এর অর্থ স্থানই মনুষ্য-জীবনের প্রথম ও প্রধান নিয়ামক।

দুইটি ভিন্ন দেশকে এক ভাবার চেষ্টা ইতিহাসে সব সময়েই ভুল প্রমাণিত হয়েছে। তার সাম্প্রতিক দৃষ্টান্ত পাকিস্তান।

পাকিস্তানে দুইটা অংশের মধ্যে প্রায় দেড় হাজার মাইল ব্যবধান ছিল। আয়ুব খাঁ 'প্যারিটী' বা সংখ্যা-সাম্যের সাহায্যে এই ব্যবধান মুছে দিয়ে দুই দেশকে এক কর্তে চেষ্টা করেন। কিন্তু, অসাম্য দিন দিন আরও বাড়তে থাকে।

www.pathagar.com

আমি তাঁকে বলি ঃ আপনি বরং এক কাজ করুন—ছয় মাস পূর্ব পাকিস্তানে রাজধানী করুন, ছয় মাস পশ্চিম পাকিস্তানে রাজধানী করুন। আর ঢাকাকে ২য় রাজধানী বা 'সাবসিডিয়ারী' রাজধানী না বলে উভয় রাজধানীর নাম দেন ঃ পূর্বের রাজধানী ও পশ্চিমের রাজধানী অথবা শীতকালীন রাজধানী ও গ্রীষ্মকালীন রাজধানী।

পরে স্থান-অনৈক্যের দরুণই পাকিস্তান ভেঙ্গে যায়।

স্থানের ডাইমেনশন জন্মভূমির মাটির প্রতি মানুষকে অনুগত থাকতে বলে। এরই নাম দেশপ্রেম।

অন্নদা শঙ্কর রায় আমাকে সাহিত্যিক হিসেবে কলিকাতার মঞ্চে প্রতিষ্ঠিত করতে চান এবং ব্যবস্থা করে দিতে চান যে আমি হুমায়ূন কবিরের 'চতুরঙ্গ' পত্রিকায় লিখি।

আমি তাঁর প্রস্তাব গ্রহণ করিনি। আমার মাটি-মাকে আমি সেবা করে যাব, আমার দেশ তাকে মূল্য দিতে পারুক, আর না-ই পারুক।

১৯৭১ সালের এপ্রিলে পাঞ্জাবীদের আক্রমণ থেকে বাঁচবার জন্যে আমার পরিবারের লোকেরা চট্টগ্রাম শহরের বাড়ী ছেড়ে দিয়ে অন্যত্র সরে যায়।

কিন্তু, আমি আমার মাটিকে ছাড়তে অস্বীকার করি, একা পড়ে থাকি।

দেশের প্রতি ভালবাসার জন্যে যে মূল্যই চাওয়া যাক, সেটা আমাদের দিতে হবে।

আমি 'চর-খিজির' গল্পে বলেছি ঃ চট্টগ্রামে 'হারামদের যুগে' এক পর্তুগীজ পাদ্রী ছিলেন। তিনি ছিলেন আবার এক বিজ্ঞানী, নিজের বাড়ীতে একটা লেবোরেটরী চালাতেন। ক্রমে সেখানে সুখী ও সমৃদ্ধ এক চাষী-সমাজ গড়ে উঠে। পাদ্রী বিজ্ঞানী লেবোরেটরীতে পর্যবেক্ষণ করে চালাতেন বলেই তাদের এত সুখ, এত সমৃদ্ধি।

কিন্তু, লোকের স্বভাবই এই যে বহুদিন একটানা সুখ ও সমৃদ্ধি ভোগ কর্লে তারা অলস ও বিলাস-পরায়ণ হয়ে উঠে। এদেরও সেই অবস্থা দাঁড়িয়েছিল।

হঠাৎ পাদ্রী-বিজ্ঞানী এক সাবধান বাণী উচ্চারণ কর্লেন ঃ মাসের অত তারিখ ভীষণ এক তুফান হবে। তার ছোবল থেকে কিছুই বাঁচান যাবেনা। কিন্তু, অলস ও বিলাস-পরায়ণ লোকগুলো কোন প্রতিরোধই বা বাঁচবার কোন উপায়ই গড়ে তুলতে পার্লেনা। তুফানে সব হারিয়ে এই পাদ্রীবিজ্ঞানীর উপর হলো তাদের ভীষণ রাগ। বল্লে ঃ ঐ লোকটা আল্লাহ্ খোদা কিছুই মানেনা। তার ভৌতিক যন্ত্র নিয়ে কি সব করে। এ নাস্তিকের শাস্তির জন্যই তো প্রভু এমন মুসিবৎ পাঠিয়েছেন। চলো, চলো, লোকটাকে শায়েস্তা করা যাক।

পাদ্রী-বিজ্ঞানী জানতেন যে তাঁর সেবার ন্যায্য মূল্য দিতে পারার মত জ্ঞানী এরা নয়। একটা বিরূপ প্রতিক্রিয়ার জন্যে তাঁকে প্রস্তুত থাকতে হবে।

লোকগুলি এসে তাঁকে হাত-পা বেঁধে এবং সেই সঙ্গে তাঁর লেবোরেটরী ভেঙ্গে চুরে এক সঙ্গে সমুদ্রে নিক্ষেপ কর্লে। কিন্তু, এইগুলোতে সমুদ্রের পলি আটকে সেখানে এক চর পড়ে গেল।

www.pathagar.com

তার তলার থেকে পাদ্রী-বিজ্ঞানী বলতে লাগলেন ঃ এমনিই হয়। অনেক মূল্যবান কাঠ ডুবে গিয়ে চর পড়ে, জনপদ গড়ে ওঠে। সেই জনপদে সামান্য এরেণ্ডা গাছও গজিয়ে উঠে মাথা নাড়ে, সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কিন্তু মূল্যবান কাঠ শত শত বৎসর লোক-লোচনের আড়ালে থেকে সেই জনপদকে টিকে থাকতে সাহায্য করে। সেই কাঠের ভূমিকাই আমি পালন করে যাবো।

বস্তুত ঃ বহু উপযুক্ত লোকের আত্ম-ত্যাগ ছাড়া কোন জাতি গড়ে উঠে না।

এক ব্যক্তি হযরত রাবেয়া বসরীকে জিগ্যেস কর্লেন ঃ হুজুর, আপনার তওয়াক্কোল কি ? তিনি ফিরে জিগ্যেস কর্লেন ঃ তোমার তওয়াক্কোল কি ? উত্তর এলো ঃ পেলাম শোকর কর্লাম, না পেলাম সবর কর্লাম। রাবেয়া বল্লেন ঃ হাঃ বসোরার কুকুরও তো অতটুক করে। খাবার পেলে খুশী হয়ে লেজ নাড়ে, না পেলে মুখ গোঁজ করে বসে থাকে। বাপু, আমার তওয়াক্কোল হলো ঃ পেলাম তো দান কর্লাম, না পেলাম তো শোকর কর্লাম। প্রভো আজকে তুমি আমাকেই মনোনীত করেছ না দেওয়ার জন্যে।

পাদ্রী-বিজ্ঞানীও শোকর করেছিলেন ঃ প্রভো, তুমি আমাকেই মনোনীত করেছ নিজে ডুবে থেকে এই জনপদকে ধরে রাখার জন্যে।

কালের ডাইমেনশন

এক কালে মুসলমানেরা আল্লাহ্‌র কাছে কাঁদতেন। এই কাঁদার উত্তম সময় হলো রাত্রি নিশীথে ঘুম ভাঙ্গার পর। যে কোন বিষয়ের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে কাঁদা যায়। শিশু যে ভাবে মায়ের কাছে কাঁদে সেভাবে কাঁদতে হয়। এরূপ কাঁদতে পার্লে অন্তরে আলো আসে, বিপদ থেকে বেরুবার পথ দেখা যায়।

একবার জমী নিয়ে আমি খুনাখুনি কর্তে প্রস্তুত হই। কিন্তু এরূপ কাঁদার ফলে অন্তরে আলো এলো। আমার প্রতিপক্ষের কি অসুবিধে সেই আলোতে আমি বুঝতে পারলুম। ফলে, খুনাখুনি না করেও বিষয়টি মীমাংসা হয়ে যায়, আমি জিতে যাই।

এই কাঁদনটা আমি বহু বিপদগ্রস্ত বন্ধুকেই সুপারিশ করেছি। কেহ কেহ এই জন্যে আমার নিকট আনন্দ প্রকাশ করেছেন।

৪০ বৎসর বয়স হতে হতে নিজের স্রষ্টাকে জেনে নিতে হয়। তাঁর অনেক নাম, অনেক অর্থ। সকলের সঙ্গে একইভাবে সংস্পর্শ হয়না। যে আল্লাহ্‌কে যেই নামে চিনেছে সেটাই তার জপ। যখনই সময় পাওয়া যায় সেই নাম জপ করে সময়ের ফাঁকটা বুজিয়ে নিতে হয়। এভাবে জীবন অর্থপূর্ণ ও সার্থক হয়ে উঠে।

পরিবেশের বা ব্যক্তির ডাইমেনশন

কোরানে স্রষ্টাকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যখন বাঘ ও ছাগল একত্রে সমবেত হয়— বাঘের প্রবৃত্তি থাকে না যে ওকে ধরে খাই, ছাগলের ভয় থাকেনা যে আমাকে ধরে খেতে পারে। আল্লাহ্‌তা'লা চান যে স্থানের প্রতি, সময়ের প্রতি যেমন আমার কর্তব্য করি, তদ্রূপ পাশের লোকের প্রতিও কর্তব্য করি। এজন্যে খাঁটি মুসলমান মাত্রেই জীবনে একটা সেবকের ভূমিকা গ্রহণ করেন। 'বহু জন সুখায়', 'বহু জন হিতায়' তিনি জীবন ধারণ

www.pathagar.com

করেন।

উদ্দেশ্যের ডাইমেনশন

মানুষ মাত্রই প্রতিনিয়ত একটা না একটা উদ্দেশ্যের বন্দী হয়ে রয়েছে। কোরানে আল্লাহ্‌তা'লা জিগ্যেস করেছেন ঃ তোমার কি আসল উদ্দেশ্য মনে আছে ? সেটা এই যে তুমি আমার দিকে মুখ করেই হউক, আমার প্রতি বিমুখ হয়েই হউক, প্রতি কদমে আমার নিকটবর্তী হচ্ছ। একদিন তোমাকে আমার নিকট ফিরে আসতেই হবে এবং হিসেব দিতে হবে ইহকালটা তুমি কি করে কাটিয়েছ।

কোরানের আরেক শিক্ষা জ্বেহাদ

কোরান আত্ম-পীড়ন নিষেধ করে। অপরের সঙ্গে দাঁড় করিয়ে নিজেকে একইভাবে বিচার কর্তে শেখায়। কিন্তু যখন ন্যায়ের পক্ষে অন্যায়ের বিপক্ষে দাঁড়ায়—যার নাম জ্বেহাদ—তখন নিজের প্রাণ দেওয়া সিদ্ধ, অপরকে হত্যা করায়ও আর দোষ থাকেনা।

আল্লাহ্‌র হকের চেয়েও বান্দার হক বড়

এটা কোরানের এক মৌলিক শিক্ষা। নামাজ, রোযা, এবাদৎ ইত্যাদি আল্লাহ্‌র হক। আল্লাহ্‌তা'লা যাকে ইচ্ছা মাফ কর্তে পারেন, দয়া দেখাতে পারেন। কিন্তু সেই আল্লাহ্‌তা'লাই বলেছেন ঃ যদি তুমি আমার বান্দার হক—তোমার ভাইয়ের হক নষ্ট কর আমি যে আল্লাহ্‌তা'লা সেই বান্দা, সেই ভাই তোমাকে মাফ না করা পর্যন্ত আমিও তোমাকে মাফ কর্তে পার্বো না।

যেই সমাজে না খেতে পেয়ে হাজার হাজার লোক মরেছে আর দ্রব্য মূল্য বাড়িয়ে দিয়ে অপর হাজার হাজার লোক প্রচণ্ড মুনাফার পাহাড় গড়ে তুলেছে, সেখানে আল্লাহ্‌র হক লোকে যতই আদায় করুক বান্দার হককে একেবারে মাটি করে দিয়েছে। সে সমাজ নিজেকে কখনও ইসলামী সমাজ বলে দাবী কর্তে পারেনা।

রসূলে আকরামের শিক্ষা

রসূলে আকরামকে কোরেশরা বলেছিল ঃ তোমাকে নেতৃত্ব দিচ্ছি, টাকা-পয়সা দিচ্ছি, সব চেয়ে সুন্দরী রমণী দিচ্ছি। কিন্তু, তিনি কোনটাই গ্রহণ করেন নি। তিনি গরীবদের সঙ্গে সমাজ করেন এবং বলেন ঃ দারিদ্র্যই আমার গৌরব। গরীবদিগকে আশ্বাস দিয়ে তিনি বলেন ঃ ভয় কি, আমিও তোমাদের সঙ্গে আছি।

যখন হিযরৎ করে মদিনায় এলেন ঃ প্রতিদিন বহু লোক এসে তাঁর মজলিসে বসতেন। প্রত্যেকেরই মনে হতো আজ রসূলে আকরাম আমার দিকেই বেশী রুজু হয়েছিলেন, আমাকে উদ্দেশ্য করেই সব কথা বলেছেন। কিন্তু এক আনসারের মনে হলো ঃ রসূলে আকরাম আজ যেন মোটেই তাঁর প্রতি রুজু হলেন না, তাঁর প্রতি একটি বারও নজর কর্লেন না। তাঁর ভারী দুঃখ হলো। সকলকে এর কারণ জিগ্যেস কর্লেন একজন বললেন ঃ হাঁ হাঁ, সকলে আমরা রাস্তায় বেরিয়েছিলুম, হযরত ছিলেন সকলের আগে। তুমি যে বালাখানা বানাচ্ছো সেটা দেখে জিগ্যেস কর্লেন ঃ এই বালাখানা কে উঠাচ্ছে ? আমরা বল্লুম ঃ অমুক আনসার। শুনে মুখ ফিরিয়ে নিলেন।

www.pathagar.com

এটা শুনে সে আনসারের বুকে যেন মুগুরের আঘাত পড়লো। ভাবলেন ঃ রসূলে আকরামের বালাখানা নেই, হযরৎ আবু বকরের নেই, হযরত ওমরের নেই; আমার কেন বালাখানার প্রয়োজন হলো ? সঙ্গে সঙ্গে বাড়ী গিয়ে বালাখানা ভাঙ্গবার আদেশ দিয়ে দিলেন। রসূলে আকরামের সাধনা ছিল সমাজ যেন নিম্নতম লেভেলে থেকে সুখী, সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী হয়।

ফলে, কারও সম্পদ বেশী হলেই ভয় পেয়ে যেতেন। সারা রাত আল্লাহ্‌র কাছে কাঁদতেন ঃ আমাকে তিন শত উট দিলে কেন ? রসূলে আকরামের অত উট নেই, হযরত আবু বকরের নেই, হযরত ওমরের নেই। আমি কিরূপে এর হিসাব দেব ? আর, এখন তো আমাদের চেষ্টা ঃ ঘরে বাড়ীতে সকলকে ডিঙ্গিয়ে যাই। যাঁরা যোগ্য তাঁরা নিজে আত্মত্যাগ করে সমাজকে শক্তিশালী করে তুলতে হবে।

ইসলামের বিশ্ব-মিশন

ইসলামের একটা বিশ্ব-মিশন আছে। সেটা হলো ঃ মানুষে মানুষে ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা। সেটার উপায় ঃ তওহীদ। এক নিরাকার আল্লাহ্ এবং এক মানবতা। এটা যাতে সুসিদ্ধ হয় এজন্যে ধর্মের সার্বজনীনতা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে—সব স্থানে, সব যুগে, সব লোক সমষ্টির নিকট নবী পাঠান হয়েছিল বলে, ধর্মে কোন জোর-জবরদস্তি নাই ঘোষণা করে।

একদিকে আনুষ্ঠানিক ধর্মের ব্যবস্থা রয়েছে। অন্যদিকে হযরত বড় পীর সাহেব সাত আসমান ঘুরেও আল্লাহ্‌র দেখা পেলেন না। ফেরেশতারা বল্লেন ঃ আমরা রাত দিন তাঁর স্তুতি গান করি, কখনও তাঁকে দেখিনি, তবে শুনেছি ঃ মো'মেনদের অন্তরের আসনে তিনি অধিষ্ঠিত আছেন।

www.pathagar.com

আবদুল আজিজ বি-এ ঃ
চট্টগ্রামে মুসলিম নবজাগরণ আন্দোলনে অগ্রদূত

নিজের জীবনকে এভাবে চালাবে যাতে বহু জনের মঙ্গল হয়, বহু জন সুখী হতে পারে। এটা প্রাচীন ভারতের আদর্শ। আমার এক বন্ধু প্রশ্ন করেছেন ঃ চিঠির শেষে আমরা যেখানে স্বাক্ষর করি 'তোমার প্রীতি সিক্ত' লিখে, তুমি সেখানে লিখ 'খাদেম মাহ্‌বুব-উল আলম'—এর কারণ কি ?

আমার উত্তর ঃ খেদমৎ বা জন-সেবাকেই আমি আদর্শ বলে গ্রহণ করেছি—বিশেষতঃ রসূলে আকরামের জীবনী পর্যালোচনা করার পর।

কিন্তু, বাংলাদেশে জন-কল্যাণের কাজ করা সহজ নহে। হিন্দুরা ষড়যন্ত্র-পরায়ণ, মুসলমানরা ব্যক্তি-ভিত্তিক—পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস-পরায়ণ।

তবে, ছাত্র-জীবনে যখন ক্লাস ফাইভে পড়ি, তখন একজন বিখ্যাত সমাজ-সেবকের আমি চোখে পড়ে যাই। তিনি আবদুল আজিজ বি-এ, পরে খান বাহাদুর।

১৮৩৫ সালে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজত্বে ফার্সীকে রাজ-ভাষার আসন থেকে তাড়িয়ে ইংরেজীকে সেই আসনে বসান হয় এবং ভারতে ইংরেজী শিক্ষা চালু হয়ে যায়।

মুসলমানেরা তখনও সে রাজত্ব মেনে নেয় নি। তারই চরম বিস্ফোরণ ঘটে ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহে। এতে হেরে গিয়ে মুসলমানেরা একেবারে দুর্দশার শেষ প্রান্তে জীবন্মৃত অবস্থায় এসে পৌঁছয়। ১৮৭০ সালে নওয়াব আবদুল লতিফ এবং জৌনপুরের মওলানা কেরামত আলি মিলে ভারতে বৃটিশ রাজত্বকে 'দারুল ইসলাম' ঘোষণা করেন এবং আরও ঘোষণা করেন যে ইংরেজী শিক্ষা মুসলমানদের অবশ্য কর্তব্য।

অতঃপর মুসলমানেরা হিন্দুদের একশত বছর পিছনে থেকে ইংরেজী শিক্ষা শুরু করে।

আবদুল আজিজ ছিলেন নোয়াখালী জেলার প্রথম মুসলমান বি-এ। তাঁর জন্ম হয়েছিল ১৮৬৩ সালের ৮ই মে।

তখন খুব নাম শোনা যেতো আবদুল করিম বি-এ ও আবদুল আজিজ বি-এ'র। উভয়েই ছিলেন স্কুল ইন্‌স্‌পেক্টর। আবদুল করিম ছিলেন সিলেটের অধিবাসী। তাঁর রচিত

www.pathagar.com

'ভারতবর্ষের ইতিহাস' স্কুলে পাঠ্য ছিল। খুব তেজস্বী পুরুষ বলে তাঁর খ্যাতি ছিল। আবদুল আজিজের পিতা আমজাদ আলী আদালতের চাকুরিয়া ছিলেন। প্রথমে নোয়াখালীতে ছিলেন, পরে চট্টগ্রামে বদলী হয়ে আসেন। আবদুল আজিজ ঢাকাতেই লেখাপড়া করেন বলে মনে হয়।

আমজাদ আলীর চাকুরি-জীবনের বেশির ভাগ কেটেছিল চট্টগ্রামে। আবদুল আজিজ বহু বৎসর চট্টগ্রামের স্কুল ইন্‌স্‌পেক্টর ছিলেন। বর্তমান রেয়াজুদ্দীন বাজার সংলগ্ন তামাকু মুণ্ডীতে এই পরিবার কিছু জমি কিনে বাড়ী করেছিলেন। ফলে, মূলতঃ নোয়াখালীর অধিবাসী হলেও তাঁরা চট্টগ্রামের সমাজ-জীবনে মিশে গিয়েছিলেন এবং চট্টগ্রামী বলে গণ্য হতেন।

বাংলাদেশে প্রধানতঃ নওয়াব আবদুল লতিফের চেষ্টায় মুসলমান জাগরণের জন্য কিছু প্রাতিষ্ঠানিক কাজ শুরু হয়ে গিয়েছিল। (স্যার) সৈয়দ আহমদ এসব অনুধাবন করার সুযোগ পান এবং অনুপ্রাণিত হন। পরে তিনে আলীগড় আন্দোলন শুরু করে দেন।

চট্টগ্রামে মুসলমান জাগরণ আন্দোলনের অগ্রদূত ছিলেন আবদুল আজিজ বি-এ।

তখনকার দিনে ঘন ঘন স্কুল পরিদর্শন হতো। আমরা স্কুলের ছাত্র-শিক্ষকরা ইন্‌স্‌পেক্টরদের খুব ভয়ে ভয়ে থাকতুম। তাঁরা কটমট করে আমাদের দিকে তাকাতেন এবং প্রশ্ন করে আমাদেরকে অপ্রভিভ কর্তে পারাই যেন ছিল তাঁদের কাজ।

কিন্তু আবদুল আজিজ বি-এ এলেন অন্য রকম। আমাদের বইতে লর্ড রিপনের ছবি ছিল। মুখে এক ঝোপ লম্বা দাড়ি। সেই ঝোপকে আলোকিত করে তাঁর দুটো চোখ যেন হাসছে ছেলেদের বুঝবার অদম্য কৌতূহলে এবং তাদের সাহায্য কর্বার পরম শুভেচ্ছায়।

অল্পক্ষণের মধ্যেই তিনি আমাদের সাথে এক হয়ে গেলেন। প্রত্যেকের নাম জেনে নিলেন এবং অন্য ইন্‌স্‌পেক্টরের ন্যায় প্রশ্ন করে 'ইউ' 'ইউ' করে আঙ্গুল ঘুরিয়ে না এনে প্রত্যেকের নাম ধরে ডাকতেন ঃ তুমি মহ্‌বুব, মহেন্দ্র।

ফলে তাঁকে মোটেই ভয় লাগতোনা। আমাদের অনেক রকম উত্তর হতো। কোন কোনটা শুনে তিনি হাসতেন। কোন উত্তর ঠিক হয় নাই বল্লে আমরা তর্ক লাগিয়ে দিতুম। তখন আরও বেশি করে হাসতেন। এর পূর্বেই বৃটিশ ভেদ-নীতি চাচ্ছিল মুসলমানদের হিন্দুদের প্রতিপক্ষরূপে খাড়া কর্তে। সুতরাং মুসলমানদের ইংরেজী শিক্ষা-দীক্ষার ব্যাপারে তাঁরা সহানুভূতি দেখাতেন, সাহায্য কর্তেন।

তখন খুব প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল চট্টগ্রামে মুসলমানদের জন্য একখানা ছাত্রাবাস স্থাপনের। আবদুল আজিজের চেষ্টায় চট্টগ্রামের শাহী জামে মসজিদ সংলগ্ন স্থানে 'ভিক্টোরিয়া ইসলাম হষ্টেল' স্থাপিত হয়। হষ্টেলের এক অংশে তখনকার প্রশাসক লী সাহেবের নামে 'লী ইসলামিয়া লাইব্রেরী ও রীডিং রুম' অবস্থিত ছিল।

হষ্টেলে খাই-খরচ সহ প্রত্যেক ছাত্রের মাসিক চার্জ ছিল মোট চার টাকা। এটাও ঠিক ভাবে আদায় হতো না।

হাউজ-টিউটারগণের তত্ত্বাবধানে ছেলেদের লেখা-পড়ায় খুব যত্ন নেওয়া হতো।

www.pathagar.com

ফলে, ইসলাম হষ্টেলের বোর্ডার হওয়া একটা শ্লাঘার বিষয় বলে গণ্য হতো।

মুসলমান উঠন্ত ছাত্রদের উপর আবদুল আজিজ বি-এ'র প্রভাব ছিল অসাধারণ। তাঁদের অনেকেরই সমাজ-কর্মে হাতে কলমে দীক্ষা হয়েছিল তাঁর নিকট। (খান বাহাদুর) জালালুদ্দীন আহ্‌মদ তাঁর দক্ষিণ হস্ত হয়ে উঠেন। হষ্টেল-গৃহের মূল দালানের ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপনে আবদুল লতিফ খাঁ এবং (খান সাহেব) শফিকুর রহমান সিদ্দিকী তাঁকে বিশেষ রূপে সাহায্য করেন।

১৯১১ সালে মধ্য ইংরেজীতে বৃত্তি নিয়ে আমি শহরে পড়তে আসি। আবদুল আজিজ বি-এ'র হষ্টেলকে মনে হতো—যেহেতু তিনি আমার একান্ত আপন জন হয়ে উঠেছিলেন—আমার নিজের বাড়ী। আমি সেই হষ্টেলে বোর্ডার হই।

হষ্টেলের একটা হাউসে নামাজের হাজিরা-বই রাখা হতো। যাদের নামাজ কামাই হতোনা মাসের শেষে তাদের আপ্যায়ণ করা হতো।

এই হাজিরা-বই একদিন অদৃশ্য হয়ে গেল এবং পরে নর্দমার ভিতর থেকে সেটা উদ্ধার হলো। কেউ ছিঁড়ে নর্দমায় ফেলে দিয়েছিল। দোষী ছেলেটা কে ?

আদেশ হলো ঃ প্রত্যেক ছেলেকে মসজিদে গিয়ে নিজে নির্দোষী তা' ঘোষণা কর্তে হবে।

আমি বল্লুম ঃ আমি নির্দোষ। কিন্তু, মসজিদে ঢুকে ওটা ঘোষণা কর্তে রাজী হলুম না। যেহেতু আর সকলেই ওভাবে ঘোষণা করেছিল আমাকে সাব্যস্ত করা হলো দোষী, আমার অনেক অধিকার বন্ধ করে দেয়া হলো, ফাঁসীর আসামীর প্রতি লোকে যেভাবে তাকায় হষ্টেলের গোটা এস্টাবলিশমেন্ট্ আমার প্রতি সেভাবে তাকাতে লাগলো এবং হষ্টেলের প্রাণ-পুরুষ আবদুল আজিজ বি-একে বিষয়টি রিপোর্ট করা হলো। দিন দুই পরে শোনা গেল তিনি আসছেন। আমরা হষ্টেলের প্রাঙ্গনে—টিউটার ও বোর্ডার—সারি দিয়ে দাঁড়ালুম। তিনি এসেই আমার প্রতি নজর ফেল্লেন—চোখে-মুখে সেই অপূর্ব হাসি—বল্লেন 'মহ্‌বুব, কখনও এ কাজ করেনি, এর জন্যে কোন শাস্তি দেয়া হবে না, আমি শুধু সে ছেলের নৈতিক সাহস দেখতে চাই, যে এ কাজ করেছে সে এসে গোপনে আমার কাছে স্বীকার করুক।

পরে জানা গেল একজন স্বীকার করেছে। সে আমাদের রুমের জহুর।

চোখের কৌতুক ও হাসি দিয়ে তিনি ছেলেদের অন্তঃস্থল পর্যন্ত দেখে নিতেন। মহ্‌বুবকে জিগ্যেস না করেও বুঝতে পেরেছিলেন যে মহ্‌বুব কখনও এ কাজ করেনি।

বস্তুতঃ তিনি আমাকে এক ক্ষুদে বন্ধু ধরে নিয়ে ব্যবহার কর্তেন।

কিন্তু এই বন্ধুত্বও আমাকে ধরে রাখতে পার্লোনা। আমি হষ্টেল ছেড়ে দিলুম, ক্লাস এইটে উঠে সমুদ্রের ডাকে স্কুল ছেড়ে পালালুম।

চট্টগ্রামী ছেলে, রক্তে আছে সমুদ্র। সমুদ্রের ডাক সে না শুনে পারে না।

কিন্তু, হেড্ মাষ্টার আদ্যনাথ রায় হাল ছাড়লেন না। মধ্য ইংরেজীতে বৃত্তি পেয়েছিলাম।

www.pathagar.com

বল্লেন ঃ বৃত্তি আর রাখা যাবে না, তবে প্রমোশন না দিলে হতচ্ছাড়াটাকে আর স্কুলে পোরা যাবে না।

একরূপ ধরে আনিয়ে আবার স্কুলে পোর্‌লেন। আরও অনেক ডন-কুস্তি খেলে- কলেজে প্রবেশ, বিবাহ, মধ্য ইংরেজী স্কুলে শিক্ষকতা, বাঙ্গালী পল্টনে তিন বৎসর—১৯২১ সালে আমি অনেকটা সুস্থির হলুম। তখন আমি সাব-রেজিষ্ট্রার নিযুক্ত হয়েছি।

তখন তাঁর সঙ্গে আবার দেখা হতে লাগল। ঠাট্টা করে আমাকে ডাকতেন 'কাপ্তেন সা'ব'।

১৯২৫ সাল। নোয়াখালীর চাট্‌খিলে আমি সাব-রেজিষ্ট্রার। দেশের উন্নয়ন কাজে হাত দিয়ে চাট্‌খিলে সাড়া জাগিয়ে তুলেছি।

কাজ উপলক্ষে সদরে যাব বলে সোনাইমুড়িতে ট্রেনে উঠে দেখি কামরায় আবদুল আজিজ বি-এ বসে আছেন। তিনি তখন ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান, আমাকে দেখেই উৎসাহে ফেটে পড়লেন ঃ আরে, কাপ্তেন সা'ব যে!

ট্রেন চলছিল। দেশের উন্নয়ন নিয়ে আমাদের আলাপেরও বিরাম ছিল না। অনেক বিষয়েই আমার ধারণা খুব সুস্পষ্ট এবং মন্তব্য জোরাল ও তীক্ষ্ণ ছিল। তিনি যার পর নাই খুশী হলেন।

অবশেষে বল্লেন ঃ কাপ্তেন সা'ব, তোমার মত একটা ছেলে আমার হাতের কাছে চাই যে। তুমি চট্টগ্রাম চলে এসো।

আমি বল্লুম ঃ বদলী কি সোজা। দুই কলেক্টরের মত লাগবে, ইন্‌স্‌পেক্টর জেনারেলের অনুমোদন, তবে তো।

বল্লেন ঃ সে সব তো আমিই কর্বো।

চট্টগ্রামে গিয়ে চিঠি লিখলেন ঃ সব ঠিক হয়ে গিয়েছে। তোমাকে চট্টগ্রামের কালিপুরে বদলী করা হচ্ছে। প্রথম সুযোগেই আমার একেবারে কাছে নিয়ে আসবো।

১৯২৬ সালের ১লা এপ্রিল আমি কালিপুরে জয়েন কর্লুম। বন্ধুদের ঠাট্টা করে বলতুম ঃ এটা স্মরণীয়। কেননা, ভারতের পূর্ব প্রান্তে যখন এটা ঘটছিল। পশ্চিম প্রান্তে বোম্বাই বন্দরে তখন লর্ড ইরউইন ভাইস্‌রয়ের ভার বুঝে নিচ্ছিলেন।

এখানে সাদত হোসেন চৌধুরী সার্কেল অফিসার। তাঁর সঙ্গে দেখা হতেই সব বয়ান শুনে তিনি অবাক হয়ে গেলেন। তিনি আবদুল আজিজ বি-এ'র জামাতা। তবে, একটি ছেলে (জহুর হোসেন চৌধুরী, পরে দৈনিক 'সংবাদ'-এর প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক) হওয়ার পর সে কন্যা মারা গিয়েছেন, অতঃপর সন্দ্বীপের জমিদার হালিমুল্লাহ্ চৌধুরীর মেয়েকে শাদী করেছেন। অবাক হলেন ঃ আমার কাছে আবদুল আজিজ বি-এ'র চিঠি দেখে। বল্লেন ঃ আমার শ্বশুর বড় সহজে কাউকেও চিঠি লিখেন না।

ক্রমে উভয়ের গাঢ় বন্ধুত্ব হয়।

তাঁর চরিত্রের কতকগুলো আশ্চর্য দিক ছিল। যত লোক হবে হোক আর যত উঁচু

www.pathagar.com

দরের তিনি একা কথা বলে সকলকে অভিভূত করে রাখতেন। ফলে—তখন খান বাহাদুর আবদুল মোমেন বিভাগীয় কমিশনার আর এইচ আর উইলকিন্‌সন ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট—সাদত হোসেন তাঁর এলাকায় কমিশনারের সম্মানার্থ বিরাট এক অনুষ্ঠান করেন। ওতে কমিশনারের আগমন পথে—১২ মাইল—য়ুনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট ও মেম্বাররা দফাদার ও চৌকিদারদের নিয়ে রাজ-অতিথিকে সম্বর্ধনা জানান। সাদত হোসেনের বিরোধিতা করা কারু পক্ষে সম্ভব ছিল না। বিরোধিতা কর্তে গিয়ে স্থানীয় বহু প্রতাপশালী ব্যক্তি খড়-কুটার ন্যায় ভেসে গিয়েছেন। এমন ছিল তাঁর ব্যক্তিত্ব এবং 'উদ্যোগিনা পুরুষ-সিংহম'।

কিন্তু, লিখতেন খুব কম। সরকারী বহু ফাইলও চৌকির তলায় পড়ে থাকতো।

আমার মধ্যে তিনি আবিষ্কার করেন এমন লেখক যিনি তাঁকে সব বিষয়ে সাহায্য কর্তে সমর্থ। বলতেন ঃ আপনার লিখা কখনও ফিরবে না, আপনি যা লিখবেন তাই হবে।

আশ্চর্য এক বিশ্বাস ছিল তাঁর। প্রথমতঃ নানা অনুষ্ঠানের যাবতীয় লেখা-পড়ার ভার পড়তো আমার উপর। দ্বিতীয়তঃ সরকারী সব ফাইলেও আমি লিখে দিতে লাগলুম। তিনি শুধু দস্তখৎ দিয়ে খালাস। এমন কি ১৯৩০ সালের এপ্রিল মাসে জালালাবাদে মেজর ডালাস-স্মিথের ইষ্টার্ণ ফ্রন্টিয়ার রাইফেলসের সঙ্গে মাষ্টার-দা সূর্য সেনের দলের যে যুদ্ধ হয় তার রিপোর্টও লিখে দিয়েছিলাম আমি।

তাঁর যোগ্যতায় সাহেব-সুবাদের খুব বিশ্বাস ছিল। ফলে সাব-ডেপুটী থেকে প্রমোশন পেয়ে তিনি ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট হন এবং বরিশালে খাস মহল অফিসার হয়ে চলে যান।

কিছু ভারী গোছের লেখার প্রয়োজন হলেই আমাকে জরুরী তলব কর্তেন। কোন কোন দিন বলতেন ঃ অত্যন্ত জরুরী বিষয়, গোছল করে অজু করে মনকে পবিত্র করে বসুন।

তাঁর জবরদস্তিতে তাই কর্তে হতো। তাঁর কাপড়-চোপড় পরিয়ে দিতেন।

একদিন তাঁর কাপড় পরে বসেছি দ্বিতীয়া মেয়ে মুখের দিকে না তাকিয়ে জড়িয়ে ধরে ডেকে উঠলো ঃ বাবা, বাবা ! তিনি হেসে উঠলেন। মেয়ে আমার দিকে চেয়ে ভারী অপ্রতিভ হয়ে গেল। তিনি হাসতে হাসতে বল্লেন ঃ তুমি একবার বাবা ডেকেছো, চিরকাল তাঁকে বাবা ডাকতে হবে।

বরিশাল থেকে লিখলেন ঃ আপনি আসুন, আমার লোক গিয়ে আপনাকে নিয়ে আসবে।

কিন্তু আমি আর যেতে পারিনি।

আমি চেষ্টা কর্তুম তাঁকে দিয়ে অন্ততঃ সংবাদ-পত্র পড়াতে। আমার কথা মতো বই কিনতেন, কাগজ রাখতেন।

একবার জিগ্যেস কর্লুম ঃ পড়েন ? বল্লেন ঃ পড়ি, শুধু গেজেটটুকু। তবে, কমনসেন্স ছিল অসাধারণ। এডিশন্যাল ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট হয়ে মারা যান।

কালিপুরে জয়েন করেই আমি শহরে গেলুম আবদুল আজিজ বি-একে এত্তেলা কর্তে। গিয়ে শুনি, তাঁর খুব অসুখ। বাহির ঘরে জহুর আহ্‌মদ চৌধুরীর চাচা আখেরুজ্জামান

www.pathagar.com

(তখন বোধ হয় উকীল) বসা ছিলেন। বল্লেন ঃ ডাক্তারের নিষেধ, কোন দেখা হবে না। আমি ফিরে এলুম।

পরের দিন সাদত হোসেনের সঙ্গে দেখা। বল্লেন ঃ তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়ে ছিলেন, পরে জ্ঞান হলে যখন শুনলেন আপনি গিয়ে দেখা কর্তে না পেরে ফিরে এসেছেন তখন বড্ড আফ্সোস কর্লেন ঃ হায়, হায়, তাকে বসিয়ে রাখলেনা কেন ! এত তদবির করে তাকে কাছে নিয়ে এলুম, মরবার আগে তাকে মনের সব কথা খুলে বলে যেতাম।

শুনে, আমি আবার তৈরী হচ্ছি তাঁকে দেখতে যাব বলে, এমন সময় তেষট্টি বৎসর পূর্ণ হতেই ১৯২৬ সালের ৮ই মে তিনি ইন্তেকাল কর্লেন।

ইসলাম হষ্টেল ও ইস্লামিয়া লাইব্রেরী ও রীডিং রুম থেকে বিরাট মুস্লিম এডুকেশন সোসাইটি গড়ে উঠে। গভর্নরের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের মেম্বার ছিলেন নওয়াব স্যার সৈয়দ শম্সুল হুদা। তিনি আমাদেরকে পরিদর্শন কর্তে আসেন। পরে স্বয়ং গভর্নর লর্ড কার্মাইকেল পরিদর্শন করে যান এবং প্রতিষ্ঠানের সুদৃশ্য বাড়ীখানি তৈয়ার হয়।

কিন্তু, তাঁর এ সব সৃষ্টির চেয়েও আবদুল আজিজ বি-এ ছিলেন মহান। তাঁর সৃষ্টিরই এক অংশে তিনি সমাহিত আছেন।

তাঁর মৃত্যুর পর সাদত হোসেন এবং আমার বন্ধুত্ব আরও গাঢ় হতে থাকে। সাদত হোসেন আমাদের হাটহাজারী সার্কেলে বদলী হয়ে আসেন, যেখানে ফতেয়াবাদে আমাদের গাঁয়ের বাড়ী। আমিও বাড়ী থেকে ১০ মাইল দূরে কাটির হাটে বদলী হয়ে আসি।

একবার সাদত হোসেন আমাদের বাড়ীতে বেড়িয়ে যান।

আর একদিন চৌধুরী হাট ষ্টেশনে ট্রেনে উঠতে যাচ্ছি সামান্য বিরক্তিতেই সাদত হোসেন নেমে প্লাটফরমে দাঁড়ালেন। সঙ্গে এক যুবক। বল্লেন ঃ আমার চাচাতো ভাই হামিদুল হক চৌধুরী। অমুক পরীক্ষা শেষ করে আমাকে দেখতে এসেছে। আমরা পরস্পর হাত মেলালুম।

আবদুল আজিজ বি-এ'র পরিবারে নানা-নানীর পরম স্নেহে বড় হচ্ছিল দৌহিত্র-দৌহিত্রী বাহার-নাহার—যে ভাই-বোন প্রায় ইতিহাসে পরিণত হয়েছে।

কিন্তু, সাদত হোসেন পড়ে গিয়েছিলেন পুত্র জহুর হোসেন চৌধুরীকে নিয়ে এক সমস্যায়। তাঁর বংশ-মর্যাদা জ্ঞান ছিল টন্টনে। তাঁর পিতা আবদুল গণি চৌধুরী ছিলেন সাব-রেজিষ্ট্রার। সাব-রেজিষ্ট্রারদের তখন একটা আলাদা সম্মান ছিল।

তাঁর অবস্থাও ছিল সচ্ছল। সাদত হোসেনের চাচাতো ভাই আজিজুল হক ছিলেন পুলিস সুপারিন্টেন্ডেন্ট্। তিনি ভাবতেন ঃ আমার ছেলে নানার বাড়ীতে বড় হবে কেন ? নানাও তখন বেঁচে নেই।

জহুর হোসেন চৌধুরীকে নিয়ে উভয়পক্ষে পত্রের আদান প্রদান ও উত্তর প্রত্যুত্তর চলতো। সাদত হোসেনের অনেক চিঠিই আমাকে লিখে দিতে হতো। কিন্তু, সমস্যার কোন সমাধান দেখা যেতো না।

www.pathagar.com

মাহ্‌বুব-উল আলম চট্টগ্রামের ফতেহাবাদ গ্রামে ১লা মে ১৮৯৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন। মাত্র ১৯ বছর বয়সে তিনি প্রথম মহাযুদ্ধে যোগ দেন। যুদ্ধ থেকে ফিরে 'পল্টন জীবনের স্মৃতি' লিখেন। লেখায় জীবনের চিত্র ভেসে উঠে বলে তিনি জীবন-শিল্পী হিসাবে খ্যাতি লাভ করেন। তাঁর সাড়া জাগানো আত্মজৈবনিক উপন্যাস 'মো'মেনের জবানবন্দী' ইংরেজী ও উর্দুতে অনুদিত হয় এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ও পেশোয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্য হয়। তাঁর বহু আলোচিত উপন্যাসিকা 'মফিজন' আজও আধুনিক শিল্পকর্ম রূপে সমাদৃত। তাঁর হাস্যরসাত্মক গল্প সংকলন 'গোঁফ সন্দেশ' বাংলা সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য সংযোজন। সাহিত্যে মৌলিক চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গীর জন্যে তিনি সাহিত্যে সর্বোচ্চ পুরস্কার 'প্রাইড অব্ পারফরমেন্স', 'বাংলা একাডেমী পুরস্কার' ও 'একুশে পদক' সহ বহু পুরস্কার লাভ করেন।

www.pathagar.com

১৯৫৩ সালে পেনশন প্রাপ্তির পর পরই মাহ্‌বুব-উল আলম 'জমানা' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশনার মাধ্যমে নিজেকে সাংবাদিকতায় নিয়োজিত করেন। সম্পাদকীয়ের বিষয় নির্বাচন ও রচনা-রীতিতে স্বাতন্ত্র্যের জন্য তিনি সাংবাদিকতায় পথিকৃতের মর্যাদা লাভ করেন।

১৯৫৯ সালে মাহ্‌বুব-উল আলম যুক্তরাষ্ট্র সরকারের আমন্ত্রণে মার্কিন মুলুক সফর করেন এবং ফেরার পথে হজ্‌ব্রত পালন করেন।

৩২টিরও অধিক পুস্তকের রচয়িতা মাহ্‌বুব-উল আলম ৭ বছরের একাগ্র সাধনা ও একক প্রচেষ্টায় সর্বাধিক তথ্যসমৃদ্ধ ১২০০ পৃষ্ঠার 'বাঙ্গালীর মুক্তিযুদ্ধের ইতিবৃত্ত' (চার খণ্ডে) রচনা করেন। তাঁর জীবদ্দশায় এটিই শেষ গ্রন্থ। তাঁর মরণোত্তর হাস্য-রসাত্মক গল্প সংকলন 'প্রধান অতিথি ও তাজা শিংগী মাছের ঝোল' পাঠক মহলে বিপুল সাড়া জাগায়।

তিনি ১৯৮১ সালের ৭ই আগষ্ট কাজির দেউড়ীস্থ নিজ বাসভবনে ইন্তেকাল করেন।

www.pathagar.com

'৪০ বৎসর বয়স হতে হতে নিজের স্রষ্টাকে জেনে নিতে হয়। তাঁর অনেক নাম, অনেক অর্থ। সকলের সঙ্গে একইভাবে সংস্পর্শ হয় না। যে আল্লাহ্‌কে যেই নামে চিনেছে, সেটাই তার জপ। যখনই সময় পাওয়া যায় সেই নাম জপ করে সময়ের ফাঁকটা বুজিয়ে নিতে হয়। এভাবে অর্থপূর্ণ ও সার্থক হয়ে উঠে।'

মাহ্‌বুব-উল আলম

www.pathagar.com